আতর আলির রাজসজ্জা

শৈবাল মিত্র

কবিপত্র প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ ঃ
চৌঠা আগষ্ট ১৯৬২

প্রকাশক ঃ
শ্রীমতী মিনতি মুখোপাধ্যায়
২২বি. প্রতাপাদিত্য রোড,
কলকাতা-৭০০০২৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমতী ছবি ঘোষ
মেসার্স জি, ডি. এণ্টারপ্রাইজ
২৯, শীতলাতলা রোড. সাহাপুর,
কলকাতা-৭০০০৩৮

পরিবেশক ঃ
বুকমার্ক
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ
পরিকল্পনা—সুবোধ দাশগুপ্ত
শিল্পী—সমরেশ মুখার্জী

সূচীপত্র

গল্প পড়ার গল্প

বাংলা ছোট গল্প নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব। অথচ শুনি, ছোটগল্পের বই নাকি বাজারে বিকোয় না। হয়ত তাই। দু'পয়সার বেলুনকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আশী পয়সার করতে পারলে কেল্লা ফতে। তখন মহাউপন্যাস নাম দিয়ে বিয়ের আসরে ও পাড়ার লাইব্রেরিতে চালিয়ে দেওয়া যায়। তা যাক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ আর শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি—মেজদিদি—বিন্দুর ছেলেকে ভুলি কেমন করে? তারপর তিন বাঁড়ুজ্জে—তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক। মনোজ বসু প্রেমেন্দ্র মিত্র বিভূতি মুখুজ্জে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত সুবোধ ঘোষ শরদিন্দু শৈলজানন্দ বুদ্ধদেব প্রবোধ সান্যাল গজেন্দ্র মিত্র সেই সঙ্গে। এই শেষ নয়, আগে কহ আর। নরেন্দ্রনাথ মিত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আশাপূর্ণা দেবী রমাপদ চৌধুরী সন্তোষকুমার ঘোষ প্রতিভা বসু। না, এখানেই থেমে নেই, আগে কহ আর। শ্যামল সুনীল মতি শীর্ষেন্দু সিরাজ প্রফুল্ল দিব্যেন্দু মহাশ্বেতা দীপেন দেবেশ অতীন বরেন। বাংলা ছোটগল্পের বেশ জমজমাট সংসার। গায়ে গতরে ছলা কলায় বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে রয়েছেন ভিনস্বাদে অপরূপ শিবরাম চক্রবর্তী ও সত্যজিৎ রায়। কিন্তু তারপর? তারপর ও নদী বহে চলে। এবং এবারও বলা যেতে পারে আগে কহ আর। সেই আগ বাড়িয়ে কহার সময় প্রথমেই মনে পড়ে শৈবাল মিত্রের নাম। সমরেশ মজুমদার অমর মিত্র সুধাংশু ঘোষ রতন ভট্টাচার্যের মাঝখানে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম।

তবে সমালোচকদের পয়লা নম্বর দোষ, কোন লেখা ভাল লাগার পর পূর্বসূরী বা বিদেশী কারও সঙ্গে লেখকের মিল খুঁজে বের করা চাই-ই চাই। আমিও তাই করতে গিয়ে শৈবালের মিল খুঁজে পেয়েছিলাম শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে। কিন্তু পরে দেখলাম সে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ, আসলে শৈবাল মিত্র শৈবাল মিত্রই, তার লেখার চাল চলন ধরণ ধারণ তাঁর নিজস্ব। এবং বাংলা ছোটগল্পের যে ধারা চলছে গত আশী বছর ধরে, শৈবালের গল্পের মিল একমাত্র তারই সঙ্গে।

শৈবালের প্রথম গল্পসংকলন এটি, সবই আলাদা আলাদা ছাপা হয়েছে নানা কাগজে। 'একসঙ্গে বেরোল এই প্রথম। শৈবালের গল্প, অন্য আরও দশজন গল্পকারের মতো বিচিত্র স্বাদের। তবে সবকটির মধ্যেই আছে সামান্য লক্ষণ। দারিদ্র তাঁর প্রধান বিষয়। ঘুরে ফিরে আসে ক্ষুধা। ক্ষুধা শৈবালকে বড় নাড়া দেয়। বেশ কয়েকটি গল্প নিছক ভাতের গল্প। পেটের ক্ষুধার সঙ্গে কখনো

কখনো মিলে যায় দেহের ক্ষুধা। সেই সঙ্গে আছে রহস্যময়ী রমনী এবং অনন্ত বিস্ময়ের আধার প্রকৃতি। দুটোই যখন তখন যেখানে সেখানে সৃষ্টি করে যায় কুহক। তখন লৌকিক অলৌকিক একসঙ্গে মিশে যায়। এই কুহকইতো শিল্পের প্রাণ। আবার সব ছাপিয়ে প্রায়ই এসে হানা দেয় নিঃসঙ্গতা। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের প্রত্যেকটি লোকও যেন ওই নিঃসঙ্গতায় ভোগে। কৃত-বিদ্য সব শিল্পীইতো নিঃসঙ্গ এবং তা তার সৃষ্টিকর্মে সঞ্চারিত হবেই। শৈবালের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অতিরিক্ত আরও দু একটি জিনিসও পাওয়া যায়। রাজ-নৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা, থানা পুলিশের অভিজ্ঞতা। সেই কারণেই শৈবালের গল্পে দারোগারাও মুখ্য ভূমিকায়। তাছাড়া প্রায়ই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে পৃথিবীর দুঃখমোচনজাত বিপ্লবী চেতনা ও মধ্যবিত্ত মানসিকতার রোমান্টিকতায়। বিপ্লব চাই-ই, নইলে এই দারিদ্র্য, শুয়োরের পালের মত এই বেঁচে থাকার রূপান্তর হবে কী করে! গল্পের সুন্দর রোমান্টিক শুরু, বেশ এগোচ্ছে, একই কায়দায়, হঠাৎ ধাক্কা মারে বড় আকারের বাস্তব একটা সত্য—যার নাম অভাব যার নাম খেতে না পাওয়া, যার নাম তিলে তিলে মরা। 'পোকা' গল্পে ভুল বোঝাবুঝির মেলো-ড্রামার মাঝখানে মুরগি হাতে এক গেঁয়োলোক এসে সব ওলটপালট করে দেয়। দারোগার হাতে মুরগিটা বিনা পয়সায় সঁপে দিয়ে ওই গরিব লোকটা রাস্তার শেষ সীমায় একটা কালো পোকার মতো মিলিয়ে যায়। 'কালো পোকা' শুধু নয়, আসলে সে নিজেই দারোগার খাবার হিসেবে জবাই হওয়া আস্ত একটা মুরগি।

'খয়ের খাঁর ইন্তেকাল' তো বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা গল্প। এমন বীভৎস রসের দৃষ্টান্ত বিরল। তুকতাক ঝাড়ফুঁক গুড়জল ইত্যাদি সব ব্যাপারের মাঝখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে হোচেন নামক একজন অভাবী মানুষের ও নিকা করতে যাওয়া চিনিবিবির দারিদ্র। এখানে দারোগার বদলে এসেছে তার প্রতিনিধি, গাঁয়ের মাতব্বর দাশু হালদার, যাকে ভুল করে বা ইচ্ছে করেই কবর দিয়ে দেয় হোচেন। 'শবসাধনা' গল্পেও দারোগা পুলিশের ছড়াছড়ি। বীভৎসতা এখানেও, এখানেও দারোগা পুলিশের নিষ্ঠুরতা। কিন্তু রাজনৈতিক আসামীকে পেটাতে পেটাতে সমাদ্দারের মনে পড়ে যায় তার কাপালিক বাবার কথা। ঠাণ্ডা ঘন অন্ধকারে সে ভয় পায়। এই নিষ্ঠুর গল্পেও শৈবাল মধ্যবিত্ত মানসিকতার রোমান্টিকতা আনতে পেরেছেন অপূর্ব মুনশিয়ানায়। স্বামীস্ত্রীর উপর জঘন্যতম আঘাতের পরও ভয়ঙ্কর থানাও কোন রহস্য কাহিনীর চরিত্র হয়ে যায় এবং 'লালবাড়ির তিনতলার কার্নিশ থেকে একটা কালো পেঁচা অন্ধকারের দিকে উড়ে যায়।' 'মান্য মাইতির আইন অমান্য' শ্লেষে ভরা, হালের রাজনীতির মুখোশ চমৎকার চাতুরিতে খুলে দেওয়া। এখানেও থানা পুলিশ, এখানেও গরীব মানুষের

খিদে। মান্য মাইতি বড় গরীব. তার ঘন ঘন খিদে পায়, সে বলে 'লেখাপড়া জানা লোকেদের খুব একটা খিদে পায় না। হয়তো বিদ্যের ভারে খিদে মরে যায়। মান্যর মনে তাই একটা আপশোস আছে। লেখাপড়া শিখলে সে হয়তো এই খিদের হাত থেকে বেঁচে যেতো।' মান্য মাইতির জবানিতে শৈবাল বলেন, 'গরিব মানুষের আবার রাজনীতি! জান, জমি বাঁচানো হলো বড় কথা।' 'সংগ্রামপুর যাত্রা' গল্পেও অসার রাজনীতির মাঝখানে অভাবী মানুষরা ভিড় করে এসেছে। কিন্তু 'রোগা শীর্ণ লম্বাটে চেহারার পিছুবুদ্দির তোবড়ানো গালে কয়েক-দিনের কাঁচা পাকা দাড়ির' মাঝখানে একদিকে বিপ্লবী শৈবাল যেমন বলেন' 'গরিব লোকের কোন গাত্রবর্ণ থাকে না,' তেমনি অন্যদিকে রোমাণ্টিক শৈবাল দেখেন 'এক ঝাঁক টিয়াপাখি মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। এই ফাঁকা মাঠে কোথায় ওদের বাসা কে জানে।' শৈবালের গল্পের চরিত্রের দুটো ব্যাপারই মিশে গেছে আর একটি বর্ণনায় 'ফাঁকামাঠে নিষ্পত্র দু একটি কাঁটাভর্তি বাবলাগাছ। রোদে বাবলা গাছের ছায়া, না ছায়া নয়, ছায়ার কঙ্কাল, হাত পা খিঁচিয়ে খোলা মাঠে শুয়ে আছে। এক ঝলক তপ্ত হাওয়ায় ফ্যাকাশে সাদা রঙের দলাপাকানো একটা খোলস আমার পা ঘেঁসে উড়ে গেল। পিছুবুদ্দির গাঁ এখন পরিষ্কার দেখা যায়। আমার পেটের ভোঁতা ভাবটা কেটে গিয়ে এখন চনচনে খিদে।' সব শেষে চিৎকার করে না হোক, ধীরে স্পষ্ট গলায় শৈবালই বলতে পারেন 'পাঁচপো আটা আলু ভেলিগুড় এবং ভারতীয় বিপ্লব সমান জরুরী।'

বাস্তুপেঁচা পুরানো বাড়ি অশরীরী আত্মা এবং সমুদ্রের শব্দ জাগানো একটি ঘড়ি নিয়ে নিঃসঙ্গতার কাহিনী 'বিরাম ঘড়ি।' একেবারে অন্য স্বাদের। কিন্তু তারও চেয়ে সাংঘাতিক গল্প 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রিপোর্ট।' বিপ্লব টিপ্লব কম, রোমাণ্টি-কতা কম, নিষ্ঠুরভাবে একটি রূঢ় বাস্তব, একটি সরল সত্য—যা আমাদের সমাজ ও জীবনকে শত শত বৎসর ধরে কুরে কুরে খাচ্ছে—ফুটিয়ে তুলেছেন। মৃত্যু অমোঘ, মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু এ গল্পে মৃত্যু এসেছে অমূলক সন্দেহ আর তুচ্ছ জেদাজেদির পরিণাম হিসেবে। এমনই হয়, এই রকম হয়। আমাদের অন-বরত দেখা কিছু ঘটনাকে সংযত বাক্যে ও সমদর্শী নির্লিপ্ততায় উপস্থিত করা হয়েছে। আর একটি স্মরণীয় গল্প, 'কমলি, তুই ঘরে যা।' এমন করুণ ও এমন মমতাময় কাহিনী বাংলা সাহিত্যে কম আছে। শুরু থেকে শেষ—যেন দীর্ঘ কবিতা। এবং অনিবার্যরূপে আসে সেই দারিদ্র্য, তবে পেটের ক্ষুধার সঙ্গে মিশে গিয়েছে. দেহের ক্ষুধা 'দুর্ভিক্ষপীড়িত গেঁয়ো গরিবের এতো রূপ ভালো নয়। শক্তিমান পুরুষের পাহারা না থাকলে মেয়েদের রূপযৌবন তছনছ হয়ে যায়।' কমলির হয়েছেও। শক্তিমান নয়, এক নিষ্ঠাবান সেবাব্রতী তাকে বাঁচাতে গিয়ে

ঠেলে দিয়েছেন আর এক শিকারীর মুখে। সুতরাং কমলিকে ফিরে যেতে বলা হয় তার স্বগ্রামে, যেখানে 'দেহের ক্ষুধার চেয়ে আরো প্রবল এক ক্ষুধা আছে, যার নাম শ্রম শান্তি শুদ্ধতা।' 'আতর আলির রাজসজ্জাও' ক্ষুধার ভুগোলের মধ্যে পড়ে। একদিন কা সুলতান, চিরদিনের সুলতান হতে চায় রাজপোশাক পরে। তবে তার দাম দিতে হয় অনেক। বিসর্জন দিতে হয় নীতি আদর্শ সততা। তার কারণ সেই পেটের ক্ষুধা। শেষ পর্যন্ত এই ক্ষুধা থেকে মুক্তির জন্যেই বোধহয় তার তরোয়ালের কথা মনে পড়ে। 'দিন নেই রাত নেই' গল্পটি আলাদা জাতের। পলাতক এক বিপ্লবীর ভালোবাসার কাহিনী। বিপ্লবী প্রেমিক (নাকি কামুক ?) হলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায় এ গল্প না পড়লে ঠিক বোঝা যাবে না। দারিদ্রের মতো প্রেমও শৈবালের কাছে সমান জরুরী। এই বোধটুকু আছে বলেই শৈবাল আর্টিস্ট। তিনি যেমন 'বরাহপুরাণ' গল্পে মানুষের শুয়োর হয়ে যাওয়ার কর্মকাণ্ড সালঙ্কারে বর্ণনা করে এক রূপক কাহিনীর অবতারণা করেন এবং সুন্দরবন অঞ্চলের অভুক্ত মানুষের শূকরবৎ জীবনের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরান, ঠিক তেমনই এক বিপ্লবীর মুখ দিয়েই সুন্দর ভঙ্গিমায় বলেন 'মেয়েদের শরীর ফুলের মতো। জোর করে পাপড়ি খোলা যায় না। অনেক চমৎকার সংলাপ ফুলের তোড়ার মতো মঞ্জরীর জন্যে আমি বাঁধতে লাগলুম।' বিপ্লবী মঞ্জরীর দেখা পেলেই বিপ্লবী নায়কের 'বুকের ভেতরের সেই নিভৃত ঠাণ্ডা নরম জলের ঝর্ণাটা আকাশচুম্বি উচ্ছ্বাসে উথলে ওঠে।'

'সুবলের হৃদয় ও ডাঃ কালিদাস পাল' গল্পের সঙ্গে 'বিরাম ঘড়ি' গল্পের মিল আছে। সুবিশাল জীর্ণ ভবনের মাঝখানে সেই নিঃসঙ্গতা। এখানেও অলৌকিক রূপকথা। পালের ডাঙায় সবুজ অন্ধকারে হঠাৎ একটা রাজপ্রাসাদ জেগে উঠতো, ব্রোঞ্জ রঙের পাথরে তৈরী। সেখানে ঘণ্টা বাজছে। কতো সব আশ্চর্য ছবি। অসুস্থ কিশোর সুবল আর কর্মব্যস্ত ঠাকুরদার মাঝখানে আছেন নিষ্কর্মা বাবা, আছেন গৃহলক্ষ্মী মা এবং এক হাতুড়ে ডাক্তার। কিন্তু ডাকঘরের অমলের মতো সুবল অনায়াসে হাওয়ায় পদ্মফুলের গন্ধ পায়, রাজপ্রাসাদের ঘণ্টা শোনে। 'পেপারওয়েট' গল্পে নায়ক বিদ্রোহ করতে চায়, কিন্তু মধ্যবিত্ত মানসিকতা পথ আগলে দাঁড়ায়। ভিড় ট্রামে বাসে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে মানুষ নামক বীভৎস দুর্গন্ধওলা তাল তাল মাংসপিণ্ডের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে অনলের মনে হয় অদৃশ্য নিষ্ঠুর এক দানব তাকে আরশোলা, ইঁদুর, গরু, ছাগল, শুয়োর যোনিজাত এক মনুষ্যেতর জীবে পরিণত হতে বাধ্য করছে।' সেই সঙ্গে ক্ষুধার ভয়ানক মূর্তি দেখে তার মাথায় অগ্নিময় উল্কাপিণ্ড জ্বলে ওঠে, হাতের পেপারওয়েট কামানের গোলা হয়ে যায়। কিন্তু কীর্তির প্ররোচনা যতই ফুঁসে উঠুক, 'মায়ের মৃত্যুকালীন মুখটা মনে করে অনল নিজেকে খুব সামলে নেয়।'

বরাহপুরাণেও, আগেই বলেছি, মানুষ মনুষ্যেতর প্রাণী শুয়োরের রূপ নিয়েছে এবং এই পরীক্ষাগার থেকে একজন পালায়, একজন শুয়োর হয়ে থেকে যায়। দুটোই সত্য। 'বাঁচা মরা যার হাতে' দারুন গল্প। অর্থগৃধ্নু নিবারণের বাকি জীবন যেমন জটা নামধারী এক ব্যক্তির লক্ষ্যের বস্তু হয়ে থাকে, তেমনি গল্পটা পুরো পড়ার পরও আমাদের কাছে জটা এবং নিবারণ দুজনেই অনেকক্ষন লক্ষ্যের বস্তু হয়ে থাকে। শেষগল্প 'থরহরি কম্প'। সুন্দর ছকে সাজানো বর্ণনার গুণে অসামান্য। সেই ছকটা কী ? আর বলব না। পড়ে নিন। শুরু থেকে শেষ, সব কটি গল্পই পড়ে নিন। না পড়লে সব রস, সব মজা কি ধরিয়ে দেওয়া যায় ! পিঠের স্বাদ দেখে নয়, চেখে।

অমিতাভ চৌধুরী

পোকা

শেষ বিকেলের আলোয় লাল মাটির তৈরী এই ছোট প্ল্যাটফর্ম, দু'পাশের ফসল ভর্তি মাঠ আর ঘরমুখো একদল হরিয়ালকে দেখে বিজয়ার মুখ আমার মনে আসে। সুন্দর কিছুকে একা ভোগ করতে কষ্ট হয়।

ট্রেনটার অবশ্য এই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানোর কথা নয়। হয়তো সিগন্যাল পায় নি। হয়তো ইঞ্জিনে কোনো গণ্ডগোল।

প্ল্যাটফর্মটা ফাঁকা! ফেরিওলা নেই, মানুষজন নেই। একটা শালপাতার ঠোঙা হাওয়ায় উড়ে গেল। মাটি, গাছপালার রঙ দেখে বোঝা যায় ট্রেন আর কিছুক্ষণের মধ্যে বাংলা ছেড়ে উড়িষ্যায় ঢুকবে।

শেষ শরৎ। হাওয়ায় সিরসির ভাব। আকাশের রঙে ভেজাল নেই। ধানের গোছাগুলো মুটিয়েছে। খড়ে সোনালী আভা। আদিগন্ত মাঠে মাতৃত্বের লক্ষণ!

অথচ উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশের ফসলে পোকা ধরেছে। হাজার হাজার একর চাষ বিপন্ন। এখনি ওষুধ দরকার। তা না হলে তুষ হয়ে যাবে দুধভর্তি দানাগুলো। খড়ের ঝাড় ফ্যারফেরে উলুখাগড়ার চেহারা নেবে। আরো বিপদ আছে। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যার পোকা দিনরাত হাওয়ার স্রোতে ভেসে আসবে! সীমানা পেরোবে। এই চত্বরের ফসলও বরবাদ করবে। কেউ আটকাতে পারবে না। ওদের ট্রেন, টিকিট, কিছুই লাগে না। গার্ড, চেকারের কাঁধ চেপেও আসতে পারে। লাল আলোয় এখন ঝলমল করছে মাঠ, ধানের শীষ। এদের বাঁচাতে হবে।

কাল বিকেলে জরুরী টেলিগ্রাম এসেছে অফিসে। রৌরকেল্লা, রায়পুর, বিলাসপুরের ডিলাররা একযোগে সেটা পাঠিয়েছে। ফসল বিপন্ন, ওষুধ পাঠান। সেলস্ এর ডেপুটি ম্যানেজার মিঃ দস্তুর চিঠিটা মুখের সামনে ধরে বসেছিলো। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে।

কালই স্টার্ট করো—দস্তুর বললো।

আমি জানতুম এটা হবে। উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ আমার ভাগে পড়েছে। বছরে দু'তিনটে ট্যুর করতেই হয়। জরুরী ডাক এলে দু'একটা বাড়ে। দস্তুর সাহেবের কপালের রেখাগুলো জেগে থাকে।

টেলিগ্রামটা আমাকে এগিয়ে দিয়ে দস্তুর জিজ্ঞেস করলো। কিছু সন্দেহ হয়—
'হ্যাঁ স্যার।'

অমানুষ পশু—দস্তুর বিড়বিড় করে—দেশটাকে শুষে খাচ্ছে।

আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। ঠাণ্ডা ঘর। এয়ারকুলার যন্ত্রের রিনরিন একটানা শব্দ! জানালার বন্ধ কাঁচের ওপাশে নীল আকাশ। নীচে সবুজ মাঠ। একপাল ভেড়া। হলুদ আইসক্রীমের বাক্স নিয়ে কখনো মাঝ মাঠে দাঁড়িয়ে থাকে এক আইসক্রীম-ওয়ালা। গায়ে লাল কুর্তা।

ওই ডিলারগুলোকে তাড়ানো দরকার—দস্তুর গুমরোয়।

আমার কিছু বলার নেই। ডিলারদের বিরুদ্ধে প্রথম রিপোর্ট আমি করেছিলাম। তারপর আরো বারচারেক কথাটা তুলেছি কোম্পানীর উঁচুতলায়। কাজ হয়নি! তাপারিয়া, গোয়েঙ্কা, পানিগ্রাহীরা আমার থেকে অনেক ক্ষমতাবান, প্রভাব-শালী লোক। পোকা মারার ওষুধের ওরা একচেটিয়া কারবারী। বছরে বহু লাখ টাকা কোম্পানীকে দেয়। গুদোমে মাল ফেলে রাখে। বেচে না। জ্বলা ক্ষেত, নষ্ট ফসল আর আকালে ওদের লাভ বেশী। ওষুধের ব্যবসার চেয়ে মহাজনী ঢের রসালো। অনেক সময় পোকারা সব ছারখার করার পর ওরা ওষুধ চেয়ে পাঠায়। কোম্পানীর নানা টিমে তালের ব্যাপার আছে। দু'পাঁচদিন দেরি করে। ওষুধ পৌঁছোয়। তখন মাঠের পর মাঠ সাবাড় হয়ে গেছে। ওরা তড়পায়। গরীব মানুষের হয়ে সাফাই গায়। কিন্তু ওদের চোখ দেখে বুঝি, আনন্দে ফেটে পড়ছে। সামান্য অভিযোগের পর ওরা আমাকে খুব খাতির করে। ভালোমন্দ খাওয়ায়। বেড়াতে গাড়ি দেয়। নানারকম ইসারা ইঙ্গিত করে।

ট্রেণটার নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ নেই। চায়ের নেশা চাপে। কিন্তু একটা চা-ওয়ালা চোখে পড়ে না। মাথার ওপর বাঙ্কে আমার সুটকেশ। তার মধ্যে আমার জামাকাপড়। বিষের নমুনা প্যাকেট। ওষুধের দু'টো পেটি কাল ট্রেণে পাঠানো হয়েছে। আগামীকাল বা পরশু একটা রৌরকেল্লা পৌঁছোবে। আর একটা যাবে রায়পুর। খুব নিয়ম মাফিক কাজ সারি আজকাল। অফিস আর ডিলারদের কাউকেই বুঝতে পারি না। তাপারিয়ারদের বিরুদ্ধে রাগটা ভোঁতা হয়ে গেছে। অফিসে অভিযোগ দায়ের করার ইচ্ছেটাও নেই।

লাইন ধরে দু'চারজন পুলিশ ইঞ্জিনের দিকে এগোচ্ছে। কেউ কাটা পড়লো নাকি? কামরার সামনে প্ল্যাটফর্মের ওপর ভারী জুতোর শব্দ। আমি গ্রাহ্য করি না। সহযাত্রীদের অনেকে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছে। মাঝে মাঝে সিগন্যাল পোস্টের দিকে তাকাচ্ছে। কি একটা পাখী টিটিঃ টিটিঃ আওয়াজ করে উড়ে গেল। আগামীকাল বিজয়ার জন্মদিন। গত চারবছর এই দিনটা আমারা এক-সঙ্গে কাটিয়েছি। ওর সঙ্গে আলাপের এটা পঞ্চম বছর।

এইবারেই ফাঁক পড়লো। সামনে ওর এম, এ, পরীক্ষা। সেটা চুকলে বিয়ে করবো। বিজয়ার ফর্সা ধারালো চেহারাটা এই খোলা মাঠে, আকাশের নীচে দাঁড় করিয়ে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।

কামরার মধ্যে হঠাৎ ভারী বুটের শব্দ হ'তে চমকে যাই। আমাদের কামরাটা পুলিশ ঘিরে ফেলছে। পাশাপাশি তারা দাঁড়িয়ে আছে। কামরা থেকে মুখ দেখতে না পেলেও তাঁদের হলুদ উর্দি ঢাকা কোমর, বুট আর চকচকে বেয়নেটের ফলা জানালা দিয়ে চোখে পড়ে। দু'জন অফিসার গোছের লোক এগিয়ে আসে। আমার সামনে দাঁড়ায়। সাধারণ পোষাকপরা। তাদের পেছনে জনা দশেক উর্দিপরা রাইফেলধারী। লম্বা চওড়া একজন হঠাৎ একটা রিভলভার আমার কপালের দিকে তুলে ধরে চীৎকার করলো—হ্যাণ্ডস্ আপ।

প্রথমটা আমি বুঝতে পারি না। থতমত খাই। লোকটা আরো দু'পা এগিয়ে আসে। আমার কপালে কালো নলটা চেপে ধরে। একটা ঠাণ্ডা, হিলহিলে অনুভূতি আমার শরীরে ছড়িয়ে যায়। লোকটা আবার গর্জে ওঠে—হ্যাণ্ডস্ আপ। জানালা দিয়ে হালকা লাল আলো এসে ঢুকেছে। লোকটার রিভালভারটা লালচে দেখায়। ওর পরণে প্যাণ্ট। বুশ সার্ট। চকচকে টেরিকাটা চুল। তেলতেলে মুখ। চোখের নীচে মাংসের ডুমো। মোটা ঠোঁট। নীচের ঠোঁটটা একটু ঝোলা। দেখে বোঝা যায় কামুক, মেয়েদের চিবিয়ে চিবিয়ে পরখ করে। দুটো হাত আস্তে আস্তে মাথার ওপর তুলি! কামরার মধ্যে থমথমে ভারী আবহাওয়া। কেউ সাড়া শব্দ করছে না।

চমকের ধাক্কাটা থিতোলে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার?

দ্বিতীয় অফিসারটা এগিয়ে আসে। খেঁকুরে রোগা চেহারা। ক্ষুদে চোখ। খাড়াখাড়া চুল। হাতের সবুজ শিরাগুলো চনমন করছে। গিরগিটির মতো চোখের দৃষ্টি। সে তাকায় আমার দিকে। বলে বানচোত, ন্যাকা......।

এ লোকটার জামাকাপড় থেকে একটা আঠালো পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। রাতজাগা বজ্জাতির গন্ধ।

কি দেখছিলে—লোকটা জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

আমার মাথার ওপর হাত তোলা। অস্বস্তিতে গলা শুকনো। বললাম, চাষ আবাদ ফসল।

রোগা আর মোটা চোখাচোখি করে। ওদের মুখ আরো ভয়ংকর হয়। রোগার চোখ ঘুরতে থাকে। মোটার ঠোঁট আরো ঝুলে পড়ে।

কি বুঝলে—ট্যারচা গলায় মোটা জানতে চাইলো।

আপাততঃ ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জলে যেতে পারে।

আমার কথা শেষ হওয়ায় আগেই রোগাটা লাফিয়ে উঠে বললো—শালা, বদমাস, তাহলে তোমাদের খুব সুবিধে ? তাই না ?

এদের এই বাজে আচরণ, খিস্তি, এতো সব প্রশ্নের কারণ আমি ধরতে পারি না। সবটাই মনে হয় জটিল এক ধাঁধা। তবু সেলস্‌ম্যানের চাকরী করি। বড়ো, নামজাদা কোম্পানী। কথার জবাব দেওয়াতে পাকা।

বললাম সুবিধে তো বটেই। ওটা আমাদের লাইন। তবে আকাল আমরা বুখতে চাই। মেহনতের ফসল গরীব মানুষ ঘরে তুলুক।

মোটা অফিসার এবার বাজের মতো ফেটে পড়লো—শালা আমাদের সামনেও রাজনীতি ঝাড়ছে। ওঠো, চলো আমাদের সঙ্গে।

রাজনীতি শব্দটা বরফের তীর হয়ে আমার মাথায় বেঁধে। একদল শালিক জানালার বাইরে ঘাসের ওপর কলরব করছে রাজনীতি, রাজনীতি, রাজনীতি। আমার গোটা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বুঝতে পারি, কিছু একটা ভুল হয়েছে। ফাঁদে পড়েছি।

আপনারা ভুল করছেন—আমি করুণ গলায় বললাম। মাথার ওপর দু'টো হাত টনটন করছে। রোগা মোটা পরস্পরের দিকে তাকায়।

রোগা জিজ্ঞেস করলো—কি নাম ?

অবনী রায়।

মোটা হ্যা হ্যা করে হাসে।

এ নামটা আবার কবে হলো—রোগা লোকটা সেই পচা গন্ধটা হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে বললো—শিবেন বসু, হাসান আলি, মণ্টু দাস এই তিনটেই তো জানতুম। তোদের বাবা ক'টা—রিভলভারের নলটা দিয়ে মোটা আমার মুখে সুড়সুড়ি দেয়। ট্রেণের প্রায় সব যাত্রী তখন কামরার সামনে ভীড় করেছে। মজা দেখছে। একজন জিজ্ঞেস করলো—কি ব্যাপার মশায় ?

জবাব দিলো না কেউ !

বিষাক্ত চোখে [illegible] কলে প্রশ্নকর্তাকে দেখলো।

একজন রাইফেলধারী বন্দুকের কুঁদো উঁচিয়ে দরজার ভীড় হটাচ্ছে। ভাগ ভাগ।

শালারা লাটের বাঁট হে, একজন খিস্তি ঝাড়লো।

আগে পেছনে পুলিশ নিয়ে প্ল্যাটফর্মের লাল মাটির ওপর এসে দাঁড়ালোম। একজন সিপাই-এর হাতে আমার সুটকেশ। অফিসার দু'জন এর মধ্যে বার কয়েক নিজেদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। মোটার নাম গুরুপদ। সে রোগাকে ডাকছে দস্তিদার বলে।

রোগা লোকটা আমার গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে আছে। অথচ আমি ওকে এড়াতে চাইছি। কোথায় যেতে হবে, জিজ্ঞেস করলাম।

থানায়।

প্লাটফর্ম ছেড়ে আমরা রাস্তায় এসে নামলাম। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। অনেকদূরে কালচে সবুজ অন্ধকার। ওখানে গ্রাম। হাওয়ায় ফলন্ত খেতের ভারী শরীরে ঢেউ ওঠে।

সখ সৌখিনতার জন্যে মারা পড়লো—দস্তিদার বলে—এই বাহারে দাড়ি কাল হলো।

ছুঁচোলো চিবুকে ট্রিম করা ঘন দাড়িতে হাত বোলাই। পুরো ব্যাপারটা এখনো রহস্যময়, ধোঁয়াটে। রোগা লোকটা আবার বললো—বুঝলে শিবেনবাবু, বিপ্লব করা অতো সোজা নয়। অনেক কিছু ছাড়তে হয়। তুমি এই ফালতু দাড়ির মায়া কাটাতে পারলে না। ছোঃ।

আমি সাড়া করি না। আমার মাথায় তখন অনেক চক্কর।

আমার, পরিষ্কার, ফর্সা মুখ, ছুঁচোলো চোয়ালে সাধ করে দাড়ি রাখিনি। একটা ঘটনায় ভয় পেয়েছিলাম। সেই শুরু। বিজয়া রাগ করেছে, বারবার বলেছে দাড়ি কামাতে। শুনি নি। আমার থুতনিটা ওর আদর করার প্রিয় জায়গা। দাড়ি থাকাতে এখন অসুবিধে হয়।

মেঠো পথ ছেড়ে আমরা পিচের রাস্তায় উঠি। একজন গেঁয়ো লোক আসছিল। হাতে একজোড়া মুরগী। রোগা, কালো, শুকনো চেহারা। এতো পুলিশ দেখে সে ভয় পায়। রাস্তা ছেড়ে সে তাড়াতাড়ি ধান ক্ষেতে নেমে পড়ে। গুরুপদ জিজ্ঞেস করলো—কোথা থেকে ?

এ'জ্ঞে হাটে গিয়েছিলুম। মুরগী বেচতে।

আমায় দে। কাল দাম নিবি।

লোকটা মুরগীজোড়া ধানক্ষেতের মধ্যে লুকোতে চাইছিলো। হলো না। কাঁপতে কাঁপতে পাখিদুটো সে গুরুপদর হাতে দিল।

গুরুপদ নীচু গলায় দস্তিদারকে বললো—চাটের ব্যবস্থা হলো।

পেছন ফিরে তাকাই। লোকটা রাস্তার শেষ সীমায় একটা কালো পোকার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।

এতোক্ষণে আমার সত্যিকার ভয় করে। গা ছমছমানি, শীত শীত ভাব। কিছু একটা বলার জন্যে গলা উশখুশ করে। সামনে পেছনে বুটপরা, ভারী পায়ে

শব্দ। আলোর লালচে রঙটা মিইয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ধারে পুঁটলি পাকিয়ে দু'টো লোক বসে আছে। ধানক্ষেতের দিকে তাদের চোখ।

কি করছিস এখানে—গুরুপদ জিজ্ঞেস করলো।

ওরা ঘাড় তোলে। বিষন্ন ফ্যাকাসে চোখ। একজন বললো—বড়ো বিপদ। ধান পাতায় সাদা আঁশ ফুটেছে। পোকা লেগেছে।

আমি ওদের চোখ লক্ষ্য করে মাঠের দিকে তাকাই। সবুজ শীষে পাতলা সাদা সর এখনো স্পষ্ট নয়। খোলা চোখে ধরা যাবে না। আমি বুঝতে পারি।

জিজ্ঞেস করি, মাজরা পোকা ?

হ্যাঁ বাবু। সে রকমই মনে লাগে—একজন বললো।

ডেমিক্রন স্প্রে করো।

গুরুপদ খেঁকিয়ে উঠলো—চলো। চলো।

দস্তিদার আমার ঘাড়ে হাত দেয়।

আমার গলার কাছে জমে থাকা কথার স্তূপে ঢল নামে। বলি—প্লীজ, ছেড়ে দিন আমাকে। ভয়ানক বিপদ। তিন চারটে এলাকার মাঠ উজাড় হয়ে যাবে। আমি পোকা মারার ওষুধ বিক্রী করি।

কোম্পানির নাম বলি। পরিচয় পত্র আছে, সে কথা জানাই। ওরা পাত্তা দেয় না! দস্তিদার বললো সব দেখবো। আগে থানায় চলো।

অস্বস্তি বাড়ে। দাড়িতে হাত ঘসি। এই দাড়িটাই ফাঁদে ফেলছে। মাস ছয়েক আগের কথা। বোধহয় মার্চ কিংবা এপ্রিল মাস। মাথার ওপর সূর্য। ঠা ঠা রোদ। ভরদুপুরে মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। অফিসে একবার ঢুঁ দিয়ে বাড়ী ফিরবো।

সাত সকালে বেরিয়েছি। অফিসের কাজে। জামা ট্রাউজার্স ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। মুখে চটচটে ধুলো। হঠাৎ ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস অফিসারের মুখোমুখি। আমাকে একপলক সে দেখল।

কবে বেরোলি জেল থেকে—জিজ্ঞেস্ করলো।

আমি অবাক হলাম। রাগও হলো। কিন্তু যুৎসই একটা জবাব সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এলো না। এরকম হয়। পোকামারার বিষ নিয়ে ডিলার এজেন্টদের সঙ্গে অনর্গল কথা বলতে পারি। ওটা আমার নিজের বিষয়। তখন আমার কথায় ভয়ানক দাপট আর ধার। অন্য প্রসঙ্গে থিতিয়ে যাই। বুদ্ধি বেইমানি করে।

অফিসার আমার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে। বললো—এই চত্বরে গাড়ী লোপাট হলে মাজা ভেঙ্গে দেবো।

আমার মাথায় রাগ চড়েছিল। জবাব দিয়েছিলাম—কি আজেবাজে বকছেন?

লোকটা ঠাণ্ডা চোখে আমাকে দেখছিল। আমার বুক কাঁপছিল। নীচু গলায় বলেছিলাম—ভুল করছেন আপনি!

অফিসার কথা বাড়ালো না। চলে গেল। কিন্তু সেই দুটো ঠাণ্ডা চোখ আমার বুকের মধ্যে চেপে বসে থাকে। বাড়ী ফিরে অনেকক্ষণ হাপুস হুপুস চান করলাম। তারপর আয়নায় নিজের মুখ দেখি। আমার চেহারা ভালো। মুখশ্রী সুন্দর। পাঁচজনে বলে। আমার মতো দেখতে একটা চোর আছে। সে মোটরগাড়ী চুরি করে বেড়ায়। বুকচাপা আতঙ্ক আর অস্বস্তিতে সারা বিকেল ছটফট করি। মুখটাকে বদলানো দরকার। সেই থেকে দাড়ি রাখছি। নিজেরও ভালো লাগে না। অফিসে ওপরওয়ালারা অখুশি, মাঝে মাঝে কুটকুটুনি জাগে। বিজয়া প্রায়ই ঠাট্টা করে, উকুন হলে মজা বুঝবে। সে ভয় আমারও। তবু হাসার চেষ্টা করি। বলি উকুন মারার ওষুধ আমার জানা আছে।

একজন সিপাই গুরুপদর মুরগী দু'টো বইছে। একটা হঠাৎ ডেকে ওঠে। ডানা ঝাপটায়। সিপাইটা ঠাস করে মুরগীর পেটে চড় মারে। সেটা অদ্ভুতভাবে ককিয়ে ওঠে।

দস্তিদার আমার কাঁধে হাত রেখেছে। গন্ধে গা গুলোয়. পেট পাক খায়। সে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো—বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। আমি লোকটার দিকে তাকাই। গুরুপদ বললো—ব্যাণ্ডেলের বাড়ীটা থেকে তুমি পালালে কি করে? বেলেঘাটায় চোখে ধুলো দেওয়ার রহস্যটা আমরা ধরেছি। খাটা পায়খানা দিয়ে কেটেছিলে।

দস্তিদার জিজ্ঞেস করলো—জগদীশ কোথায়?

আমি অবাক হই। কিছু বলার নেই। দস্তিদারের নাকের ডগা লাল হয়। বলবে বলবে। থানায় চলো সব বলবে।

থানার কাছে পৌঁছাই। আরো অনেক পুলিস, লোকজন। সাদা পোষাকের একজন ছুটে আসে। দস্তিদারকে বলে—স্যার জগদীশ আর সর্বেশ্বরকে ধরেছি। লক্ আপে আছে।

দস্তিদারের সাপের মতো চোখ ঝিলিক দেয়। গুরুপদ বলে—সাব্বাস।

বেশ কিছু আগে সূর্য ডুবেছে। অথচ গাছের পাতায় ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে থাকা আলো নেভে নি। চারপাশ এখনও পরিষ্কার দেখা যায়। অনেক দূরে কুবকুব করে একটা ডাহুক ডাকে।

তারপর শিবেনবাবু ওরফে হাসান আলি ওরফে মন্টু দাস ওরফে অবনী রায়…
গুরুপদ কথা কেড়ে নেয়—ওরফে শুয়োরের বাচ্চা—

দস্তিদার শেষ করে—কোথায় যাচ্ছিলে ?

আমি ককিয়ে উঠি. বিশ্বাস করুন, আপনারা যা ভেবেছেন ঠিক নয়। আমি সত্যিকার অবনী রায়। কোম্পানীর কাজে রৌরকেল্লা, রায়পুর যাচ্ছি। আমায় ছেড়ে দিন।

আইডেন্‌টিটি কার্ড দেখি। গুরুপদ হাত বাড়ায়। ঘরের মধ্যে আবছা আলোয় গুরুপদর লোমওলা কালো হাতটা ভয়নক দেখায়।

কোম্পানীর ছাপ দেওয়া একটুকরো পরিচয়পত্র মাণিব্যাগে আছে। তাতে আমার ছবি লাগানো। পকেট থেকে ব্যাগটা বার করি। তিনটে খাপ তন্নতন্ন খুঁজি। সেটা নেই। নিশ্চয়ই বাড়ীতে ড্রয়ারের মধ্যে আছে। ব্যাগের মধ্যে বিজয়ার ছবি। জ্বলজ্বলে চোখ। ঠোঁট টেপা হাসি। বুকের ওপর বিনুনি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আমার কপাল ঘেমে ওঠে। ধক্‌ধক্ করে বুক।

কোথায়—দস্তিদার জিজ্ঞেস করে।

হ্যা…হ্যা…হ্যা…গুরুপদ হাসিতে ফেটে পড়ে…শালা ধড়িবাজ।

দস্তিদার চেরা গলায় বলে—শুধু ধড়িবাজ নয় মাগীবাজ। দস্তিদারের হাতে আমার মানিব্যাগ। বিজয়ার ছবিটা ও দেখছে। বিজয়া হাসছে।

এটা কে ?—গুরুপদ জিজ্ঞেস করে। বিজয়ার বুকে ওর হাত।

আমার বান্ধবী। ঝাপসা গলায় বলি।

বান্ধবী। বাঃ বাঃ তোফা। নাম কি ?

বিজয়া।

কি—দস্তিদার শুনতে না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করে।

আমি বলি।

মেজারমেণ্ট কতো। —গুরুপদ জানতে চায়।

প্রথমটা বুঝতে পারি না। গুরুপদ আবার জিজ্ঞেস করে—বুক, কোমর, পাছার মাপ কতো ?

আমার মাথা ঝনঝন করে। কানের চারপাশে বুক, কোমর, পাছা, দুলতে থাকে। শালা নাঁকা। —দস্তিদার খিঁচোয়—রাজনীতির নাম করে মেয়েটাকে তো ঝরঝরে করে দিয়েছো।

কবার গর্ভপাত করিয়েছো। —গুরুপদ জিজ্ঞেস করে।

দস্তিদার আমার পাশে সেঁটে বসেছে। সেই পচা গন্ধটায় আমার নিঃশ্বাস

বন্ধ হওয়ার অবস্থা। গর্ভপাত, গর্ভপাত, গর্ভপাত—আমি নিজের মনে কথাটা আওড়াতে থাকি।

জানলার ওপাশে দিগন্তছোঁয়া ধানের মাঠ। লক্ষ লক্ষ তাজা রুপোলি হাত আকাশের দিকে মুঠো দোলাচ্ছে। সারাদিনের রোদ আলো এখনো তাদের শরীরে মাখামাখি। পাতায় পাতায় রঙের ফুলকি লাফিয়ে বেড়ায়। এই সব যুবতী গাছগুলো সাবাড় হয়ে যাবে। মৃত্যু ঢুকেছে। মাজরা পোকা। লেদা পোকা। কোলকাতায় আমাদের গুদোমে পেটি পেটি পোকামারার ওষুধ আছে। এই ট্যুর সেরে ফেরার পথে এখানে নামবো একবার। কথা বলবো এখানকার এজেন্টদের সঙ্গে। অনেক খাটুনির ফসল। বাঁচানো দরকার।

এই চিন্তাটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার এক তীব্র আকুলতা বুকের মধ্যে ছটফট করে।

আমাকে ছেড়ে দিন। আমার অনেক কাজ—ভেঙ্গে পড়া ভঙ্গীতে কথাগুলো বললাম।

ওরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। বাইরে ভারী বুটের একঘেঁয়ে শব্দ।

আমি খানিকটা সাহস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করি। বলি--আমার সুটকেশটা দিন। প্রমাণ হবে আমি কে, আমার কি পরিচয়।

সুটকেশে কি আছে দস্তিদার জিজ্ঞেস করলো।

জামাকাপড়। কোম্পানীর কাগজ আর বিষ।

বিষ। দু'জনে একসঙ্গে আঁতকে ওঠে। বিষ বিষ বিষ। নীরবতা চৌচির হয়। বাইরে একটা মুরগী ধারালো গলায় আর্তনাদ করে। তাকাই। দরজার ঠিক ওপাশে একজন সিপাই। হাতে ঝকঝকে লম্বা ছুরি। মুরগীর মাথাটা গলা থেকে ঝুলছে, যেন একটা লাল ঝুমকো ফুল। গলগলিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। স্কন্ধকাটা মুরগীটা তার হাতের মুঠোয় কাঁপছে। পাশে আর একটা মুরগী। দু'টো ঠ্যাং কলাগাছের ছড়ে বাঁধা। অবাক চোখে সে দেখছে। কিছুটা দূরে পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে বসে আছে একটা কুকুর। হলুদ, সাদা রঙ, ল্যাজ নাড়ছে। ধুলো উড়ছে।

পাশের ঘর থেকে কে যেন যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো। শালা শূয়োরের বাচ্চা। খানকির ছেলে। তারপর মারের আওয়াজ আর ক্রমাগত গোঙানি।

আমার শরীর ঘামে ভিজে। পাশের ঘরে গলার আওয়াজ, ভীতি প্রদর্শন। ঠিকানা চাই। বলতেই হবে। আমরা ঠিক জানতে পারবো। ঠিকানা বল।

আমার স্নায়ুতে, মজ্জায় এক অসম্ভব কাঁপুনি। বাইরে থেকে হয়তো বোঝা যায় না। অথচ ভেতরটা তছনছ হয়।

গুরুপদ আর দস্তিদার এখন চিংড়ি মাছের বাজার দর নিয়ে কথা বলছে। শেষ কোন নেমন্তন্ন বাড়ীতে সাতাশটা এক বিঘৎ লম্বা লব্‌স্টার খেয়েছে, গুরুপদ তার স্মৃতি রোমন্থন করছিল। পাশের ঘর থেকে একটা ট্যারা, লম্বা লোক এসে এর মধ্যে বার-দুয়েক গুরুপদর কানে কানে কথা বলেছে। লোকটা যেন সাক্ষাৎ জহ্লাদ। দেখে মনে হয় মানুষের ঘিলু মেখে ভাত খায়। আমাকে খরচোখে দেখে। লোকটার চোখের মণিটা লাল। লোকটা তৃতীয়বার ঘরে ঢুকলো।

হারামির বাচ্চা ওই জগদীশটার জন্যে হচ্ছে না। সর্বেশ্বরকে কায়দা করতে আর দশ মিনিট—সে বললো—ওরা এখনো জানে না, ওদের একনম্বর নেতা এই ঘরে বসে আছে।

লোকটা একটা সিগারেট ধরালো। বললো সর্বেশ্বর অজ্ঞান। দু'বার হলো। জ্ঞান ফিরলে এ ঘরে ওদের একবার আনবো।

হার্কিউলিসের বোতলটা কোথায়—গুরুপদ জিজ্ঞেস করলো।

আমার ড্রয়ারে।

লোকটা পাশের ঘরে চলে যায়।

নিতাই শালা আজ খুব টানবে—গুরুপদ বলে।

লোকটার নাম নিতাই। পাশের ঘরে আবার খানিকটা কাতরানি, খিস্তি, পেটানোর আওয়াজ। আমাকে নিয়ে এরা কি করবে ভেবে পাই না। একটা অচেনা ভয় পাকে পাকে আমাকে জড়িয়ে ধরে। চেলাদের যদি এই অবস্থা হয়, নেতার কি হাল হবে। তখনি আমার মনে পড়ে কাগজের কিছু টুকরো খবর, ছবি। বস্তায় অজ্ঞাতপরিচয় লাশ। মাঠে-ময়দানে মুণ্ডুহীন দেহ। মাটির তলায় কঙ্কাল সাদা হাড়।

নিতাই ঘরে ঢোকে। বাঁ চোখের লাল মণিটা টস্‌টস্‌ করে। দস্তিদারকে বললো—ঠিকানাটা দরকার। পেতেই হবে। আরো জনা দুই রুই-কাতলা ওখানে আছে। যাবো নাকি গুরুপদ জানতে চাইলো।

নিতাই বললো—না। এখনি সাহেবের ফোন আসবে। তোমরা এখানে থাকো।

গুরুপদ আর দস্তিদার আলোচনা করছে পুরোনো দিনের কথা। বাড়ীতে একটা পঞ্চাশ বছরের আধবুড়ি ঝি ছিল! গুরুপদ তার বুকে কামড়ে দিয়েছিল। বুড়িটা তারপর রোজ রাতে ওর কামড় খেতে আসতো। গল্পটা শেষ করে গুরুপদ হ্যা হ্যা হাসে।

আমার মাথায় চিন্তা থুড়ি-লাফ খায়। অফিসে একটা খবর গেলে আমি বেঁচে যেতাম। বাঁচতাম কি! একটা দুপুরের ঘটনা মনে পড়ে। বিজয়ার এক মামাতো ভাই, নাম অমিতাভ। আসতো আমার অফিসে। কি যেন পার্টি করে। চাঁদা নিত। এ্যাকাউন্টসের দাশ দেখেছিল একদিন। ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিল। অমিতাভ চলে গেলে জিজ্ঞেস করেছিল, ওকে চেনেন? ভয়ঙ্কর ছেলে। সেই থেকে দাশ এড়িয়ে চলে আমাকে। অফিসের আরো দু' পাঁচজনকে হয়তো বলেছিল। বিজয়ার মুখ চেয়ে অমিতাভকে না করিনি। অবশ্য কয়েক মাস অমিতাভ বে পাত্তা। আমার এই গ্রেপ্তারের একটা যোগসাজস খাড়া করার অসুবিধে নেই। বড়ো অসহায় বোধ করি।

ঘরটা এখন অন্ধকার। বাইরের আলো, রঙ নিভে গেছে। চারপাশে হাওয়ার সিরসির শব্দ। আকাশে গুটিকয়েক তারা জেগেছে।

পাশের ঘরে গলার শব্দ। প্যাণ্ট খুলে দে না। ওরকম রক্ত একটু বেরোয়। মুখে জল ঢাল।

দারুণ ছবি—গুরুপদ বললো—মাগীর বুকটা কি! উফ্।

আমাদের দেশে ওরকম সিনেমা হয় না—সায় দিল দস্তিদার।

ওরা একটা ইংরেজি ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করছিল।

কি হে শিবেনবাবু, দেখেছো ছবিটা—জিজ্ঞেস করলো গুরুপদ।

আমাকেই জিজ্ঞেস করছে। আমার নাম এখন শিবেন ওরফে আরো কত কি! ঘাড় নাড়ি। দেখেছি।

হুট্। শরীরের রস টেনে বার করে আনে—গুরুপদ বললো। তার মোটা ঠোঁট গলে যায়। লালা জবজবে।

শেষ দৃশ্যটা কাপড় ভিজিয়ে দেয়—যোগ করলো দস্তিদার। ওরা আমার দিকে তাকালো। মতামত জানতে চাইলো।

শেষ দৃশ্যটা দেখিনি—আমি বলি।

কেন ? কেন ? দু'জনে প্রশ্ন করে।

বমি পেয়েছিল।

ওদের মুখ গম্ভীর হয়। থমথম করে। দস্তিদারের জামা-কাপড় ভিজে সপসপে। গন্ধে হাওয়া ঘুলিয়ে ওঠে। আমি বিপদে পড়ি।

আসলে সিনেমা হলে ঢোকার মুখে এক বোতল দুধ খেয়েছিলাম! বোতলটা শেষ করার মুখে দেখি একটা মরা মাছি। মাছিটা গলে গিয়েছিল। খুব খারাপ লাগছিল শরীর। একটা পান খেয়ে ঢুকেছিলুম সিনেমায়। কিন্তু শেষের দিকে বেগটা সামলাতে পারছিলাম না। আমি বললাম।

ওরা নড়েচড়ে বসে। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। সামনে উঠোনেও একটা অল্প শক্তির আলো। এই ঘরের ভেতরে ফ্যাকাশে অন্ধকার। উঠোনের শেষে গোটা তিন-চার ঝাঁকড়া গাছ। অন্ধকারে ডাল-পালায় জড়াজড়ি।

বমি হলো—গুরুপদ জিজ্ঞেস করলো।

সামান্য।

তুমি শালা পোয়াতি, প্রেগনান্ট। পেটটা দেখি। গুরুপদর লোমশ, কালো হাতটা আমার দিকে এগোয়। বুড়ো আঙুলে পেটে খোঁচা দেয়। জিজ্ঞেস করে ক'মাস ?

আমার কথা আটকে গেছে। গলা থেকে কোঁক করে একটা আওয়াজ বেরোয়।

কোন কোম্পানীর দুধ—দস্তিদার জানতে চাইলো।

বেলগাছিয়ার। সরকারী দুধ।

দু'জনে হঠাৎ পাথর হয়ে যায়। দস্তিদারের ভিজে জামা-কাপড় থেকে সেই নোংরা গন্ধটা ছড়িয়ে পড়ে। গুরুপদ ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে। ঘরের মধ্যে বোম ফাটার অবস্থা।

কতো রকমের অন্তর্ঘাত হয় দেখো। দস্তিদার কথাটা বলে। গুরুপদ দাঁতে দাঁত টিপে যোগ করলো—বাস্টার্ড।

এদের প্রচার একটা মারাত্মক ব্যাপার।—দস্তিদার বিড়বিড় করলো—যে কোন

জিনিস ধরে এরা এগোতে পারে। সরকারী দুধে মাছি। অব্যবস্থা, দুর্নীতি। ঘুণধরা প্রশাসন। শ্রেণী স্বার্থ। জোচ্চুরি। শোষণের যন্ত্র। ভাঙো এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

পাশের ঘরে এখন কোনো আওয়াজ নেই। হাওয়ায় মাংস রান্নার গন্ধ ছুটে আসে। গুরুপদ বললো—নিতাই বোতলটা শুরু করে দিল নাকি?

দস্তিদার জবাব দিল না। বমি করে কোথায় গেলে—সে জিজ্ঞেস করলো। আমার কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ শব্দ। মাথাটা ভোঁতা। আমার প্রত্যেকটা কথায় আমি নিজে জড়িয়ে যাচ্ছি। গলাটা কাঠ।

কি হলো জবাব দাও—দস্তিদার টেবিল চাপড়ায়।

বিজয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল—আমি শুরু করি, কিন্তু হলো না।

কেন—দস্তিদার সজাগ।

রাস্তায় একদল ছেলে কি যেন ফ্ল্যাগ বিক্রী করছিল। কিনতে বললো। আমার ওসব ভালো লাগে না।

কি ফ্ল্যাগ?

জানি না।

তারিখটা মনে আছে?

আমি একটু ভেবে বললাল বোধ হয় ছাব্বিশে জানুয়ারী।

অন্ধকারে দুটো ধুমশো মানুষ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। শালা, দেশদ্রোহী। তুমি জেনেশুনে জাতীয় পতাকার অপমান করেছো। এড়িয়ে গেছো। বমি টমি ওসব বাজে কথা। সিনেমা হলে ছবি শেষ হওয়ার আগে কিছু লোক বেরিয়ে যায়। সে সব শুয়োরের বাচ্চাদের আমরা চিনি। জাতীয় সংগীত হয়। ইচ্ছে করে অশ্রদ্ধা, ঘৃণা ছড়াতে তোমরা এসব করো। দস্তিদার উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে।

আজ রাতে কপাল ফুটো করে দেবো—গুরুপদ তলার ঠোঁটটা দাঁতে কামড়ায়।

বাইরে বিশাল মাঠ। শস্যে ভরে উঠেছে। পরিষ্কার আকাশ। অনেক তারা ফুটেছে। ধূসর ছায়াপথে আলোর গুঁড়ো ওড়ে। কোথায় যেন একটা বিশাল রং-মশাল জ্বলছে। অজস্র আলোর ফুলকি চাঁদ, তারা, সূর্য, পৃথিবী হয়ে ঝড়ে পড়ছে। আলোমাখা ধোঁয়ায় তৈরী হচ্ছে ছায়াপথ। পোকামাকড়, মড়কে ছড়িয়ে পড়ে রঙমশালের বালি আর ছাই। রঙমশালটা জ্বলে যায়। ফুরোয় না।

ঘরের আলোটা জ্বলে ওঠে। সামনে নিতাই। দস্তিদার আর গুরুপদ খাড়া হয়ে বসে।

ওদের দু'জনকে এঘরে আনছি—নিতাই বললো—নেতাকে দেখে চমকে যাক। তারপর ঠিকানা বলবে।

আমার বুকের মধ্যে একটানা গুরগুর শব্দ হয়। দু'জন মানুষ, তাদের আমি চিনি না ,জানি না, কিন্তু তারা আমায় চেনে। সনাক্ত করবে। আমাকে দেখে তারা চমকাবে, ভয় পাবে। সঙ্গে সঙ্গে শেষ বিচার হয়ে যাবে। আমার গুলি খাওয়া লাশ পোকাধরা নতুন ধানখেতের গভীরে পড়ে থাকবে। পচে গলে মাটি হয়ে যাবে। কেউ দেখবে না। জানবে না।

বড়ো সাহেব কখন আসবে—গুরুপদ জিজ্ঞেস করলো।

কি জানি—দস্তিদার নীচু গলায় বললো—হয়তো রাতে আসবে না, ফোন ক'রে সারবে।

ঘরের আলোটা ম্যাটমেটে। সেটা ঘিরে ইতিমধ্যে কয়েকটা পোকা জুটেছে।

নিতাই এর সঙ্গে দু'জন ছেলে ঘরে ঢোকে। একজন দাঁড়াতে পারছে না। উর্দি-পরা এক সেপাই তাকে ধরে আছে। দু'জনের খালি গা। একজন স্রেফ জাঙ্গিয়া পরে আছে। অন্যজনের কোমরে গামছা জড়ানো। এলো মেলো মাথার চুল। জাঙ্গিয়া পরা ছেলেটার চোখ লাল। সারা শরীরে কালসিটে। গামছা পরার চোখের পাতা ভারী, আধবোজা। সিপাই-এর কাঁধে সে টলে টলে পড়ছে।

ওদের দেখে আমার বুকের রক্ত চলকে ওঠে। শরীরে কুলকুল ঘাম বয়। হৃৎ-পিণ্ডটা গলার কাছে আটকে থাকে। জাঙ্গিয়া পরা ছেলেটা আমার মুখের দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে থাকে।

নিতাই ধাক্কা দেয় গামছা জড়ানো ছেলেটাকে বললো—এই সর্বেশ্বর তাকিয়ে দেখ। চিনতে পারিস ?

সর্বেশ্বর ধীরে ধীরে চোখ খোলে। আমাকে দেখে। ইলেকট্রিক শক খায়। মণ্টুদা—একটা কাতরানি ওর গলায় ঠেলে ওঠে।

আমার দু'চোখ বেরিয়ে আসে। জাঙ্গিয়া পরার নাম জগদীশ। হঠাৎ সে বে-পরোয়া ভঙ্গীতে এগিয়ে আসে। ভালো করে আমায় দেখে। আমার গোটা শরীর কি এক প্রার্থনায় ফেটে পড়ে।

জগদীশ বললো—ইনি মণ্টুদা নয়।

সর্বেশ্বর ঠক ঠক করে কাঁপছে। তিনজন অফিসার একসঙ্গে ছিটকে ওঠে, সে কি ?

মণ্টুদা পরশুদিন দাড়ি কামিয়ে ফেলেছে—জগদীশ বললো— আমার সামনে। তাছাড়া মণ্টুদার থুঁতনি অন্যরকম।

গুরুপদ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে—ফলস্ দাড়ি।

ও আমার দাড়ি মুঠোয় চেপে ধরে টান দেয়। কষ্টে আমি চেঁচিয়ে ওঠি।

মুখ জ্বলতে থাকে। কয়েকটা চুল হাতে গুরুপদ দাঁড়িয়ে থাকে।

নিতাই হঠাৎ পকেট থেকে রিভলভার বার করে। খতম করে দেবো, সে গর্জায়। সিপাইদের ইশারা করে। জগদীশ আর সর্বেশ্বরকে নিয়ে ওরা অন্ধকার উঠোনে নামে। ঝাঁকড়া গাছের অন্ধকারে পাখি ডানা ঝাপটায়।

বাইরে পায়ের আওয়াজ কমে আসে। দূরে হঠাৎ ভেজা গলায় কে যেন কেঁদে উঠলো—বলবো। ঠিকানা বলবো।

অন্ধকার ভেঙ্গে অনেকগুলো মানুষ ফিরে আসে। উঠোনে নিতাই আর তার দল-বলদের দেখি। ওরা পাশের ঘরে ঢোকে। এর ফাঁকে নিতাই জানিয়ে গেল—সর্বেশ্বর বলেছে।

গুরুপদ আর দস্তিদারের মুখে চিন্তার ছাপ। ওরা এখন আমার দিকে তাকাচ্ছে না। আমি বেঁকে গেছি। তবু বুকের মধ্যে কি যেন এক ভার, কষ্ট।

টেলিফোন বাজলো। দস্তিদার ছুটে গেল। ইয়েস স্যার, আমরা শুনেছি। রাতারাতি দাড়ি কামিয়ে ফেলবে কে জানতো। ঠিক আছে স্যার ছেড়ে দিচ্ছি। রাতটা এখানে থেকে যান মিঃ রায়। ফোন ছেড়ে দস্তিদার বললো। ভুল হয়ে গেছে। রাতে এখানেই খাবেন। মুরগী মেরেছি। মাল আছে। আরও কিছু চান ? সে আমার দিকে তাকিয়ে চোখ নাচায়।

আমার ভয়ঙ্কর গা গুলোচ্ছে। পেট চেপে বলি, বমি করবো।

দস্তিদার আমাকে তুলে দাঁড় করাতে যায়। আমি ওকে ছুঁতে দিই না; বলি, এখনি যেতে হবে।

গুরুপদ বললো—থাকুন। আপনার মতো আর একজনকে দেখে যান।

আমি ওদের কথায় কান দিই না। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াই। একজন সিপাই আমার সুটকেস দিয়ে যায়। পেটের নাড়ী ভুঁড়ি পাক খাচ্ছে। বাইরে নিথর অন্ধকার রাত। রাস্তায় এসে প্রথমে বমি করি। সামান্য তেতো জল নাক-মুখ দিয়ে বেরোয়। একটা কালো গাড়ী হেড-লাইট জ্বেলে ছুটে যায়। পুলিশ ভর্তি। আলোয় চোখ ধেঁধে যায়। জ্বালা করে। সেই মুহূর্তে মাঠ, ঘাট, বন-বাদাড় থেকে হাজার লক্ষ পোকা ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসে। তাদের পাখার আওয়াজ, বিজবিজ ধ্বনিতে কানে তালা লাগে। তারা আমাকে ঘিরে ধরে। আমি হনহন করে হাঁটি। মাথার ওপর একটুকরো চাঁদ। হঠাৎ মনে হয়, আমার পেছনে আর একজন মানুষ। তাকে ঠিক আমার মতো দেখতে। হয়তো তার চোখদুটো একটু অন্যরকম, চোখের তারায় রঙমশালের ফুলকী ঝরছে। সেই মানুষটা নীচু গলায় বললো—গুদোম ভর্তি ওষুধ থাকতেও কেন মাঠে, খামারে, গোলায় রাশি রাশি তাজা ফসল নষ্ট হয়? কেন? কেন? দু'হাতে পোকার ঢেউ সরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে আমি পথ হাঁটি।

খয়ের খাঁর ইন্তেকাল

অন্ধকার একটু ঘন হতেই তিন হাঁড়ি গুড়জল আর দু কলসী তাড়ি খতম হয়ে গেল। শেষ মাঘের ঠাণ্ডা ভারী হাওয়ায় তাড়ি আর গুড়জলের কড়া গন্ধ। ফাঁকা হাঁড়ি-কলসীগুলো দাওয়ায় উঠোনে গড়াগড়ি যাচ্ছিলো। কয়েকটা ভর্তি হাঁড়ি কলসী এখনও মজুত আছে। সবে তো কলির সন্ধ্যে, সামনে এখনও গোটা রাত।

বুড়োরা কিন্তু এর মধ্যেই নেশার ধাক্কায় কিছুটা হেদিয়ে পড়েছে। কম-বয়েসী ছেলে-ছোকরারা মৌজের এই পয়লা চোটে বেমক্কা হাসাহাসি, খিস্তি আর কথায় টগবগ ফুটছে। নেশার ধুনকিতে বয়েসের ফারাক কেটে গেছে। ছেলে-বুড়ো বাপ-বেটা সব এখন একাকার। অন্ধকার দওয়ায় কে যেন একটা কেরো-সিনের লম্প বসিয়ে দিল। ম্যাটমেটে হলদে আলোর শিখার ওপর টানা কাল শীষ। আবছা হাওয়ায় সেটা সাপের জিভের মত হিলহিল করে।

দাওয়ার ওপর গায়ে গায়ে দুটো মেটে ঘর। ডানদিকের পূবমুখো ঘরটায় খয়ের খাঁ থাকত। ঘরটা এখন মিশমিশে অন্ধকার। ওই ঘরেই সদ্য তৈরী বাঁশের খাটুলিতে খয়ের খাঁর মৃতদেহ। খাটুলিতে এখনও কাঁচা বাঁশের তাজা গন্ধ। খাটুলির পাশে এক গোলা নারকেল দড়ি। কবরে নেওয়ার আগে মরা মানুষটাকে ওই দড়ি দিয়ে খাটুলির সঙ্গে জম্পেশ করে বাঁধা হবে। অন্ধকার ঘরে মরা মানুষটাকে ঘিরে গাঁয়ের যত মেয়েছেলে, ছুঁড়ি, বুড়ি আকাশ ফাটিয়ে কাঁদছে। কিছু আগেই ওরা পেটপুরে মাংস, ভাত খেয়েছে। কিছু বাড়তি খাবার এখনও পাশের ঘরে আছে। কান্নার ফাঁকে কেউ কেউ হঠাৎ উঠে সেখান থেকে দু'-এক টুকরো মাংস মুখে ঢুকিয়ে আসছে। গম্ভীর মুখ, শিবের বাপের সাধ্যি নেই ধরতে পারে। আসলে কান্নার ধকল তো কম নয়। কাঁদলে যে বেজায় খিদে পায়।

বুড়ো দেবরদ্দি শেখ হেঁকে বললো—ও হোচেন, মড়াটাকে খাটুলিতে বেঁধে ফেল। মুই যা আন্দাজ করছি, এর পর তো কেউ আর সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।

হোচেন কোন সাড়া করে না। ব্যাজার মুখে চুপচাপ বসে থাকে। গত দু'দিন ধরে কম ধকল যায় নি। কবর খোঁড়া, বাঁশঝাড় থেকে খাটুলির বাঁশ কাটা, বাজার-হাট এবং নানা-মানুষের হাজার প্রশ্ন। হোচেন জেরবার হয়ে গেছে। মাথার মধ্যে কেমন এক ভোঁ ভোঁ ভন ভন শব্দ। বুদ্ধিশুদ্ধি ওর বিশেষ নেই। যেটুকু আছে, সেটুকুও ঘুলিয়ে কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেছে।

খয়ের খাঁ অবশ্য বেমক্কা মরে নি। দু'দিন আগেই ভোর রাতে হোচেনকে ঘুম থেকে তুলে বলেছিল—পরশু মোর ইন্তেকাল। গোটা গাঁয়ে লুটিস দে। ঠেলে গুড়জল আর তাড়ি বানা। অভাব ঝ্যানো না হয়। টাকার কথা ভাবিস নি।

মাঘের ভোর। ফ্যাকাশে আঁধার গাছ-লতা, আকাশে তখনো জড়িয়ে আছে। খয়ের খাঁর মুখের দিকে ঘুম জড়ানো চোখে হোচেন তাকিয়েছিলো। বুকভাসানো একমুখ সাদা দাড়ি-গোঁফ, মাথায় মস্ত টাক জ্বলজ্বলে দুটো চোখ খয়ের খাঁ এই শ্রাবণে একশো পাঁচ বছর পেরিয়েছে। বুড়োটার সব কথা হোচেন ধরতে পারে না। তার ভ্যাবাচাকা মুখ দেখে মুচকি হেসে খয়ের খাঁ বললো—খুদার তলব এয়েচে। এবার যাতি হবে। একটু আগে মোর দাদাজান, মোর বাপের বাপ মোর ঘরে এইচিল। বাঁচলে তেনার আজ আটকুড়ি তিন বছর বয়েস হতো। গোড়াতে তো মুই চিনতে পারিনি। পরে তামুকের বাস নাকে ঢুকতে মালুম হলো, আরে এযে দাদাজান। থেলো হুঁকোর গুড়ুক গুড়ুক শব্দ আর তামুকের ধোঁয়ায় কি খুশবু।

হোচেনের কাঁধে ঠেলা দিয়ে খয়ের খাঁ বললো—নাক টান নাক টান, এখনো সে বাস হাওয়ায় নেগে আছে। তা দাদাজানও বললো, বাপরে তৈরী থাকিস। পরশু আসবো।

ঘুমের চটকা কাটিয়ে হোচেন সোজা হয়ে বসে ছিল। খয়ের খাঁর কথাগুলো এখন ওর বুঝতে অসুবিধে হয় না। বাইরের আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। দূর দূরান্তের পাখীর ডাক গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে যায়। হোচেনের ঘরের একহাতি খোলা জানলা দিয়ে হাল্কা হাওয়া ছুটে এলে ও হঠাৎ দামী তামাকের মিঠে গন্ধ পেল। ওর গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে উঠলো।

অন্ধকার ঘরে মড়ার পাশে মেয়েরা খেপে খেপে কাঁদছে। রব্বানির বৌ-এর চড়া গলা সকলকে ছাপিয়ে যায়। মোল্লার ডাঙ্গায় একদল শেয়াল উঁচু পর্দায় ডেকে ওঠে। মানুষ আর পশুর গলা এখন আলাদা করা মুস্কিল। উঠোনে ছোকরাদের জটলা থেকে বেতাল পায়ে রব্বানি উঠে আসে। হোচেনের কানের কাছে মুখ এনে বলে—দু'হাঁড়ি গুড়জল আড়ালে সরিয়ে রাখ। গোর দেওয়ার পর লাগবে।

হোচেন কি যেন বিড়বিড় করলো। রব্বানির শোনার সময় নেই। ওর ভাগের আধভাঁড় মাল তখনও খাওয়া বাকী।

উঠোনের অন্ধকার থেকে একিন হেঁকে ওঠলো—ও হোচেন মোদের এট্টু মাংস দে যা।

একঝাঁক জোনাকি হঠাৎ অন্ধকার মাঠ ছেড়ে উঠোনের মধ্যে উড়ে এলো।

হোচেনের পেছনে দাওয়ার ওপর এককোণে জাত বাঁচিয়ে তারিণী মাল আর ঋষি বাগ মুখোমুখি বসে আছে। ওদের দুজনের হাতে দুটো কলাই-এর গ্লাস। সামনে

আধহাঁড়ি গুড়জল। কলাপাতায় কয়েক টুকরো মাংস। ঋষি এখনো মাংস ছোঁয় নি। তারিণী বললো— খেয়ে দেখ ভাল খাসী। এক লম্বর নয়।

ঋষির জিভ সুড়সুড় করছিলো। আবার কি ভেবে ও ভরসা পেল না। ঋষি বললো—গুলি মারো মাংস। আমার টাকের কি হবে।

একমুখ বিষাদ নিয়ে মাথাজোড়া কালো টাকে ঋষি হাত বুলোয়। ঋষির বয়েস এখনো চৌত্রিশ পুরোয়নি, এর মধ্যেই মাথা ফাঁকা। এ যে কি কালরোগ ডাক্তার বদ্যি ধরতে পারে না। সাধের ঢেউ খেলোনো বাবড়ি বছর ঘুরতেই ছিটে কাঁটার বেড়া। ঘরে ডবকা বৌ। শ্বশুরবাড়িতে একপাল শালী। দুঃখে ঋষির বুক ফাটে। শেষ পর্যন্ত খয়ের খাঁর ঝাড়নে কাজ হচ্ছিল। নতুন চুল না গজালেও পুরোনোগুলো মাথায় আটকে ছিল! গতকালও খাঁ-সাহেব তিন ফুঁয়ের ঝাড়ন দিয়েছে। এরপর যে কি হবে। বেজায় দুঃখে ঋষি আধগ্লাস মাল চোঁ-চোঁ টেনে নেয়।

তারিণী বললো, আমার ভায়রাভাই একটা টোটকার কথা বলেছিল। সেই টোটকায় তার কাজও হয়েছিল। এখন মাথাভর্তি চুল।

উত্তেজনায় ঋষি প্রায় লাফিয়ে ওঠলো—কি? কি ওষুধ?

হাতের গ্লাসে তারিণী সুরুৎ সুরুৎ চুমুক লাগিয়ে একটা বিড়ি ধরালো। তারপর ঋষিকে জিজ্ঞেস করলো—তোর বউএর বয়েস কতো?

বাইশ—ঋষি জানালো।

ফাস কেলাস—তারিণী ফুট কাটলো—মোক্ষম বয়েস। খুব কাজ হবে।

তারিণীর হেঁয়ালী ঋষি ধরতে পারে না। হাবার মতো তাকিয়ে থাকে। বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়ে তারিণী বললো টাকের সেরা দাওয়াই হলো নুনজল। যে সে নুনজল নয়, মেয়ে-মানুষের শরীরের নুনজল, যেটা সকালে প্রথম বেরোয়, রোজ তাই দিয়ে টাক ধুতে হবে। দিনসাতেকেই কাজ হবে।

ঋষি বেদম খচে যায়। বলে—তোর মুখে জুতো মারবো।

তারিণী খুকখুক করে হাসে। ওদের পায়ের তলায় একটা হুলো বেড়াল মাংসের লোভে চোখ জেলে বসে থাকে। সদরে হঠাৎ কয়েকজন চেঁচিয়ে ওঠলো—বড়োবাবু এসতেছে। বড়োবাবু…।

বড়োবাবুর নামে তারিণী আর ঋষিও সোজা হয়ে বসলো। তারিণী বললো—ফেরার সময় গেলাস দুটোর কথা মনে রাখিস।

কলাই-এর গ্লাস দুটো তারিণীর। মুসলমান বাড়ীর বাসনে খাওয়া বারণ। তাই এ দুটো আনতে হয়েছে।

বড়োবাবু দাশু হালদার সঙ্গী গেনু দাসকে নিয়ে গটমট করে দাওয়ার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালো। হাতের পাঁচ ব্যাটারির টর্চ মেরে চারপাশ দেখে বললো—আসর বেশ জমে উঠেছে দেখি।

দেঁতো হাসি মুখে টেনে দেবরাদ্দি বুড়ো বলে—এজ্ঞে এই এট্টু।

দাশু হালদার বললো—তোদের কারবারই আলাদা। মানুষ পয়দা করেও আনন্দ, মরে গেলেও আনন্দ। সবেতেই ফূর্তি আর গুড়জল।

দেবরদ্দি হেঁ হেঁ করে। বড়োবাবুর গলা শুনে ঘরের মেয়েরা তুখোড় কান্না জুড়ে দেয়। মোল্লার ডাঙ্গায় শেয়ালেরা চমকে চুপ মেরে যায়।

দেবরদ্দি ঘরের মেয়েদের পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিলে দাশু হালদার মরা মানুষ-টিকে দেখার জন্যে ভেতরে ঢুকলো। পাশে গেনু দাস। নতুন কাপড়ে ঢাকা বাঁশের খাটুলিতে খয়ের খাঁ শুয়ে আছে। দেবরদ্দি মুখের ঢাকাটা সরালে দাশু হালদার টর্চ মারে। পাকা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মরা মানুষটার দু-চোখ বোজা। মুখে কেমন এক মুচকি হাসি। দাশু টর্চ নিভোয়। ঘরে এখন স্রেফ একটা কুপি জ্বলছে। কাঁচের শিশির ঢাকা ফুটো করে বানানো। সরু শিখায় ফিকে আলো।

নীচু গলায় দেবরদ্দি জিজ্ঞেস করলো—কর্তা এট্টু খাবেন তো?

দাশু হালদার খেঁকিয়ে উঠলো—তোদের কি আক্কেল নেই? মরা মানুষকে নিয়ে মজা মারিস!

এজ্ঞে এটাই তো মোদের কানুন। বাপ-ঠাকুরদার আমল থেকে চালু আছে—দেবরদ্দি কাঁচুমাচু হয়ে বললো।

এাকিন একটা মোড়া এনে দিলে হালদার ঘরের মধ্যেই বসলো। বেঁটে মোটা কালো, বছর পঞ্চাশ বয়েস, লুঙ্গি আর গেঞ্জির ওপর কাশ্মিরী শাল। হালদারের চাপে মোড়াটা মচমচ করে। পিঠের শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে হালদার বললো—বড়ো ব্যথা। বাইরে ঠাণ্ডাটাও পড়েছে।

আর বলতে হয় না। দেবরদ্দি চেঁচায়—ও হোচেন কর্তাকে এট্টু গুড়জল দে।

হোচেনের নাম শুনেই দাশু হালদার রেগে জিজ্ঞেস করলো—সে শালা কোথায়? ওর হাতে খাবো না। ও আমায় বিষ দেবে।

দেবরদ্দি ভড়কে যায়। দাশুকে নরম করার জন্যে বলে—কি যে বলেন কর্তা। ওসব পুরনো দিন ভুলে যান। হোচেন এখন অন্য মানুষ।

গেনু দাস হাতের রেশন ব্যাগ থেকে দুটো কাঁচের গ্লাস বার করে এাকিনকে দিল।

দাওয়ার বাঁশে হেলান দিয়ে হোচেন ভেতরের সব কথা শোনে। তারিণী আর ঋষিও শুনেছে। হোচেনের দিকে একটু ঝুঁকে তারিণী বললো—হালদার শালা একটা শুয়োর।

হোচেন কথা বলে না। ওর মাথায় তখন কি এক বিজলী চমকে ওঠে। ধাঁধা লাগা ঝিমধরা ভাবটা কেটে রক্তে আর শরীরে এক অচেনা দুলুনি।

পরশু দিনের সেই সকালটা হঠাৎ যেন ওর সামনে জ্যান্তো হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। খয়ের খাঁ বলেছিল—এবার তোর সুদিন আসছে। খুদা তোর মনের সাধ হাসিল

করবে। চোখ-কান খোলা রাখিস।

খয়ের খাঁ হয়তো আরো দুচার কথা বলতো। কিন্তু বাইরে তখন রব্বানি চেঁচাচ্ছিল—দাদা ছাহেব। ও দাদা ছাহেব।

খয়ের খাঁ বেরিয়ে গিয়েছিল। আবছা অন্ধকার ঘরে ভুঁয়ে পাতা ছেঁড়া ক্যাঁতার বিছানায় হোচেন আরো কিছু সময় বসে থাকলো। তামাকের বাসটা ঘরের থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। বাইরে অনেক পাখির গলা, ডাকাডাকি। গাছগাছালি, মাটি থেকে সকালের আলো বেরোচ্ছে। হোচেন ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। খয়ের খাঁর গরু ছাগল নিয়ে এখন মাঠে যেতে হবে। মুর্গির ঘরের ঝাঁপ খোলা দরকার। গেঁতোমি করার সময় নেই। দরজার ঝাঁপ ঠেলে দাওয়ায় পা দিয়ে হোচেন দেখলো খাঁ ছাহেব রব্বানির বিবির মাথায় ফুঁ দিয়ে মন্ত্র পড়ছে। রব্বানির বিবির নাম আমিনা। বছর কুড়ি বয়েস। বিয়ে হয়েছে চার বছর। আমিনার পেটে বাচ্চা থাকছে না। এরমধ্যে বার তিনেক গর্ভ খসে গেছে। বিবির ঠিক পেছনে শরীরে খেঁটো ধুতি আর ময়লা গেঞ্জির ওপর তেলচিটে গামছা জড়িয়ে রব্বানি উবু হয়ে বসে ছিল।

আমিনার মাথায় তিনবার লম্বা ফুঁ দিয়ে খয়ের খাঁ মন্ত্র পড়লো—

ওরে ওরে পেঁচো তুই বড় শয়তানের জাত, নারীর উদরে ঢুকে করিস গর্ভপাত।

আনাচে কানাচে ছাঁচতলায় আর নর্দমাতে থাকিস,
নারীর উদরে ঢুকে সর্বনাশ করিস।
সেলেমানী জেন্দানে তোকে কয়েদ করিব,
আফসুন, জাব্বার কাহার নামে তাড়াইব।

পূব আকাশের কাঁচা আলোয় খয়ের খাঁর মুখ দাড়ি ভেসে যাচ্ছিল। দুচোখ বোজা মানুষটা যেন এখন পীর পয়গম্বর। আরো কিছু রুগীভুগী এর মধ্যে জুটে গেছে। কারো মুখে কথা নেই। অবাক চোখে তারা গুণীনের কাজকর্ম দেখে। গুণীন হিসেবে খয়ের খাঁর নামডাক আছে। উঠোনে দাওয়ায় টেকো ঋষি। তার পাশে ছানু মোড়ল। ওখানে ছড়ানো মানুষগুলোকে হোচেন চেনে। ছানুর বৌয়ের পোয়াতি খাঁচনী। খাঁ সাহেবকে একবার নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। মানুষের রোগ ভোগ, আলাই-বালাই-এর শেষ নেই। তবে খাঁ সাহেব ধন্বন্তরি। ওনার হাতের ছোঁয়া লাগলে সব রোগের নিকেস হয়।

খাঁ সাহেবের ঘরের মধ্যে তখন দাশু হালদারও সেই কথা বলছিল—আমার কাঁক-বেড়ালী ব্যামোটা আবার চাগাড় দিলে কি হবে কে জানে।

দেবরদ্দি সান্ত্বনা দেয় ঘাবড়াবেন না কর্তা। খাঁ সাহেব আপনার রোগের গুষ্টির তুষ্টি করে দিয়েছে। ও রোগ আর আপনার কাছে ঘেঁসবে না।

দাশু হালদারের কুঁচকিতে গুলি পাকানো পুরোনো ব্যথা বহুদিন জমাট বেঁধেছিল। অমুন তেজী জাঁদরেল মানুষটা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতো না। শেষমেশ খাঁ

সাহেবের ঝাড়ফুঁকেই সে রোগ সারে। এটা গত সনের ঘটনা। খাঁ সাহেবকে তাই হালদার খুব মান্যিগন্যি করতো। আর হোচেন যে হাজত থেকে ফিরে এলো তার কারণও তো খাঁ সাহেব। তা না হলে দাশু হালদার তাকে কালাপানি পার করে দিত। দাশু হালদার কারো ওপর রাগলে এই খলসেপোতা গাঁয়ে তার করে খাওয়া মুস্কিল।

দেবরদ্দি বলছিল খাঁ সাহেবের মৃত্যুর ঘটনা। গোটা ব্যাপারটা যেন একটা ছবি। নমাজ পড়া শেষ করে খাঁ সাহেব কোরান হাতে মাটিতে মাথা ছোঁয়ালো। পিঠের ওপর নতুন কাফন। তারপর ধীরে ধীরে মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে পড়লো। নিমেষের মধ্যে সব শেষ। উঁচু দরের লোকেরা এভাবেই মরে।

ওদের কথার ফাঁকে ফাঁকে হোচেনের মাথায় পুরোনো দিনের ঢেউ চলকায়। উঠোনের হিমেভেজা অন্ধকারে মানুষগুলো জড়ানো গলায় কথা বলে। কাঁদুনে মেয়েদের মধ্যে কি নিয়ে বেশ ঝগড়া বেঁধেছে। ঋষি আর কার্তিক এখন ভূত নিয়ে কথা বলছে। মোচরমানরা মলে হয় মামদো ভূত—ঋষি বললো। আর বামুনের ভূতের নাম বেম্মদত্যি—তারিণী জানালো—দু বেটাই ঘাড় মটকায়। দাওয়ার ওপর ঋষি প্রায় কাত হয়ে পড়েছে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে তারিণী বসা। একটা কুটুরে পেঁচা বেঢপ গলায় ডাকতে ডাকতে অন্ধকার আকাশে উড়ে গেল।

খয়ের খাঁর লাশ সামনে রেখে হালদার কি এক রসিকতায় খলখল করে হাসছিল। হোচেন বোঝে ওদের নেশা জমে উঠেছে। রাত আরো ভারী হলে হয়তো হালদার কর্তা খয়ের খাঁর পাশে মেঝেতে গড়াগড়ি দেবে। তারপর বেহুঁশ, অসাড়। গোটা দুনিয়া কড়া গুড়জলের ধুনকিতে তখন বেবাক হজম, আর এই ছবিটা মাথায় আসতেই ওর শরীরটা চমকে সটান হয়ে যায়। সেই বিকেলে এক গেলাস তাড়ি খেয়েছিল ও। খালি গেলাসে এখন গুড়জল। মুখের সামনে গেলাসটা তুলেও হোচেন নামিয়ে রাখে। কি একটা মতলব গোখরো সাপের মতো মাথায় ফণা তুলে ফুঁসে উঠলো। খয়ের খাঁর কথাগুলো ওর মনে পড়লো। চোখ কান খোলা রাখতে হবে। খুদা এবার ধান্দা হাসিল করবে। আকাশে একটুকরো চাঁদ উঠতে হিজলগাছের ছায়া উঠোনে ছড়িয়ে পড়ে। সেই ছায়ায় হোচেন চিনিবিবিকে দেখতে পায়। ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। ধোঁয়াটে চেহারার চিনিবিবি ক্রমশঃ রক্ত-মাংসের মানুষ হয়ে যায়। মুখে শুকনো হাসি। হোচেনের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চায়। হোচেন শুনতে পায় না। হিজল গাছের ছায়া তিরতির কাঁপে।

মাস ছয়েকও হয়নি চিনিবিবি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে। হালদারদের বড়ো পুকুরের পাশে লিচুগাছের ডালে ভরসকালে চিনিবিবির ঝুলন্ত শরীরটা প্রথম দেখেছিল গেনুদাস। আষাঢ়ের প্রথম বর্ষা তখন নেমেছে। মাঠ ঘাট গাছপালা ভিজে। দিন-রাত বৃষ্টি হচ্ছে। সেই দুর্যোগ মাথায় করেই মাঝরাতে চিনিবিবি

লিচু গাছের মগডালে চেপে গলায় দড়ি দিয়েছিল। খবরটা শুনে হোচেনের মাথায় বাজ পড়লো। সামনে হপ্তায় চিনিবিবিকে ওর নিকে করার কথা। পলাশপুরের মৌলবী ছাহেব কলমা পড়াবে। কথাবার্তা পাকা। বাজার থেকে একটা সস্তার শাড়িও চিনিবিবিকে ও কিনে দিয়েছিল। এবার নিজের চালাঘরটা সারাবে। খড় বদলে নতুন মাটি লাগাবে। সবকিছু উল্টে গেল। মাঝে সাতদিন ও ঘরে ছিল না। টাকার ধান্দায় আমতলার হাটে রামু ঘরামির সঙ্গে লাগাতার কাজ করেছিল। এই সাতদিনে যে কি এমন ঘটে গেল, ও ভেবে পেল না।

শাড়িটা চিনিবিবিকে দেওয়ার সময় চিনিবিবি বলেছিল—হালদার কর্তা আমাকে কাল জবাব দিয়েছে।

দাশু হালদারের ঢেঁকিশালে ও প্রায় দেড় বছর কাজ করছিল। ইদ্রিশ—চিনিবিবির সোয়ামী ছিল হোচেনেরই বন্ধু। মাঝির নৌকায় সুন্দরবনে কাঠ আনতে গিয়ে নিখোঁজ। অনেক চেষ্টা করেও কোনো পাত্তা মেলেনি।

শুকনো মুখে চিনিবিবি সেদিনও এইভাবে হোচেনের দিকে তাকিয়েছিল। কি যেন সে বলতে চাইছিল, অথচ লজ্জায় বলতে পারছিল না। হোচেন খোঁচালো জবাব দিল কেন ?

মাথায় কাপড়টা সামলে চিনিবিবি কিছুক্ষণ উসখুস করে বলে—কর্তা চায় মুই বাজারে ঘর নে থাকি। তোমার সঙ্গে নিকের খবরে উনি চটেছেন।

হোচেন গুম হয়ে গিয়েছিল। চিনিবিবির ওপর যে হালদারের নজর পড়বে এটা সে ভাবেনি। চিনিবিবিকে হালদার বাজারের মেয়েমানুষ বানাতে চায়। হোচেনের মাথায় ধিক-ধিক আগুন জ্বলে। হালদারের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কথা বলার সাহস নেই। তবু কিছু করা দরকার। তুই কি বললি—কোনো কথা না পেয়ে হোচেন জিজ্ঞেস করেছিল।

মুই বলেছি তোমার সাথে কথা কইতে—চিনিবিবি জানিয়েছিল।

হোচেনের আর দাঁড়াবার সময় ছিল না। আমতলায় রামু ঘরামি তার জন্যে বসে থাকবে। এখনি যেতে হবে। চিনিবিবির মুখ দেখে হোচেনের মনে হয়েছিল কাল থেকে মেয়েটা উপোস দিচছে। কিছু খায়নি। অথচ তার ঘরে বা নিজের কাছে একটা টাকা নেই যে চিনিবিবিকে দেবে। শাড়ি কিনে হোচেন ফতুর হয়ে গিয়েছিল।

হোচেন বলেছিল—ঘাবড়াস নি। মুই সাত দিনে ফিরব। তারপর নিকে হবে।

হোচেন ঠিক সাতদিন পরেই ফিরেছিল। চিনিবিবির গলায় দড়ির খবরটা দিয়েছিল এিকন। তার সঙ্গেই হোচেন গেল চিনিবিবিকে দেখতে। চিনিবিবির দিকে তাকিয়ে হোচেনের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ওর দেওয়া নতুন শাড়ীটা দু টুকরো করে একটা টুকরো চিনিবিবি কোমরে জড়িয়েছে। বাকীটা গলায় বেঁধে ঝুলছে।

একটা কাপড়ে এসেই হয়ত চিনিবিবি ঠেকেছিল। তাই মরা আর লজ্জা বাঁচাতে এ ছাড়া কোন পথ ছিল না। চিরকালের বোকাসোকা মেয়েমানুষ চিনিবিবি জানত না যে মরার পর আর লজ্জা করেনা। লিচুগাছের ডালটা পুকুরের জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। জলের ওপর চিনিবিবির ছায়া দোল খাচ্ছিলো। হোচেন আর দাঁড়াতে পারলো না। ফাঁকা মাথা। ও সরে এলো।

বেলার দিকে পুলিশ এলো। গাঁয়ের বাবুদের সঙ্গে তাদের কথা হ'ল। একটা কালো গাড়ীতে চিনিবিবির লাশ তুলে তারা চলে যেতে হাওয়ায় একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল। গুজবটা হোচেন আর চিনিবিবিকে নিয়ে এক ভয়ংকর কেচ্ছা। চিনিবিবির পেটে নাকি হোচেনের বাচ্চা ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা না কাটতেই আবার পুলিশ এসে হোচেনকে তুলে নিয়ে গেল। তারপর এক মাসের বেশী পুলিশ হাজত আর জেলখানা। খয়ের খাঁর দয়াতেই হোচেন বেঁচে যায়। তাছাড়া চিনিবিবির পেট চিরে আধসেদ্ধ কলমী শাক এবং জল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় নি। থানার অন্ধকার ঘরে, জেলখানায় বসে হোচেন অনেকবার ভেবেছে—চিনিবিবি মরল কেন ?

গাঁয়ে ফিরে শুনেছে—স্রেফ খিদের জ্বালায়। পাঁচ দিন নাকি ওর ঘরে চুলো জ্বলে নি।

হিজল গাছের ঝাঁকড়া ছায়াটা হঠাৎ তখন যেন উঠোন থেকে মুছে গেছে। হোচেনের ঘোর ভাবটা কেটে যায়। গেলাসের গুড়জলটা ও উঠোনের ধারে ঢেলে দিতে জলের ছরছর শব্দ হয়। অন্ধকারে দলাপাকান কে একজন যেন হেঁকে ওঠে—কোন শালা গায়ের ওপর......।

কত রাত হল হোচেন আন্দাজ করার চেষ্টা করে। মাঝ উঠোন থেকে রব্বানি বললো—ও হোচেন ভাই, এবার খাঁ ছাহেবকে নে চলো। এরপর আর হেঁটতে পারব না। এখনই মাথায় চক্কর দিচছে।

খয়ের খাঁর ঘরে বোতলের কুপিটা নিভে গিয়ে মিশমিশে অন্ধকার। ঘরের ভেতর থেকে কোন আওয়াজ আসছে না। দাওয়ার লম্পটাও নিভু-নিভু। সেটাই তুলে নিয়ে হোচেন ঘরে ঢোকে। ও যা ভেবেছিল তাই। দাশু হালদার, গেনু দাস আর দেবরদ্দি তিনজনেই কুপোকাত। হোচেনের পায়ের ধাক্কা লেগে খালি হাঁড়িটা গড়াতে গড়াতে দেবরদ্দির মাথায় লাগে। দেবরদ্দি জড়ান গলায় কি যেন বিড়বিড় করলো। ঘরের মধ্যেটা বড় ঠাণ্ডা। কে যেন হোচেনের কানে ফিসফিস করে—চোখ কান খোলা রাখ। সুদিন এসতেছে।

হোচেন কাজে লেগে গেল। বাঁশের খাটুলিতে লাশ বাঁধলো। নতুন কাপড় ঢাকা দিল। সাদা দাড়ি গোঁফ পীরের মত এই মানুষটা গত ছ মাস তাকে জায়গা দিয়েছে। লোকটার সাতকূলে কেউ নেই। এই গুণী মানুষটার কোন কথা

মিথ্যে হয় না। ওর মনের আশ মিটবে। হোচেন ঘেমে যায়। প্রায় মাঝ রাতে গাঁয়ের জনা ছয়েক তাগড়া ছেলে, যারা টলমলে পায়ে তখনও খাড়া ছিল, তারাই খয়ের খাঁর খাটুলিটা কাঁধে তুলে গোরোস্থানে নিয়ে গেল। খাটুলিতেও খড়ের বিঁড়ের ওপর দু হাঁড়ি গুড়জল। খয়ের খাঁর ভিটে থেকে গোরোস্থান পাঁচ মিনিটের পথ। অন্ধকারে থোকা থোকা জোনাকি জ্বলে। হাঁটার তালে তালে হাঁড়ির গুড়জল চলকে উঠে মৃতের পা ধুয়ে দেয়।

কবর খোঁড়াই ছিল। কবরের পাশে দুটো কোদাল। লাশটা গর্তে রেখে ওরা দ্রুত হাতে মাটি চাপা দেয়। গোরোস্থানের পাশে মজাহাজা পানা পুকুর থেকে পচা ঝাঁঝি আর পাঁকের গন্ধ বেরোয়। মাটি দেওয়ার পর কবরে বসেই শুরু হয় আর এক দফা গুড়জলের আসর। মোল্লার ডাঙ্গায় আবার শিয়ালেরা ডেকে ওঠে। পুকুর পাড়ের চালতা গাছের ঘন সবুজ পাতায় একটা লিকলিকে লাউ-ডগা সাপ দুলতে থাকে। কবরের জটলা ছেড়ে হোচেন বাইরে এসে দাঁড়ায়। তারপর অন্ধকার আল-পথ ধরে পূব মুখো হাঁটতে থাকে। কেউ খেয়াল করে না।

পরদিন সকালে গেনুদাস আর দেবরদ্দির হৈ-চৈ শুনে দাওয়ায় উঠোনে মানুষ-গুলোর নেশা ছুটে গেল। সকালের পাতলা আলোয় চারপাশ ধোঁয়াটে। দেবরদ্দি চেঁচায়—ও হোচেন, ও এাকিন এখনো খাঁ ছাহেবকে গোর দিলি নি ?

গেনুদাস জিজ্ঞেস করলো—বড়বাবু কোথায় ?

এাকিন রব্বানি, ফজলেরা ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলো, দাড়িওলা সেই বুড়ো মানুষটার দেহ ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। ওরা ভয় পেয়ে যায়। এ যে জিন পরীর খেলা। ভুতুড়ে কাণ্ড। গাঁ শুদ্ধ লোক ওদের সঙ্গে আবার গোরো-স্থানে যায়। খয়ের খাঁর কবর খুঁড়ে দেখা গেল নতুন কাপড়ে ঢাকা দাশু হালদারের শক্ত কাঠ লাশ। লোকটা অনেকক্ষণ মরে গেছে।

রব্বানি জিজ্ঞেস করলো—হোচেন কোথায় ?

খোঁজ খোঁজ পড়ে যায়। কোথায় হোচেন ? অন্ধকার রাতে সে একা একা সুদিনের খোঁজে চলে গেছে।

শবসাধনা

ঘরের মাঝখানে জ্বলছে দুটো জোরালো স্পট লাইট। মেঝেটা ভেসে যাচ্ছে আলোয়। আগুনের মতো চোখ ঝলসানো সে আলো।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটা বেঞ্চে সুমন বসে আছে। সে জায়গাটা অন্ধকার। ধোঁয়াটে অন্ধকারে সুমনকে আবছা দেখা যায়। জোরালো আলোর ঠিক নীচে দুটো টেবিল। কিছুটা ছাড়াছাড়া। দুটো টেবিলের ওপর একটা লোহার রড।

সেই রড থেকে শীর্ষাসনের ভঙ্গীতে ব্রততী ঝুলছে। ব্রততীর ভাঁজকরা হাঁটুর মধ্যে রয়েছে রডটা। গোড়ালি আর উরু শক্ত করে বাঁধা, যাতে ও পড়ে না যায়।

ব্রততীর শাড়ীটা একটা টেবিলের ওপর তালপাকানো পড়ে আছে। ব্রততীর পরণে এখন শুধু একটা শায়া, ব্রততীর এখন জ্ঞান নেই। সুমন সুস্থ, স্বাভাবিক। গায়ে আঁচড় পরেনি তার। ইনস্‌পেক্টর সমাদ্দার জানে এই কেসে মারধোরে কাজ হবে না। ঘণ্টাচারেক আগে সমাদ্দার নিজের বাহিনী নিয়ে সুমনকে ধরেছে। ছোঁড়াটা যেন পাঁকাল মাছ, মুঠোয় এসেও বেশ কয়েকবার ফস্কে গেছে। রাগে সমাদ্দারের শরীর রি-রি করে। আপাততঃ সেটা জমা থাকে। এখন আসল খবরটা চাই। সকালের আগেই জানা দরকার।

সুমনের ধরা পড়ার কথা প্রচার হয়ে গেলে বড়ো শিকারটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেটা দলের চাঁই। তাকে ধরতেই হবে। সে লোকটার সঠিক হদিশ এই সুমনই দিতে পারে। তাই সুমন ধরা পড়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই ওর স্ত্রী ব্রততীকেও তুলে আনতে হয়েছে। যে পূজোয় যে মন্ত্র! অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে ইনস্‌পেক্টরকে শিখতে হয়েছে এসব।

একনাগাড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ঘরের দরজার পাশে পাখার তলায় চেয়ারে ইনস্‌পেক্টর বসলো। রুমালে কপালের ঘাম মুছে ব্রততী আর সুমনের দিকে পরপর তাকালো। সামনের টেবিলের ড্রয়ার খুলে রামের বোতলটা বার করে সমাদ্দার দেখলো, মাল প্রায় শেষ। বোতলে মুখ লাগিয়ে দু'চুমুক খেলো। আজকাল আর গলা জ্বলে না।

স্কুলে পড়ার সময় প্রথম মদ খেয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিল বাবার কাছে। তারপর সে কি বেদম মার! ঠোঁট, মুখ ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। অথচ বাবা নিজে হপ্তায় সাতদিন মাল টেনে চুরচুর হয়ে থাকতো। কি এক রাগে সমাদ্দারের শরীর

টাটিয়ে ওঠে। প্রায় খালি হয়ে আসা বোতলটা নিয়ে আবার গলায় ঢালে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের বেতটা হাওয়ায় একপাক ঘুরিয়ে নেয়। হাওয়ায় শীস ধ্বনি জাগে সুঁই-,-সুঁ……ই।

সুমন লক্ষ্য করছে তাকে। কিন্তু ব্রততীর দিকে তাকাচ্ছে না। সমাদ্দার ভাবে. আর মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ওষুধ ধরবে। তখন পায়ে লুটিয়ে পড়ার পথ পাবেনা।

এখন প্রায় রাত একটা। চারপাশ চুপচাপ, অন্ধকার। শুধু এই বিরাট লাল বাড়ী-টীর তিনতলার দুটো হল ঘরে আলো জ্বলছে। নীচের রাস্তায় দু'একটা গাড়ীর শব্দ। ইনস্‌পেক্‌টর সমাদ্দার খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। বাইরে ধোঁয়া আর কুয়াশায় চাপবাঁধা অন্ধকার। অন্ধকারই ভালো। অন্ধকার না হলে এসব কাজ হয় না। রাত ঘন হলে মানুষের স্নায়ু শিরা ক্লান্ত, অসাড় হয়ে যায়। মনের দৃঢ়তা, বিশ্বাসের কাঠিন্য তখন গুঁড়িয়ে দিতে সময় লাগে না। তাছাড়া মাঝরাতে ঘুমিয়ে পড়ে মানুষজন. বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট বোবা হয়ে যায়। মরা মানুষের মুখের মতো এই নীরবতাকে জ্যান্ত মানুষ ভয় পায়।

চেয়ারের কাছে ফিরে এলো সমাদ্দার। টেবিলে ব্রততী ঝুলছে। দরজার কাছে সুমন বসে আছে ছায়ার মতো। তার কোমরে দড়ি, হাতে শেকল। তাকে পাহারা দিচ্ছে দুজন! দুজনেই পকেটের মধ্যে হাত পুরে শক্ত করে ধরে আছে নিজেদের রিভলভার। ইনস্‌পেক্‌টর সমাদ্দারের হাসি পেল। এতো ভয়! মনে হলো, এখন এই অন্ধকার, নিস্তব্ধ পৃথিবীতে সে একাই বেঁচে আছে। রসিকতা করে সেদিন সহকর্মীদের কে যেন একজন বলেছিল যে মাঝরাতে এই ঘরটাকে অন্ধকার শ্মশানে জ্বলন্ত চিতার মতো দেখায়। কথাটা মনে পড়তে সমাদ্দার হাসলো। ভাবলো, এই শ্মশান জাগিয়ে আমি একা শবসাধনা করছি। আমি এই লালবাড়ীর কাপালিক।

আবার বাবার কথা মনে পড়লো সমাদ্দারের। বাবাও নিজেকে বলতো, তন্ত্রসাধক, কাপালিক। নেশার ঝোঁকে কখনও আওড়াতো ষটচক্রভেদের মন্ত্র। ওসব তন্ত্র-মন্ত্র সেই ছেলেবেলায় সমাদ্দার বুঝতো না। তবে দেশের বাড়ীতে কালীপূজোর সময় বাবার পাঁঠাবলি দেওয়ার দৃশ্যটা আজও ওর মনে আছে। বাবার হাতে থাকতো লাল সিঁদুর মাখা রামদা, কপালে লাল সিঁদুরের তৈলাক্ত টিপ। মুণ্ড-হীন পাঁঠার গর্দান থেকে গলগল করে রক্ত বার হওয়ার ছবিটা ও ভুলতে পারে না।

ইনস্‌পেক্‌টর সমাদ্দার হাতের ঘড়ি দেখলো। পাহারাদার দুজন ভয়ে আড়ষ্ট। এরা কেন যে মরতে চাকরী করে কে জানে! এই সব ছিঁচকে মশা, মাছিগুলোকে এত ভয়! গত দেড় বছরে মশা মাছির মতোই ইনস্‌পেক্‌টর এদের মেরেছে।

আঙুল গুণে হিসেবটা ও মেলাতে গেল। কিন্তু আঙুলে অতো জায়গা হবে কেন ?

সমাদ্দারের বাবা ছিল নামকরা শিকারী। হাতের নিশানা নাকি বড়ো একটা ফসকাতো না। নেশাটেশার জন্যে বেশী বয়েসে একটু কাহিল দেখাতো। হাত কাঁপতো তখন। সমাদ্দারের মনে হলো, সে নিজেও এখন একজন শিকারী। তবে এ শিকারটার নেশা আরো জমজমাট। সমাদ্দার প্রায়ই ভাবে, এই সব ঝামেলা চুকে গেলে কি করবে সে! সারাদিন ছটফট করে বেড়াতে হবে তখন। আজকাল রাতেও আর তার বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করে না। জোলো সংসার, বৌ, মেয়ে। বিরক্তি এসে গেছে। কোন উত্তেজনা নেই জীবনে। দিনেরবেলায় বাড়ী থাকলে এখন বৌ, মেয়েকে পেটাতে ইচ্ছে হয়। তাই বাড়ী ফিরেই সমাদ্দার শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়লে খানিকটা নিরাপদ, নিশ্চিন্ত লাগে।

পাশের ঘর থেকে চীৎকারের শব্দ এলো। দু'জন সাইজ হচ্ছে ওখানে। নিভে যাওয়া চুরুটটা ইনস্পেক্টর সমাদ্দার এবার ধরালো। দেখলো, ব্রততীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। হাওয়ায় চাবুকটা একপলক ঘুরিয়ে ব্রততীর পায়ের পাতায় ইনস্পেক্টর সেটা চালালো কয়েকবার। ভাঙা গলায় মেয়েটা কাতরাতে থাকলো।

ও প্রেগ্‌নাণ্ট, অন্তঃসত্ত্বা—অন্ধকার থেকে চাপা গলায় সুমন বলে উঠলো।

ইনস্পেক্টর থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললো—আগে বলেননি কেন ? ছিঃ ছিঃ, নিজেকে ধিক্কার দিল ইনস্পেক্টর। তার গলায় অনুশোচনা। কিন্তু ব্রততীকে টেবিল থেকে নামালো না। পকেটের নোটবুক আর কলমটা হাতে নিয়ে কয়েকপা এগিয়ে গেল সুমনের দিকে। বললো—এতোক্ষণ ধরে এই নিরীহ মেয়েটা বেকার হয়রানি হলো। এবার ঠিকানাটা বলুন।

ইনস্পেক্টর সমাদ্দার তাকালো সুমনের দিকে। নিথর, নিস্পন্দ সুমনের কাছ থেকে কোন সাড়া পেল না। পাথরে খোদাই মূর্তির মতো সুমনের মুখ। আবছা অন্ধকারে সেই মুখের কোন রেখা ইনস্পেক্টরের নজরে পড়লো না। ভেতরটা রাগে তেতে উঠছে।

কে করলো আপনার বৌয়ের এই অবস্থা—বাঁকা গলায় ইনস্পেক্টর জিজ্ঞেস করলো সুমনকে।

সুমন আগের মতো চুপ। জেগে আছে না ঘুমিয়ে পড়েছে, ধরা যায় না। নিজের মনে সমাদ্দার একটা খিস্তি করলো সুমনকে। শূয়োরের বাচ্ছা এখনি পায়ে পড়বে, ইনস্পেক্টর ভাবলো। তারপর সুমনকে শুনিয়ে বললো—ওই মেয়েটার পেটে যে আছে, সে যে আপনার সন্তান নয় এটা বোঝা গেল। নিজের বাচ্চা হলে, মায়া, দরদ থাকতো।

পাহারাদারদের দুটো হাত এখন সুমনের কাঁধে। ধারালো আলোর দিকে ওর

দুচোখ আটকে রাখা দরকার। অন্ধকার থেকে কড়া আলোর দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থাকলে চোখে, মাথায় ঝিম ধরে, প্রতিরোধ গলে যায়। ইনস্‌পেক্টর হুংকার দিল—চোখ যেন সরে না যায়।

ব্রততীর এখন আর হুঁশ নেই। শায়াটা উঠে গেছে হাঁটুর কাছে। আধবোজা চোখ। চোখের পাতার লালচে অংশটা দেখা যায়! ইনস্‌পেক্টর চুরুট টানে। স্বামী এবং পিতা হিসেবে একটা কর্তব্য আছে আপনার—ইনস্‌পেক্টর বোঝাতে চাইলো সুমনকে। এক সেকেণ্ড থেমে যোগ করলো—অবশ্য আপনিই বাবা কিনা সেটা আমার জানা নেই।

সুমন সাড়া দিল না। জ্বলন্ত চুরুটটা দাঁতে কামড়ে ইনস্‌পেক্টর গিয়ে দাঁড়ালো ব্রততীর টেবিলের পাশে। জ্বলন্ত চুরুটটা চেপে ধরলো ব্রততীর পায়ের পাতায়। একটা গোঙানি দলা পাকিয়ে উঠলো। তারপর ব্রততীর আর সাড়া নেই।

ইনস্‌পেক্টর বুঝলো, ব্রততী বেহুঁশ হয়েছে। সুমন তাকিয়ে আছে আলোকিত এই টেবিলের দিকে। আবছা আলো ছুঁয়ে আছে সুমনের চোখ মুখ। সুমনকে অনেকটা ব্রোঞ্জের ষ্ট্যাচুর মতো দেখায়। পাহারাদারকে ব্রততীর চোখে মুখে জল দিতে বলে চেয়ারে বসে ইনস্‌পেক্‌টর বাকী রামটা শেষ করলো। আজ নেশাটা ঠিক যুৎসই হচ্ছে না। বড়ো বেগ দিচ্ছে ছোঁড়াটা। এরকম দুটো কেসের অভিজ্ঞতা ইনস্‌পেক্‌টর সমাদ্দারের আছে। বেশীরভাগ ভেড়ুয়া। ঘায়েল করতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। সামান্য চোখ রাঙানিতেই কাজ হয়। কিন্তু সুমনের মতো বেয়াদপি আর দুঃসাহস আগে কেউ দেখায়নি। কপালে মুখে মিনমিনে ঘাম। সমাদ্দার রুমালে মুখ মুছলো। একপলক তাকালো সুমনের দিকে। ঘাড় উঁচু করে সুমন বসে আছে। কি উদ্ধত, বেপরোয়া ভঙ্গী। সুমনের শক্ত, ছুঁচোলো চোয়াল, চোখা নাক, হাতের চওড়া কব্জি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। ইনস্‌পেক্টরের মনে হলো—ছেলেটা যেন লোহার তৈরী। ওদের দলে এরকম দু-দশজন আছে। সাদামাটা, নিরীহ চেহারা, অথচ ভয়ঙ্কর, ক্ষুরধার।

ইনস্‌পেক্টর সমাদ্দারের বুকের চাপা রাগটা বুনো মোষের মতো গর্জাতে থাকলো। আপন মনে বিড়বিড় করলো—তুমি চ্যালেঞ্জ করছো আমাকে? লড়তে চাও আমার সঙ্গে?

ব্রততীর দিকে তাকিয়ে সমাদ্দার বুঝলো -জ্ঞান ফিরেছে। দুটো চোখ খোলা, শ্বাস পড়ছে নিয়মিত।

কথা বলবেন স্বামীর সঙ্গে—ইনস্‌পেক্টর জিজ্ঞেস করলো ব্রততীকে।

ইনস্‌পেক্টরের প্রশ্ন ব্রততী বুঝতে পারলো না। ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকলো।

আপনি মা হতে চলেছেন, সেটা আগে বলেননি কেন—

গলায় সহানুভূতি নিয়ে সমাদ্দার প্রশ্ন করলো ব্রততীকে। ব্রততী নির্বাক। অর্থ-

হীন, দুর্বোধ্য ধ্বনিপুঞ্জ তার চেতনায় কোন সাড়া জাগালো না। একইভাবে বোকার মতো সে তাকিয়ে থাকলো ইনস্পেক্টর সমাদ্দারের দিকে। গরম হয়ে গেল ইনস্পেক্টরের মাথা। ও ভাবলো, এরা দুজন আমাকে অপদস্থ, হেয় করতে চাইছে। সেটা হবে না।

কড়া গলায় ইনস্পেক্টর সমাদ্দার ডিউটি সিপাইকে হুকম দিল— পাল্টি খাওয়াও।

ব্রততীর পিঠটা ধরে সিপাই রডের ওপর চক্কর লাগায়। তিন চারবার ঘুরে যায় ব্রততী। একটা চাপা গোঙানী বার হতে থাকে। কাজ হয় না কোন। ইনস্পেক্টর সমাদ্দার ক্ষেপে ওঠে। ব্রততীর ব্লাউজ, অন্তর্বাস টেনে ছিঁড়ে ফেলে। শায়া ছাড়া ব্রততীর শরীরে এখন কোন পোষাক নেই। ইনস্পেক্টর দেখলো সুমন তাকিয়ে আছে ব্রততীর দিকে। চুরুটে ঘনঘন টান দিয়ে দগদগে আগুনটা ইনস্পেক্টর সমাদ্দার এবার চেপে ধরলো ব্রততীর অনাবৃত নরম বুকে। একবার, দু'বার, তিনবার। ব্রততীর শরীরটা কুঁকড়ে যায়, হিক্কা ওঠে। শায়া ভিজে গিয়ে খানিকটা দলাপাকানো, কালচে রক্ত মেঝেতে ঝরে পড়ে। গর্ভস্রাব হয়ে গেল দেখছি—উঁচু গলায় ইনস্পেক্টর বললো। কিন্তু কাকে শোনালো খবরটা! বেঞ্চের দিকে চোখ পড়তে ইনস্পেক্টর সমাদ্দার দেখলো, সেখানে সুমন নেই। পাহারা—ভীত, ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো ইনস্পেক্টর। জী সাব—দুজন পাহারাওলা সাড়া দিল। চোখের ভুল। পাহারা দুজন একভাবে শক্ত করে সুমনকে ধরে বসে আছে। কোথাও কোন গলদ বা ত্রুটি নেই। তবু যে কেন এমন দৃষ্টিবিভ্রম হলো, সমাদ্দার বুঝতে পারলো না।

বাইরে থেকে ইনস্পেক্টর পালিত এসে ঘরে ঢুকলো। ভেতরটা ভালো করে দেখে এগিয়ে গেল ব্রততীর দিকে। জিজ্ঞেস করলো—মেয়েটা মারা গেল নাকি? না—ইনস্পেক্টর সমাদ্দার জবাব দিল—এরা সহজে মরে না।

এটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না—ক্ষুন্ন গলায় ইনস্পেক্টর পালিত বললো—আসামীর বদলে তার বৌকে ধরে টানা-হেঁচড়ার কোন মানে হয় না। সব কাজে বাগড়া দেওয়া পালিতের স্বভাব। তাই ওর সঙ্গে পারতপক্ষে সমাদ্দার ডিউটি নিতে চায় না। ভেতরে রাগ জমলেও সেটা চেপে গম্ভীর গলায় সুমনকে দেখিয়ে সমাদ্দার জানালো—ওর মুখ খুলতেই করতে হচ্ছে এসব।

ইনস্পেক্টর পালিত বিরক্ত মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকার, নীরবতা ঘন হয়। পাশের ঘরেও কোন আওয়াজ নেই।

সুমনের একগুঁয়েমি আর পালিতের নাক গলানোয় সমাদ্দার চটেছিল। ব্রততীর দিকে আর না এগিয়ে ইনস্পেক্টর সমাদ্দার ডিউটি সিপাইকে বললো—নীচে যাও, ভ্যান বার করতে বলো।

বেরোবে নাকি—জিজ্ঞেস করলো ইনস্পেক্টর পালিত।

হুঁ।

দু'এক সেকেণ্ড উসখুস করে ইনস্পেক্টর পালিত ব্রততীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রড থেকে ব্রততীকে নামিয়ে শুইয়ে দিল টেবিলের ওপর। ব্রততীর তাল পাকানো শাড়িটা খুলে ঢেকে দিল তার শরীর।

আদিখ্যেতা, সমাদ্দার ভাবলো, চিমটি কাটছে আমাকে। হেরে যাওয়ার চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে চাগাড় দিল ওর মাথায়। একটা সেদিনের ছোকরা ওকে চিৎপাত করে দেবে, এটা ভাবতেই জ্বালা করে উঠলো সমাদ্দারের বুক। আমি হারবো না, তাহলে এই সহকর্মীরাই হাসবে আমাকে দেখে।

ব্রততীর জ্ঞান এখনো ফেরেনি।

কোথায় চললে—জানতে চাইলো ইনস্পেক্টর পালিত।

হাওয়া খেতে—চুরুটের ধোঁয়া ছড়িয়ে জবাব দিল সমাদ্দার। কালো গাড়ীর সামনের সিটে ড্রাইভার আর নিজের মাঝখানে সুমনকে বসালো ইনস্পেক্টর সমাদ্দার। হেমন্তের রাত। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের এক চিলতে চাঁদ। রাস্তায় সামান্য ধোঁয়া আর কুয়াশা। ইনস্পেক্টর দেখলো, সুমন পাথরের মতো চোখে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। রাস্তা নয়, আকাশ নয়, অন্যকিছু সে দেখছে। ছেলেটা ওভাবে তাকিয়ে আছে কেন? ও কি অন্ধ? পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছে?

জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লাগলে সমাদ্দারের শীত শীত করে। একটা মতলব নিয়েই ও গাড়ীতে তুলেছিল সুমনকে। কিন্তু সেটা কেমন তাল-গোল পাকিয়ে গেল। পকেটের রিভলভরটা দিয়ে সে খোঁচা দিল সুমনকে। তারপর শুরু করলো—বড়ো বাজে ব্যাপার এসব। বিশ্বাস করুন, আমার একদম ভালো লাগে না। কিন্তু যা করছেন আপনারা ......। এভাবে কিছু হয় না। এগুলো স্রেফ হুজুগ। দু'চারজন মিলে একটু হৈ হৈ করে কি লাভ? আপনাদের পাশে কেউ নেই। কেউ চায় না আপনাদের।

কথার মাঝখানে ইনস্পেক্টর সমাদ্দারের হঠাৎ মনে হলো যে তার পাশে কেউ নেই। জায়গাটা খালি, সুমন কখন যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। সমাদ্দারের বুকের স্পন্দন থেমে গেল। একটু নড়ে চড়ে বসে সুমনের শরীরটা ও অনুভব করলো। লোহার মতো শক্ত, টানটান হয়ে সুমন বসে আছে। ছুঁচোলো চিবুক, চোখা নাক, আর চওড়া কবজিতে গড়িয়ে যাচ্ছে রাস্তার আলো। পাশে বসে থেকেও সুমন যেন এ পৃথিবীতে নেই। সুমনের শরীর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার মতো কি যেন বেরোচ্ছে। সেই শীতল হাওয়ার সুতো সুমনের চারপাশে বরফের মতো জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ইনস্পেক্টর সমাদ্দার ব্যাপারটা বুঝতে পারে না। ওর সব পরিকল্পনা ধ্বসে যায়। হেরে যাওয়ার যন্ত্রণাটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ও চুরুট ধরায়। ময়দান চলো—ইনস্পেক্টর হুকুম দিল ড্রাইভারকে। রেসকোর্সের পাশে

ময়দানের ভেতর কালো ভ্যানটা দাঁড়ালো। পাহারাদাররা গাড়ি থেকে নামালো সুমনকে। চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে ইনস্‌পেক্টর সমাদ্দার বললো—সময় আছে এখনো ভেবে দেখুন।

ওপাশ থেকে কোন জবাব এলো না। ইনস্‌পেক্টরের নিজের গলা ফাঁকা মাঠে প্রতিধ্বনি তোলে। শেকল আর দড়ি বাঁধা সুমন ভিজে ঘাসের ওপর খালি পায়ে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দেখে। পাহারাদাররা চুপিসারে সুমনের পাশ থেকে সরে যেতে ইনস্‌পেক্টর সমাদ্দার রিভলভারের ঘোড়া টিপলো।

কিছু পরে দড়ি আর হাতকড়া নিয়ে একজন পাহারাদার ভ্যানে ফিরে এলো। ড্রাইভারের পাশে বসে নিভে যাওয়া চুরুট ধরালো সমাদ্দার। অন্ধকার রাস্তায় ভ্যান চলতে থাকলে ইনস্‌পেক্টরের মনে হলো, তার আর ড্রাইভারের মাঝখানে সুমন বসে আছে। সুমনের চারপাশে ঠাণ্ডা বরফের দেওয়াল। শীতল হাওয়া ছুঁচের মতো গায়ে বেঁধে। সুমন তাকে দরজার দিকে ক্রমাগত ঠেসে ধরছে। ইনস্‌পেক্টর সরে যায়। নির্জন, ফাঁকা রাজপথে হুহু করে গাড়ী ছুটছে। আড়-চোখে তাকিয়ে ড্রাইভার বললো—জারা সামালকে। সম্বিত ফিরে পেয়ে ইনস্‌-পেক্টর সমাদ্দার আবার গাড়ীর ভেতরের দিকে সরে বসলো। শরীরটা কয়েক দিন ভালো যাচ্ছে না, সমাদ্দার ভাবলো, ছুটি নেওয়া দরকার।

জলদি চালাও—সমাদ্দার নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে।

মনে পড়লো, বাবা কাটা পড়েছিল ট্রেনের চাকায়, অপঘাত মৃত্যু। ভেতরে সরতে সরতে সমাদ্দার প্রায় ড্রাইভারের কোলের কাছে গিয়ে বসলো। দু'জনের মাঝ-খানে এক আঙুল জায়গাও ও খালি রাখতে চায় না।

সেই বড়ো বাড়ীটার অন্ধকার, ফাঁকা চৌহদ্দিতে গাড়িটা আবার ফিরে এলো। ইনস্‌পেক্টর সমাদ্দার এসে দাঁড়ালো তিনতলার সেই ঘরে। ঘরে ব্রততী নেই। বোধহয় ডাক্তারের জিম্মায় পালিত পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে। জোরালো আলোয় আচমকা ঘরে ঢুকে সমাদ্দারের চোখদুটো টনটন করে। টেবিলের ওপর থেকে রামের বোতলটা নিয়ে ও গলায় ঢাললো। বোতল খালি। সামনে চোখ পড়তেই সমাদ্দার দেখলো দরজার কাছে সেই বেঞ্চিতে সুমন বসে আছে। ছুঁচোলো চোয়াল, একাগ্র দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে উজ্জ্বল আলোর দিকে। আতঙ্কে সমাদ্দারের শরীর কেঁপে উঠলো। হাতের খালি বোতলটা সুমনকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ হলো ঝনঝন করে। কিন্তু কোথায় সুমন? দুহাতে চোখ রগড়ে সমাদ্দার দেখলো, বেঞ্চি খালি, কেউ নেই। ঘাড়ের ওপর হঠাৎ সেই শীতল হাওয়ার স্পর্শে সমাদ্দার লাফিয়ে উঠলো। সামনে জমে থাকা রক্তে পা পড়লো। ওর পিছলে গেল পা। টাল সামলে জুতোর রক্ত মোছার জন্যে পা ঘসলো মেঝেতে। পা ঘসার সঙ্গে সঙ্গে সেই আধশুকনো চটচটে রক্ত তরল আলতার মতো সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। পায়ের রক্ত উঠলো না।

মেঝেতে পা ঠুকে, দাপাদাপি করে জুতোয় লেগে থাকা রক্ত সমাদ্দার মুছে ফেলতে চাইলো। কিন্তু কিছুতেই সে রক্ত ওঠে না। ইনসপেক্টরের পায়ের তলার মাটি সন্তানসম্ভবার পেটের মতো ধড়ফড় করে। সমাদ্দার দৌড়ে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ায়। সেই হিম, ঠাণ্ডা, ঘন অন্ধকার।

দারুণ ভয়ে সমাদ্দার চেঁচালো—পাহারা… …।

লাল বাড়ীর তিনতলার কার্নিশ থেকে একটা কালো পেঁচা অন্ধকারের দিকে উড়ে গেল।

মান্যমাইতির আইন অমান্য

ননীবাবু বাড়ী যান– সাব ইনস্‌পেক্‌টর সামন্ত বললো।

—না।

—আজ আমরা খুব ব্যস্ত। থানায় লোকজন কম, লক-আপেও জায়গা নেই। আজ আপনারা বাড়ী যান। সামন্ত আবার অনুরোধ করলো।

না—আরো পরিষ্কার গলায় ননী ঘোষাল জানালো—আইন অমান্য করে আমরা থানায় এসেছি। আজ লক-আপে থাকবো। তারপর কাল কোর্টে যা হবার হবে। বড়োবাবুর হুকুম আজ কোন আইন অমান্যকারীকে এ্যারেষ্ট না করার -ছোকরা পুলিশ অফিসার ধৈর্য না হারিয়ে ননী ঘোষালকে বোঝাতে চেষ্টা করলো—লকআপে থাকতে হ'লে বড়োবাবুর ফেরার জন্যে আপনাদের অপেক্ষা করতে হবে।

তারিণী সেপাই কিন্তু রেয়াপাড়ার বি. ডি. ও. অফিস থেকে আমাদের এ্যারেষ্ট করেছিলো—ননী বললো।

রোগা, লম্বা তারিণী সেপাই নিজের নাম শুনে হাউমাউ ক'রে বলে উঠলো—আমায় জড়াবেন না মাষ্টারমশাই। আপনাদের আমি আনতে চাইনি। আপনারাই জোর ক'রে আমার সঙ্গে এসেছেন।

ননী আর কথা বাড়ালো না। নিজের চেয়ারে গাঁট হয়ে বসে রইলো। ঘরের আবহাওয়া থম্‌থমে গম্ভীর। বাইরের আকাশে মেঘ-রৌদ্রের খেলা। প্রথম বর্ষার ছোঁয়ায় গাছপালা মাটিতে কেমন এক ঢলোঢলো ভাব।

তারিণী সেপাই এবার মান্যকে বললো—বাড়ী যা মান্য, মেজবাবুর কথা রাখ্‌।

তারিণীর কথায় কোন জবাব না দিয়ে মান্য মাইতি তাকালো ননী ঘোষালের দিকে। ননীলাল তার নেতা, পার্টির নেতা। মান্য সামান্য ক্যাডার, কর্মী। ননীলাল শিক্ষিত, স্কুলমাষ্টার, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ। মান্য হেলে চাষা, মুখ্যু, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। মান্যর বয়েস বাহান্ন, ননীলালের সাঁইত্রিশ। কিন্তু বয়েসে কি আসে যায়। ননীলালের সামনে মান্য বিড়ি পর্যন্ত টানে না।

দু'এক মিনিট কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থেকে তারিণী ভেতরে চলে গেল। ননী-লাল বিড়ি ধরিয়ে হুস্‌হুস্‌ ক'রে টানতে শুরু করলো। হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়লো

ধোঁয়ার কটু গন্ধ। বিড়ির তেষ্টায় মান্য সেই ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে নিঃশব্দে কলজের মধ্যে টেনে নিল। মান্য শুনেছে ধোঁয়া কখনো এঁটো হয় না। ননী-ঘোষালের চেয়ারের পাশে একটা বেঁটে, ছোট টুলে মান্য বসেছিলো। বাইরের আকাশে মেঘ ঘন হয়। ঘড়িতে সময় এগিয়ে চলে। বারোটা থেকে প্রায় দুটো পর্যন্ত একটানা বসে থেকে মান্য হেদিয়ে যায়। ঘুমে দুচোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। হাই ওঠে বারবার।

বড়োবাবু তবু ফেরে না। থানার মধ্যে বেশ একটা উত্তেজিত, চঞ্চল ভাব। টেবিলের ফাইলপত্র গুছিয়ে রাখা হচ্ছে। র‍্যাকভর্তি কাগজের এলোমেলো বাণ্ডিল ঠেলে, ঠেসে মানানসই করার চেষ্টা চলেছে। লকআপ খোলা আর বন্ধের শব্দে বোঝা যায় যে, ঝাঁটা, বালতি নিয়ে ঝাড়ুদার লকআপ সাফাইয়ে ব্যস্ত। মান্য বুঝতে পারে, আজ থানায় কোন জমকালো ব্যাপার আছে। ব্যাপারটা জানার জন্যে তার কৌতুহল হ'লো। কিন্তু পাশের গাঁয়ের লোক তারিণীকে আর মান্য দেখতে পেল না। সেই যে ভেতরে গেল, আর পাত্তা নেই একদম উধাও!

পেটের মধ্যে চিনচিনে ব্যথা শুরু হলে, মান্য বোঝে এটা ক্ষিধের ইঙ্গিত। সেই কোন সকালে একথালা ভাত আর বিউলির ডাল খেয়ে বেরিয়েছে। তারপর আর দাঁতে কুটো কাটেনি। অবশ্য এই ভরা বর্ষার দিনে ঘরে যখন চাল বাড়ন্ত, তখন ছেলে-মেয়েদের সামনে এক থালা গরম ভাত খাওয়া যেন এক বড়ো রকমের অপরাধ। কিন্তু মান্যর কিছু করার ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষের বৌ বিমলা সাত-সকালে তার জন্যে চুলো জ্বেলে ভাত, ডাল রেঁধেছিল। সবে দু'মাস হলো বিমলা এসেছে বৌ হয়ে। এতো তাড়াতাড়ি স্বামীকে ঘিরে গড়ে তোলা সুখ-সোহাগের স্বপ্ন কোন মেয়ের নষ্ট হয় না। তা সে স্বামী ত্রিশ বছরের বড়ো, বুড়ো যাই হোক না কেন। বাইশ বছরের যুবতীর ভাজা বুকের আবেগের চেয়ে দারিদ্র্য বা পাকাচুল তো আর বেশী শক্তিশালী নয়। মান্য তাই হামলে পড়ে ডাল ভাত খেয়েছিল। আধপেটা চার ছেলে-মেয়ে আর নতুন বৌয়ের কথা ভাবেনি। তাছাড়া আইন অমান্যের পর নানা ঝক্কি ঝামেলায় আবার কখন অন্ন জুটবে তারও ঠিক নেই।

সেই ভাত বহুক্ষণ হজম হ'য়ে গেছে। হবে নাই বা কেন? রেয়াপাড়া থেকে নন্দীগ্রাম থানা তো কম দূর নয়। নিদেনপক্ষে তিন ক্রোশ রাস্তা। এই ভ্যাপসা গরমে পথের জল-কাদা ঠেলে এতোটা হাঁটলে সুস্থ পাকস্থলী ক্ষুধার্ত হবেই। কিন্তু ননীকে দেখলে মান্যর মনে হয়, লোকটার ক্ষিদে তেষ্টা নেই। শুকনো ঠোঁটে অবিরাম বিড়ি টেনে চলেছে। মান্য দেখেছে, লেখাপড়া জানা লোকেদের খুব একটা ক্ষিদে পায় না। হয়তো বিদ্যের ভারে ক্ষিদে মরে যায়। মান্যর মনে তাই একটা আপশোষ আছে। লেখাপড়া শিখলে সে হয়তো এই ক্ষিদের হাত

থেকে বেঁচে যেতো । কিন্তু মান্য এখন কি করে ? তার তলপেট যে ক্ষিদেয় আছাড়-পাছাড় করছে । এখন যদি চাট্টি মুড়ি আর এক খাবলা একো গুড় পাওয়া যেতো ! ওফ্ ! ভাবতেই মান্যর নোলায় ঘন হয়ে জল জমে ।

তখনই মান্যর বাড়ীর কথা মনে পড়লো । আর বাড়ীর কথা ভাবতেই ওর মাথায় জেগে উঠলো মেজো মেয়ে জরির মুখ । গতকালই স্বামীর ঘর থেকে জরি পালিয়ে এসেছে । মাসের মধ্যে পনেরো দিন স্বামীর মার খেয়ে সারা শরীরে কালসিটে আর চাকা চাকা লাল দাগ নিয়ে ও বাপের ভিটেতে এসে দাঁড়ায় । পাশের গাঁয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার এটা এক ঝকমারি । গায়ের দাগ মিলিয়ে গেলে মান্য আবার জরিকে স্বামীর ঘরে দিয়ে আসে । সান্ত্বনা দিয়ে বলে—সব ঠিক হয়ে যাবে ।

এই কথাটা ও ননীর কাছ থেকে শিখেছে । কিন্তু কথাটা বললেই ওর মনে একটা খটকা লাগে—গরীব মানুষের কি কোনদিন সব ঠিক হয় ? এভাবেই তো সারাজীবন টেনে যেতে হয় !

মান্য কিন্তু জীবনে জরির মার গায়ে হাত তোলেনি । মান্যর প্রথম পক্ষের বৌ লক্ষ্মীমণি ছিল পরি, জরি এবং আরো চার ছেলেমেয়ের মা । মান্যর বড়ো মেয়ে পরির বিয়ে হয়েছে তমলুকে । বছরে একবারও সে আসে না । লক্ষ্মীমণি গত বর্ষায় একদিন মাঝরাতে হঠাৎ বুক ধড়ফড় করে মরে গেল । তাকে বাঁচাবার জন্যে ডাক্তার, ওষুধ, কোন ব্যবস্থাই মান্য করতে পারেনি । মান্য প্রায়ই ভাবে, ভাগ্যিস লক্ষ্মী মাঝরাতে মরেছিল ! ডাক্তার ওষুধের খরচ থেকে মান্য রেহাই পেয়েছে । মান্য জানে, আর্থিক সাধ্য, সংগতি না থাকলে শুধু ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে বাঁচানো যায় না । এই যে নতুন বৌ, বয়েসে যে তার চেয়ে প্রায় ত্রিশ বছরের ছোট, উপচে পড়া যৌবন নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দুহাতের শাঁখা নোয়া আর চুড়ি বাজিয়ে সারা বাড়ি ঝমর ঝমর হেঁটে বেড়ায়, সেও ছ'মাস বাদে তিরিক্ষি মেজাজে দাঁত খিঁচোবে ।

তন্দ্রার ঘোরে বেতাল মান্য হুমড়ি খেয়ে ননীর কোলে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল । তারিণী ব্যাটা গেল কোথায় ? রেয়াপাড়া থেকে রওনা হওয়ার আগে বি ডি ও সাহেবের সামনে তারিণী কথা দিয়েছিল যে, সাইকেল রিক্সার ভাড়া বাবদ প্রাপ্য টাকায় দুজনের জন্যে ও ভরপেট টিফিনের ব্যবস্থা করে দেবে । ওর কথা পাওয়ার পরই ননীদা ছ'মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে যেতে রাজী হয়েছিল । তা না হলে রিক্সা ছাড়া রাজবন্দীদের হাঁটিয়ে আনার সাধ্য কার আছে । গত এক মাসের আইন অমান্যে প্রায় সকলেই রিক্সা চেপে এসেছে । সরকার বাহাদুরের হুকুম । হুকুম নড়ে না । অথচ হেঁটে এসেও টিফিন মিলছে না । এ কেমন ব্যবহার ? টিফিনের পয়সাটা তারিণী মেরে দিল নাকি ?

ননীদা যেন ক্ষিদের কথা একদম ভুলে গেছে। অথচ ননীদা একবার কথা খসালেই ভালোমন্দ কিছু খাবার এবং চা এসে যায়। মান্যর ইচ্ছে হলো, ননীদার সামনে কথাটা তোলার। কিন্তু গম্ভীর মুখ ননীদার দিকে তাকিয়ে মান্য ভরসা পেল না। এমন গেরো জানলে মান্য আজ আসতো না। আইন অমান্য করে লক আপের সামনে ধর্ণা দিয়ে এতোক্ষণ পড়ে থাকার পরও পুলিস যে তাদের লক আপের বাইরে ফেলে রাখবে এটা মান্য ভাবেনি। ননীদার চাপে পড়ে এতোদূর আসার জন্যে মান্যর এখন অনুতাপ হয়। ননীদার সরকারের দেওয়া বিঘেখানেক ভেস্‌ট্‌ জমি তার নামে বরাদ্দ হয়েছিল। কিন্তু ননীদার সরকার যে উল্টে গেল। এখন কি হবে ? হাজার আইন অমান্যেও ননীদার সরকার আপাততঃ বেঁচে উঠবে না। মান্য ভাবে, এবার বোধ হয় ধনেপ্রাণে মরতে হবে। অবশ্য কংগ্রেসের বঙ্কুবাবুর সঙ্গেও তার বহুদিনের জানাশোনা। বঙ্কুবাবুর খামারে জনমজুরীর কাজে আজো মান্যর ডাক পড়ে। দরকার হলে বঙ্কুবাবুর দলে মান্য ভিড়ে যাবে। গরীব মানুষের আবার রাজনীতি ! জান, জমি বাঁচানো হলো বড় কথা। এর বেশী মান্য আর কিছু জানে না, শেখে নি। এটা মান্যর দোষ নয়, নতুন কিছু তাকে কেউ না শেখালে সে শিখবে কোথা থেকে ! অবশ্য যে দলেই নাম লেখাক মান্য চিরকাল ননীদার পাশে থাকবে। ননীদা হলো গরীব মানুষের বন্ধু

থানার বুকচাপা উত্তেজনা হঠাৎ কি এক ধাক্কায় চলকে উঠলো। গেটের মুখের ডিউটি সিপাই চেঁচিয়ে বললো—আসছে, আসছে।

সামন্ত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

সামন্ত চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো—তারিণীবাবু, চোরগুলোকে রাখলেন কোথায় ?

প্রস্রাবখানায় স্যার—ভেতর থেকে তারিণী জানালো।

আজ রাতটা ওরা ওখানেই থাকবে—সামন্ত বললো।

খাঁকি উর্দি পরা পাঁচজন বন্দুকধারী বাইরে থেকে ভারী বুটের শব্দ তুলে ভেতরে এসে ঘরের মাঝখানে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো। মিনিটখানেক বাদে বছর পঁচিশের একটা রোগা ছেলেকে মাঝখানে রেখে জনা দশেক বন্দুকধারী ভেতরে ঢুকলো। ছেলেটার দুহাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি। তার চলার সঙ্গে তাল রেখে হাতকড়ায় ঝনঝন শব্দ উঠলো। লাইন দিয়ে দাঁড়ানো পাঁচজন সিপাই তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ডাইনে, বামে, কোনদিকে না তাকিয়ে ছেলেটা ঘাড় উঁচু করে রাজার মতো লক আপের দিকে এগিয়ে গেল। মান্যর ঘুম চটে গেছে। পেটের ক্ষিদেও খতম। নতুন বন্দীর রাজকীয় মহিমা আর মর্যাদা দেখে সে অভিভূত হয়ে গেছে। লক আপের লোহার দরজা খোলা এবং বন্ধ করার ভারী আওয়াজ মান্য শুনতে পেল।

তখনই নন্দীগ্রাম থানার বড়োবাবু ইনস্‌পেক্টর চ্যাটার্জী ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে সার্কেল ইনস্‌পেক্টর দত্ত। দুজনেই খুব ব্যস্ত, উত্তেজিত, চোখেমুখে দিগ্বিজয়ের দীপ্তি। চেয়ারে ননী ঘোষালকে দেখে বড়োবাবু জিজ্ঞেস করলো—হঠাৎ কি মনে করে ? আইন অমান্য—ননীদা জবাব দিল।

আজ ওসব হবে না—বড়োবাবু বললো—দশহাজারী রাজনৈতিক নেতাকে ধরে এনেছি। ঘণ্টা দুয়েক বাদে একে নিয়ে মেদিনীপুর জেলে পৌঁছে দিতে হবে। এখন সরে পড়ুন।

ননী নির্বাক। কি বলবে ভেবে পেল না। ক্ষিদে তেষ্টা ঘুচে গিয়ে মান্যর মাথায় কি এক বিস্ময় ছলছল করে। কানের মধ্যে লোহার তৈরী শিকলের ঝমঝম শব্দ। মান্য এক সময় ননীকে বললো—এবার তাহলে ঘরে ফেরা যাক। কথা না বাড়িয়ে মান্যর পাশাপাশি ননী রাস্তায় এসে নামলো। আশপাশে কোথাও ইতিমধ্যে এক পশলা চেপে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ঠাণ্ডা, জোলো বাতাস বইছে। বাতাসে মিশে আছে হলদি নদীর আঁশটে গন্ধ। আকাশ জোড়া ঠাসবুনুনি মেঘের আড়ালে কখন যেন সূর্য ডুবে গেছে। পৃথিবী জুড়ে ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার। ঘরে ফেরার পথে হয়তো মাঝ রাস্তায় বৃষ্টি নামবে। ডানহাতি ভেড়ির পাশে, সেচের খালে ব্যাঙ ডাকছে। ননীর পাশাপাশি মান্য চুপচাপ পথ হাঁটে।

কি এক গভীর স্বপ্নে মান্য যেন মশগুল হয়ে আছে। তীব্র কৌতূহল আর হাজার প্রশ্নে তার দুটো রগ দপ দপ করছে। ননী একবার আড়চোখে মান্যকে দেখলো। মান্য জিজ্ঞেস করলো—দশহাজারি নেতা মানে কি ?

হঠাৎ কোন জবাব ননীর মাথায় এলো না। একটু ভেবে ননী বললো—ওকে ধরার জন্যে দশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

তারপর একটু থেমে যোগ করলো—রাজনৈতিক নেতা না হাতি। ও হলো ডাকাত।

রোগা, শ্যামলা ছেলেটার জ্বলজ্বলে দুটো চোখ মান্যর চেতনায় কিভাবে যেন খোদাই হয়ে গেছে। চাপা গলায় ননীর কথাটা মান্য আওড়ালো—ডাকাত। কি ভেবে নিজেকে শুধরে নিয়ে ননী বললো—প্রায় ডাকাত।

মান্য জিজ্ঞেস করলো—প্রায় ডাকাত মানে কি ?

ননী হঠাৎ ক্ষেপে যায়। তেড়িয়া হয়ে বলে—তোর এতো জানার কি দরকার ? মান্যর মাথায় বিদ্যুৎ চমকায়। সোজাসুজি ননীর দিকে তাকিয়ে কেমন এক অচেনা গলায় মান্য বলে—প্রায় ডাকাত হলে পুলিস খাতির করে, ভয় পায়। এ হলো সত্যিকার আইন অমান্য, রাজার মতো আসা।

মান্যর স্পর্ধায় আশ্চর্য হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে ননী দেখলো, তার পেছনের লোকটা

হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে অন্য এক মান্য মাইতি হয়ে গেছে। এ মান্যকে আগে কখনো ননী দেখেনি।

পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে জীবনে এই প্রথম ননীর সামনে মান্য বিড়ি ধরালো। সামনে, পেছনে ধু ধু অন্ধকার ফাঁকা রাস্তায় তখন দিগন্ত ছাপিয়ে বৃষ্টি নেমেছে।

সংগ্রামপুর যাত্রা

তীব্র দাহনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী ! ধূ-ধূ ফাঁকা মাঠের মধ্যে জৈষ্ঠ্যের রোদ যেন রোদ নয়, দাবানল। সূর্য প্রায় মাঝ আকাশে এসে পৌঁচেছে দিগন্ত বিস্তৃত ফুটিফাটা প্রান্তরের মধ্যে কোথাও একচিলতে সবুজ জমি তো দূরের কথা, সবুজ পাতায় ঢাকা একটা গাছও নেই। পায়ে চলা আবছা মেঠো পথের ধারে ধারে শুকনো হলদেটে নাড়া আর বুনো লতাগুল্ম। রৌদ্র কিরণের হল্কায় গায়ে যেন ফোস্কা পড়ছে।

খোঁড়া পায়ে অমিয়দা লেংচে হাঁটছে। ঘামে ভিজে উঠেছে অমিয়দার ঘি রঙের বুশ্‌শার্টের বুক আর পিঠ। কপাল আর থুতনি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। কিন্তু অমিয়দা দমার পাত্র নয়। মুখে চোখে ঝিকমিক করছে উৎসাহ আর উত্তেজনা। অমিয়দার সায় পেয়ে পিছুবুদ্দি বকে যাচ্ছে অনর্গল— মোরা গাঁয়ের মুখ্য মানুষ। বিদ্যে বলেন, বুদ্ধি বলেন সে সব আছে আপনাদের। আপনারা ভরসা দিলে মোরা লড়তি কসুর করবো না। তবে মাঝে মাঝে হেথা আসতি হবে আপনাদের, মিটিন করতি হবে।

সে তো বটেই—অমিয়দা বলল। অসমতল, রুক্ষ পথে পিছুবুদ্দির হাঁটার তালে তালে তার পিঠে ঝোলানো কাপড়ের লম্বা থলিটা দুলতে থাকে। ময়লা-সাদা থলিটা কবে যেন নীল রঙে ছোপানো হয়েছিল। সে রঙ রোদে জলে ধুয়ে মুছে গিয়ে এখন শুধু বিদকুটে চাকাচাকা আবছা নীল ছাপ ঝোলাটার শরীরে ইতস্তত লেগে আছে। কাপড়ের লম্বা ঝোলাটাকে মাঝে মঝে ছাল ছাড়ানো অদ্ভুত এক জন্তুর মতো মনে হয়।

পিছুবুদ্দির ঝোলাটা এখন প্রায় খালি। পাঁচপো আটা, একসের আলু, আড়াই-পো ভেলিগুড় এবং ওর নিজস্ব পাল্লা বাটকারা ছাড়া ঝোলার ভেতর আপাতত আর কিছু নেই। সংগ্রামপুর স্টেশনের প্লাটফর্মের বাইরে এসে সামান্য এগিয়েই বাঁদিকের মুদিখানা দোকানটার সামনে পিছুবুদ্দি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপর অমিয়দাকে বলেছিল– দাদাবাবু পাঁচপো আটা লাগবে।

কেন—জানতে চেয়েছিল অমিয়দা।

দূরের কমরেডরা হয়তো আজ রেতে মোর ভিটেতেই থেকে যাবেন। ডিহি, বাহুল্যা এমনকি মগরা থেকেও কেউ কেউ এসবেন।

তাই নাকি ? বেশ, বেশ—মহা উৎসাহে অমিয়দা পাঁচপো আটার দাম দিয়েছিল। অমিয়দার দুচোখে গভীর স্নেহ আর তৃপ্তি উথলে উঠছিল। পিছুবুদ্দির দিকে একপলক যেন গর্বের সঙ্গে তাকিয়েছিল। পিছুবুদ্দির মতো এমন জঙ্গী, সর্বহারা গ্রামের কমরেড :র আগে আর অমিয়দা পায়নি। তাছাড়া পিছুবুদ্দি হলো অমিয়দার একেবারে ব্যক্তিগত সংগ্রহ ! আরো কিছুটা এগিয়ে ডানদিকে আর একটা ছোট দোকান। আমার দিকে একচোখে তাকিয়ে পিছুবুদ্দি বললো— সেরটাক আলু আর এট্টু ভেলিগুড় নিতি পারলে ভালো হয়।

অমিয়দার মতো আমিও তখন উৎসাহে ফুটছি। ফলে আলু আর ভেলিগুড়ের দাম মিটিয়ে কৃতার্থ বোধ করি। পিছুবুদ্দির নেতৃত্বে আজ পার্টির দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটি তৈরী হবে। এলেবেলে ভদ্রলোকের কমিটি নয়, গ্রামের দরিদ্রতম মানুষ, ক্ষেতমজুর আর ভূমিহীন কৃষকদের সংগঠন। অমিয়দার উদ্যোগে এবং পরিচালনায় এই কমিটির জন্ম হচ্ছে। আমি হলুম অমিয়দার সহকারী।

ফাঁকা দিগন্তে রোদের পাতলা সাদা সর তিরতির করে কাঁপছে। কোথাও কোন গ্রাম বা লোকবসতির চিহ্ন নেই। প্রায় পনেরো মিনিট ঝাঁঝাঁ রোদে হেঁটে আমি বেশ ক্লান্ত। অমিয়দা নীরব, কিন্তু দমে নি। ইতিমধ্যে বারদুয়েক পিছু-বুদ্দির কাছে তার গাঁয়ের দূরত্ব জানতে চেয়ে সঠিক কোন হদিশ পাইনি।

এই এট্টু এগিয়ে—জবাব দিয়েছিল পিছুবুদ্দি।

কিন্তু এই এগোনোর কোন শেষ নেই। চলেছি তো চলেইছি। পিছুবুদ্দি নিজের মনে বলে— পুলুসের বাপের সাধ্যি নেই যে মোদের গাঁয়ে ঢোকে। না আছে রাস্তা, না আছে কিছু। আর একবার ঢুকলে বেরোনো বড়ো কঠিন। পাহাড়, পর্বত সমুদ্রের চেয়ে অনেক ঘোরালো জায়গা মোদের গাঁ। পিছুবুদ্দি এখন অমিয়দার শেখানো রাজনীতি উগরে দিচ্ছে।

এ হলো জনযুদ্ধের তত্ত্ব যা অমিয়দা আর আমি বহুবার তালিম দিয়েছি পিছু-বুদ্দিকে। নিজের শেখানো কথা পিছুবুদ্দির মুখে শুনে অমিয়দার কান খাড়া হয়ে ওঠে। গভীর পরিতৃপ্তি আর সাফল্যে ঠোঁটের কোণায় এক টুকরো হাসি ঝিলিক দেয়। আর রোদ্দুরে ভাজা ভাজা হয়ে আমি ভাবতে থাকি, এত দুর্ভেদ্য, এত দুর্গম জায়গায় পিছুবুদ্দির বাসা করা উচিত হয়নি। এক ঝাঁক টিয়াপাখি মাথার ওপর দিয়ে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। এই ফাঁকা মাঠে কোথায় ওদের বাসা কে জানে !

রোগা শীর্ণ, লম্বাটে চেহারার পিছুবুদ্দির তোবড়ানো গালে কয়েকদিনের কাঁচা-পাকা দাড়ি। পিছুবুদ্দির ডান চোখটা কানা। চোখের মণিটার রঙ ডেলা পাকানো হলুদ পিচুটির মতো। পিছুবুদ্দির গায়ের রঙ কেমন বলা মুশকিল, কেননা গরীব লোকের কোন গাত্রবর্ণ থাকে না। ময়লা, গোলাপী লুঙ্গির ওপর

ততোধিক ময়লা, ছেঁড়া আর হাফহাতা গেঞ্জি পরা পিছুবুদ্দিকে দেখে আকালের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়।

মাস চারেক আগে এক দুপুরে অমিয়দা কলেজ স্ট্রীটে আমাদের পার্টি অফিসে পিছুবুদ্দিকে ধরে নিয়ে এসেছিল। গ্রামাঞ্চলে তখন কৃষক সংগ্রামের ঝড় উঠেছে। রাজ্য জুড়ে গভীর উত্তেজনা আর ভয়ানক একটা কিছু ঘটে যাওয়ার প্রত্যাশা দানা বাঁধছে। শহুরে ভদ্রজন বুঝতে শুরু করছে যে, গ্রামই হলো ভারতবর্ষের শ্রেণী সংগ্রামের মূল আখড়া এবং গ্রামের জোয়ারে শহর ভেসে যাবে। গ্রাম্য গরীব মানুষ আর খেতমজুরদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলার জন্য নগর কল-কাতার প্রগতিশীল মধ্যবিত্তরা তখন বেজায় ব্যাকুল। শহরের পথে ঘাটে গেঁয়ো গরীব মানুষের সঙ্গে কোন ছলে একবার যোগাযোগ হলে, হামলে পড়ছে তার ওপর। কেউ কেউ ঘরবাড়ীর মায়া কাটিয়ে স্রেফ একটা লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে গাঁয়ে চলে যাচ্ছে। এক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই ছাড়া সঙ্গে আর কিছু নিচ্ছে না। পিছুবুদ্দিকে সংগ্রহ করে সেদিন খুবই উত্তেজিত হয়েছিল অমিয়দা। সেদিনও পিছুবুদ্দির কাঁধে ছিল এই তালিমারা নীলচে ঝোলা। একচোখে এক লহমা আমাদের দপ্তরটা দেখে নিয়ে পিছুবুদ্দি দরজার পাশে রাখা লম্বা বেঞ্চিটার এককোণে বসে পড়েছিল। পাশের ছোট ঘরে নিতাইদা কাকে যেন গম্ভীর গলায় নির্বিষ্টভাবে জনযুদ্ধের রাজনীতি বোঝাচ্ছিল। নিশ্চ-য়ই কোন গরীব গেঁয়ো লোককে নিতাইদা আজ পাকড়েছে। কান খাড়া করে নিতাইদার আলোচনা কয়েক মূহূর্ত শুনে পিছুবুদ্দিকে দেখিয়ে অমিয়দা বলে-
—ছিল গাঁয়ের গরীব কমরেড পিছুবুদ্দিকে নিয়ে এসেছি।

হিসেবের খাতায় মুখ গুঁজে গণেশদা একমনে কাজ করছিল। তাকালো না। আমি বেশ খুঁটিয়ে দেখলুম পিছুবুদ্দিকে। গরীব মানুষ ধরার ব্যাপারে অমিয়দার সঙ্গে নিতাইদার এক নিঃশব্দ তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। কেউ কারো কাছে নতি স্বীকারে রাজী নয়।

আমাদের পার্টি অফিসে পিছুবুদ্দির সেই প্রথম আসা। তারপর গত কয়েক মাসে পিছুবুদ্দির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। পার্টি অফিসে পিছুবুদ্দি এখন প্রায় রোজ আসে। রাজনীতির আলোচনা শোনে, মাঝে মাঝে নিজেও দু'চার কথা বলে। কখনো ঝোলাটা বালিশের মতো পাকিয়ে মাথার নীচে রেখে বেঞ্চে শুয়ে ঘুমোয়। পিছুবুদ্দির মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ওর মনের কোন তল পাই না। মুখ দেখে একচোখওলা মানুষের মন বোঝা বড় কঠিন।

পুরোনো কাগজ এবং শিশি বোতল কেনাবেচা হলো পিছুবুদ্দির পেশা এবং সেই সুবাদেই তার সঙ্গে অমিয়দার পরিচয়। রোজ ভোরের প্রথম ট্রেনে পিছুবুদ্দি

সংগ্রামপুর থেকে কলকাতায় আসে এবং সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে যায়। ট্রেনে কখনোই পিছুবুদ্দির ভাড়া লাগে না। বাড়িতে পিছুবুদ্দির বিবি, তিন ছেলে-মেয়ে আর বুড়ি বিধবা মা আছে। পিছুবুদ্দি ঘরে ফিরলে চুলোয় আগুন পড়ে, রান্না হয়। কেননা রান্নার উপকরণ পিছুবুদ্দি না নিয়ে গেলে চুলো জ্বেলে কি লাভ! এইসব মামুলি খবর শোনার সময় সেটা নয়, তবু পিছুবুদ্দির জীবনের এইসব খবর কিছুটা অমিয়দা এবং কিছু পিছুবুদ্দির কাছ থেকে আমি জেনে-ছিলুম। আমাদের পার্টি অফিসে আসার পর থেকে সংসার এবং পেশা সম্পর্কে পিছুবুদ্দির আগ্রহ ক্রমশ কমতে থাকল। পিঠে ঝোলা নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কাগজ কেনার বদলে সে প্রায়ই শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে সোজা আমাদের দপ্তরে চলে আসত। পিছুবুদ্দিকে একদিন না দেখতে পেলে অমিয়দাও উতলা হতো। পার্টি অফিসে মাসের শেষে যে দশ-বিশ কেজি কাগজ জমতো পিছুবুদ্দিকে তার ক্রেতা করা হলো। কিন্তু সামান্য দশ বিশ কেজি কাগজ কেনাবেচায় ছ'জন মানুষের মাস চলে না। তবু পিছুবুদ্দির কোন উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে পার্টি অফিসে একচোখ মেলে চুপচাপ বসে থাকে, আড্ডা মারে, চা খায়, বিড়ি টানে এবং অমিয়দা, নিতাইদা, গণেশদা এবং আরো পাঁচজনের টুকরো ফরমাস খাটে। সন্ধ্যের পর বিবর্ণ, রিক্ত ঝোলাটা কাঁধে তুলে নিঃশব্দে ষ্টেশনের দিকে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত নিতাইদাকেও একদিন স্বীকার করতে হলো যে পিছুবুদ্দির মধ্যে সত্যিকার পেশাদার পেশাদার বিপ্লবীর যাবতীয় লক্ষণ ফুটে উঠছে। সে কথা শুনে আত্মতৃপ্তিতে ঝলমল করে উঠেছিল অমিয়দার মুখ।

টলমল ভঙ্গীতে খোঁড়া পায়ে অমিয়দা হাঁটছিল। অমিয়দার বাঁ পাটা ডান পায়ের চেয়ে ইঞ্চিখানেক ছোট। সজারুর কাঁটার মতো অমিয়দার লম্বা লম্বা কাঁচা-পাকা চুল চলার তালে তালে লাফাচ্ছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, সশব্দ।

একই তালে বকে যাচ্ছিল পিছুবুদ্দি—বিপ্লবের পর পরিবার পিছু দু'তিন বিঘে জমি দিলেই দেশগাঁয়ের হাল একদম বদলে যাবে। ক্ষিদে হলো মানুষের সব-চেয়ে বড়ো দুশমন। পাঁচশো চালের ভাত মুই একলা খেতে পারি। দুবেলা ভাত খেলে মানুষের চেহারাই বদলে যায়। মুই যখন দুবেলা খেতে পেতুম তখন আপনার চেয়েও তাগড়াই ছিল মোর শরীর।

কোন কথা না বলে অমিয়দা পিছুবুদ্দির দিকে তাকাল। পিছুবুদ্দির খেয়াল নেই। সে কথা বলায় মশগুল—ফুলপ্যান্টুল আর ফর্সা জামাকাপড় পরা মানুষদের গাঁয়ের গরীব লোকেরা বিশ্বাস করে না। উপোসী, মুখ্যু মানুষদের সন্দেহ করা একটা বাই। চকচকে শরীর, ঝকঝকে প্যান্টুল, শার্ট পরা এক বি. ডি. ও. বাবুকে এই জলায় একবার বল্লম খোঁচা করে গাঁয়ের কেউ মেরে রেখেছিল। ওফ্, সে কি হুলুস্থুলুস কাণ্ড!

অমিয়দা আর আমি এক পলক পরস্পরের প্যান্ট শার্টের ওপর নজর চালিয়ে নিলুম। পিছুবুদ্দি কখনো এত কথা বলে না। আজ ওকে যেন কথায় পেয়েছে। কি এক সন্দেহ আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে। সরল গলায় আমি প্রশ্ন করলুম—জামা-কাপড় দিয়ে কি মানুষের বিচার হয়?

তা হয় না—পিছুবুদ্দি সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিল এবং বলল—মরা মানুষের প্যাণ্টুল পরেও যা ওজন ধুতি পরেও সেই ওজন।

পিছুবুদ্দির কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না।

পিছুবুদ্দি এবার চাপা গলায় বললো—আসলে আপনার মতো পরিষ্কার জামা-প্যাণ্টুল পরা এক বাবু অনেকদিন আগে মোর ডান চোখের মণিটা গেলে দিয়েছিল। বাপরে, সে কি দরদ আর কষ্ট! আমি আর কোন কথা বলার সাহস পাই না। পিছুবুদ্দি নিজেই পুরোনো ঘটনা বলতে শুরু করলো—চ্যাটার্জী কর্তারা হলো আমাদের এই চত্বরের জমিদার, মহাজন। খুব বড়ো মানুষ, অনেক পয়সা। তা বুড়ো কর্তার মেজো মেয়ের বিয়ে ছিল সেদিন। সে কি জাঁকজমক আর এলাহি কাণ্ড-কারখানা। মুই তখন এট্টুকু ছানা, বছর দশ-বারো বয়েস। মোচনমান পাড়ার আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে বাড়ীর চারপাশে সকাল থেকে মুইও ঘুরঘুর করছিলুম। ভেন ঘরের সামনের বাতাস তখন ভালো ভালো অন্ন-ব্যাঞ্জনের সুবাসে ভুরভুর করছিল। কর্তাদের বাড়ীর খিড়কির দিকে ফাঁকা মাঠ ঘিরে ভেন বসেছিল। ও দিকটায় মানুষজন কম। শেষ বিকেলে তেরপলের ফাঁক দিয়ে দেখলুম, সেখানে কেউ নেই। একটা বড় হাঁড়ি ভর্তি ঘি-ভাত পাহাড়ের মতো উঁচু হ'য়ে আছে। কি যে বদ বুদ্ধি চাপল মাথায়, ঢুকে পড়লুম ভেনঘরের ভেতরে। পেটে যে এত ক্ষিদে জমে ছিল সারাদিন টের পাইনি। ঝাঁপিয়ে পড়লুম ঘি-ভাতের হাঁড়িতে। হাত মুখ পুড়িয়ে দু-তিন গেরাস খেয়েছি কি খাইনি, তখনি ধরা পড়ে গেলুম।

তারপর—উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলুম আমি।

পিছুবুদ্দির মুখে কোন বিকার নেই। আমার প্রশ্নটাও যেন তার কানে গেল না। ধূ-ধূ তপ্ত দিগন্তের দিকে আঙ্গুল তুলে সে বলল—হুই, হুই মোদের গাঁ।

অমিয়দা একটা সিগারেট ধরাল। অমিয়দার চশমাটা নাকের কাছে ঝুলে আছে। চশমাটা প্রায় সব সময়েই ওরকম থাকে। ফলে নাক কুঁচকে অমিয়দা সেটাকে যথাস্থানে ধরে রাখার চেষ্টা করে। তাই অমিয়দার মুখের দিকে তাকালে মনে হয়, লোকটা সদাই বিব্রত, বিরক্ত।

পিছুবুদ্দি কাহিনী শেষ করল। বামুনকর্তার কলেজে পড়া ছেলে মোর চোখে জলের মত কি একটা জিনিস কয়েক ফোটা ঢেলে দিল। ওরে বাবা, তারপর কি জ্বালা!

যন্ত্রণায় এতদিন পরেও পিছুবুদ্দির মুখটা কুঁচকে বেঁকে যায়।

অমিয়দা ঘন ঘন সিগারেট টানে। আমি চুপ।

পিছুবুদ্দি বলে যায়—বি. ডি. ও. সাহেব সকাল থেকে বিয়েবাড়ীতে ছিল। তার চোখের সামনেই ঘটনাটা হল। কিন্তু ধর্ম্মের কল, সেই বি. ডি. ও. বল্লমের খোঁচা খেয়ে মরল। শকুনে তার দুটো চোখ উপড়ে নিয়েছিল।

পাতলা, সাদা রোদের চিকের ওপাশে এখন সত্যি একটা গ্রামের আবছা রেখা ভেসে উঠেছে। পিছুবুদ্দির গ্রাম এখন যেন মরুদ্যান। হঠাৎ সন্দেহ হয়, ওটা হয়তো গ্রাম নয়, আমার বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চোখের বিভ্রান্তি! মানুষ তো এভাবেই মরীচিকা দেখে।

পিছুবুদ্দি আবার গজগজ শুরু করলো—তবে হ্যাঁ, সে ঘি-ভাত খাওয়ার কথা আজো মোর মনে আছে। যেমন স্বাদ তেমন বাস। চোখটা গেলে দেওয়ার পর কর্তাবাবুর ছেলের কেন জানি দয়া হয়েছিল। তখন মাঝরাত। বিয়েবাড়ীর হৈ-চৈ জুড়িয়ে গেছে। মোল্লার ভাগাড়ে হুক্কাহুয়া শ্যাল ডাকছিল। হ্যারিকেনের আলোয় খিড়কির ঘাটে কলাপাতা পেতে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কর্তাবাবুর ছেলে খাইয়েছিল আমাকে। চোখের বিষজ্বালা গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল, তবু দমভোর ঘি-ভাত খেয়েছিলুম সেদিন।

পিছুবুদ্দি হঠাৎ তার ডান হাতটা অমিয়দার নাকের ওপর চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল—পাচ্ছেন? ঘিয়ের বাস পাচ্ছেন? পিছুবুদ্দির এই আকস্মিক, অদ্ভুত ব্যবহারে অমিয়দা একটু ভড়কে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। একপলক পিছুবুদ্দির দিকে তাকিয়ে অমিয়দা বললো—নাহ্, কোন গন্ধ পাচ্ছি না। অমিয়দার জবাবে পিছুবুদ্দি দমল না। বলল—আপনারা প্রায়ই ঘি-ভাত খান, তাই আপনারা কোন বাস পাবেন না। মুই পাই। মোর বিবি, ছেলেমেয়েরা পায়। পেটে যখন খুব ক্ষিদে চাগাড় দেয়, তখন মোরা একসঙ্গে বসে হাতের গন্ধ শুঁকি।

অমিয়দার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তার মনোভাব আঁচ করার চেষ্টা করি। উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর অমিয়দার চোখে কি এক সন্দেহ আর অস্বস্তি মিশে আছে। মুখচোরা শান্ত ভীতু পিছুবুদ্দি অমিয়দার চেনা লোক। তার বদলে এই বাক্যবাগীশ, বাচাল পিছুবুদ্দিকে বড়ো অপরিচিত, রহস্যময় মনে হয়। আমার বুকের মধ্যেও ক্লান্তি আর সংশয় ঘন হতে থাকে।

ট্রেনে আসার সময় পিছুবুদ্দির সামনে বসে আমরা গত রাতে হরিহরদার বাড়ীতে নেমন্তন্ন খাওয়ার গপ্প করছিলুম। হরিহরদা পার্টি কমরেড। গতকাল তার মেয়ের বিয়েতে পোলাও, মাংস এবং আরো নানা সুখাদ্য হয়েছিল। ট্রেনে সেই ভুরিভোজের কাহিনী, বিশেষ করে পোলাওয়ের কথা আমরা অনেকক্ষণ ধরে

আলোচনা করেছিলুম। দারুণ বানিয়েছিল পোলাও। ঘি, কিসমিস, জাফরাণ আর কাজুবাদামের ছড়াছড়ি।

একটা গুড়গুড় শব্দ বুক থেকে আমার পেট, পাকস্থলীতে গড়িয়ে যেতে থাকে। অমিয়দা স্তব্ধ, কোন কথা নেই তার মুখে। এক তপ্ত লোহার চাটুর ওপর দিয়ে যেন আমরা হেঁটে চলেছি। কপালে, গলায় হাত ঠেকলে নিজের শরীরের তাপে নিজেই চমকে উঠি। মাথার ওপর কে যেন গনগনে আগুন ভর্তি একটা মালসা বসিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মতালু গলে যাচ্ছে। সেই সকাল সাড়ে সাতটায় শিয়ালদা ষ্টেশনে মাত্র এক ভাঁড় চা খেয়ে ট্রেনে চেপেছি। তারপর পেটে দানাপানি কিছুই পড়েনি। ক্ষুধা, তৃষ্ণার কোন বোধও শরীরে নেই। শরীরের সব প্রবৃত্তি আর অনুভূতিগুলো কেমন অসাড়, ভোঁতা হয়ে গেছে। পিছ্‌বুদ্দি বললো—মোর বুড়ি মায়ের বড়ো খাই-খাই স্বভাব। চার কুড়ি বয়েস হয়ে গেল, তবু বুড়ির এখনো খিদে মেটেনি। মাজা ভেঙ্গে গেছে, ভালো করে হাঁটতে পারে না, অথচ মুখের বত্রিশটা দাঁতের একটাও নড়েনি। ভাবুন, কি সর্বোনেশে ব্যাপার। মাঝে মাঝে এমন রাগ হয় যে ভাবি নোড়া দিয়ে দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিই। কিন্তু পারি না। যত যাই হোক, গৰ্বধারিণী মা তো বটে! কাল রাতে মুই বাড়ী ফিরি নি। বুড়ি হয়তো সারা রাত কেঁদেছে।

পিছ্‌বুদ্দির কথাটা ঠিক। সংগ্রামপুরে আমাদের আনার জন্যে কাল রাতে ও পার্টি অফিসে থেকে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার খেয়াল হলো, পার্টি অফিস থেকে সদলে আমরা যখন হরিহরদার বাড়ীতে নেমতন্ন খেতে গেলুম, তখন পিছ্‌বুদ্দিও সেখানে বসেছিল। পিছ্‌বুদ্দি কি গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে? কেউ তাকে ডেকে-ছিল? আমি ডাকি নি। নেমন্তন্ন বাড়ীতে কার পাশে বসে সে খেয়েছিল, সেটাও আমার খেয়াল নেই। কাল রাতে পিছ্‌বুদ্দি আদৌ খেয়েছিল কি? অমিয়দাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও আমি থমকে যাই। দু-চোখে কেমন এক দিশেহারা দৃষ্টি নিয়ে অমিয়দা মাঝে মাঝে পিছ্‌বুদ্দিকে দেখছে। খোঁড়া পায়ের জন্য খানিকটা পিছিয়েও পড়েছে অমিয়দা। দেহের তুলনায় অমিয়দার মাথাটা কিঞ্চিৎ বড়। ঘাড় নুয়ে পড়েছে। কাঁচা পাকা চুলে ঢাকা মাথাটা বড় বিচিত্র দেখায়।

লম্বা, ময়লা ঝোলাটা কাঁধ বদল করে পিছ্‌বুদ্দি গিয়ে দাঁড়াল অমিয়দার পাশে। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে প্রশ্ন করল—কখনো উপোস করেছেন দাদাবাবু? নুয়ে পড়া ঘাড় সোজা করে অমিয়দা তাকালো পিছ্‌বুদ্দির দিকে। রোদ, তাপ আর অসহ্য শ্রমে অমিয়দার দু চোখের জমি কেমন ঘোলাটে দেখায়। নিঝুম, স্তব্ধ দুপুর। ফাঁকা-মাঠে পিছ্‌বুদ্দির এমন একটা প্রশ্নও অমিয়দা কেন যেন শুনতে পেল না। নিজের প্রশ্নটা পিছ্‌বুদ্দি দ্বিতীয় দফায় আওড়াতে অমিয়দা

থমকে দাঁড়াল। তারপর একটু ভেবে বলল—জ্বরজারি হলে উপোস তো দিতেই হয়। আমিও দিয়েছি।

ব্যারাম, বিপত্তির কথা বলতেছি না—পিছ্নবুদ্দি জানাল—সুস্থ শরীরে যখন পেট-ভর্তি ক্ষিধে, তখন কি উপোস দিয়েছেন? পর-পর তিন চার দিন।

এমন একটা কঠিন, রূঢ় প্রশ্নের ধাক্কায় অমিয়দা নিস্তব্ধ নির্বাক হয়ে যায়। আমিও বুঝতে পারি যে, পিছ্নবুদ্দি আমাদের ক্রমশ এক অদৃশ্য দেওয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরতে চাইছে। অনাহারে কাটানো আমার নিজের জীবনের একটা দিনের স্মৃতি আমি সন্ধান করতে থাকি। কিছ্ন না, নেই। উপোসী চব্বিশ ঘণ্টার একটা ঘটনাও আমার জীবনে আসে নি। অমিয়দার জবাবের অপেক্ষা না করে পিছ্নরুদ্দি বলল—মোর উপোস করার অভ্যেস আছে। শুধু মোর কেন, গোটা পরিবারের অভ্যেস আছে। মোর বাপ, ঠাকুর্দাও উপোস দিয়েছে বহুদিন। তবে মোর মা হলো বড়োলোকের মেয়ে। তাই আজো তার যখন-তখন ক্ষিদে পায়। ক্ষিদে পেলে বুড়ি কাঁদে।

ফাঁকা মাঠে নিষ্পত্র দু-একটা কাঁটাভর্তি বাবলা গাছ। রোদে বাবলা গাছের ছায়া, না ছায়া নয়, ছায়ার কঙ্কাল হাত-পা খিঁচিয়ে খোলা মাঠে শুয়ে আছে। এক ঝলক তপ্ত হাওয়ায় ফ্যাকাসে সাদা রঙের দলাপাকানো একটা সাপের খোলস আমার গা ঘেঁসে উড়ে গেল। পিছ্নরুদ্দির গা এখন পরিষ্কার দেখা যায়। আমার পেটের ভোঁতা ভাবটা কেটে গিয়ে এখন চনচনে ক্ষিধে। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা উচ্চারণ করতে পারি না। তলপেট থেকে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। একটু জল চাই। চোখের সামনে রোদের সাদা সরটা মাঝে মাঝে ফুলঝুরির মতো জ্বলে উঠছে। পায়ের তলার মাটি হঠাৎ বোঁ করে একপাক ঘুরে স্থির হয়ে যাচ্ছে। ফাঁকা মাঠে কয়েকটা গর্ন্ন আর ছাগল আমার নজরে পড়লো। র্ন্নক্ষ, তৃণহীন প্রান্তরে পশুগুলো জিভ বার করে ধুঁকছে। হলুদ রঙের একটা জীর্ণ গাভী ক্লান্ত ভঙ্গীতে একটা পাথুরে ঝামা চাটছে। এর নাম গর্ন্ন, ঝামা চেটে ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাতে চায়।

উঁচুনীচু মেঠো রাস্তা ছেড়ে আমরা এখন আলপথ ধরে হাঁটছি। সামনে পিছ্নরুদ্দি। পিছ্নরুদ্দির শামুকপোতার বাড়ীঘর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গায়ে গা লাগিয়ে গাদা-গাদি করে দাঁড়িয়ে আছে এক ঝাঁক জীর্ণ একচালা মাটির ঘর। খড়ের চাল পচে হেজে কালচে সাদা হয়ে গেছে। আলপথ শেষ হতেই উঁচু মাঠ। এখান থেকেই গাঁয়ের শুর্ন্ন। সামান্য এগিয়ে দু'পাশে বড়ো ঝাঁকড়া গাছপালা, পাতায় ধুলোর সর, কোথাও কোনো রঙ নেই। একটা নিম গাছের তলায় বসে একটা কুকুর জিভ বার করে ঝিমোচ্ছে। ডানহাতি একটা পানাভরা পুকুর, জল নেই বললে হয়। আধ-হাত জলের নীচে কালো পাঁক দেখা যাচ্ছে। কোথাও কোন জনপ্রাণীর সাড়া নেই। এমন শব্দহীন, শান্ত গ্রাম আমি আগে দেখিনি। সূর্য

মাঝ আকাশ ছেড়ে পশ্চিমে হেলেছে। পিছুরুদ্দির বাড়ীর দিকে একটু এগোতেই একটানা গোঙানির মতো সরু গলায় তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ আমাদের কানে এল। বড়ো করুণ, ভয়াবহ সেই ধ্বনি, মড়াকান্নার মতো, বুক হিম হয়ে যায়। আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। শ্মশানের মতো এই গ্রাম আগলে কে কাঁদছে? অমিয়দাকেও খুব বিচলিত দেখায়। বাধ্য অনুগত চেলা পিছুরুদ্দি কোথায় নিয়ে চলেছে তাদের! ভারতীয় বিপ্লবের নেতৃত্ব যার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত অমিয়দা নিয়েছে, সেই পিছুরুদ্দির আচরণে একি হেঁয়ালি।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে স্বাভাবিক গলায় পিছুরুদ্দি বললো—মোর মা কাঁদ-তেছে। ক্ষিদে পেলেই বুড়ি কাঁদে।

কান্নার শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট এবং জোরালো হতে থাকে। পিছুরুদ্দির ভিটের সামনে এসে আমরা দাঁড়ালুম। পিছুরুদ্দি হাঁক দিল—মা।

মূল কুঁড়ের বাঁদিকে একটা ছোট একচালা ছাগল বা হাঁস মুরগির ঘর। সেখান থেকে খনখনে গলায় একজন সাড়া দিল—কে, পাঁচু এলি?

নিমেষের মধ্যে ধ্বংসস্তূপের মতো সেই ঘরটা থেকে পোড়া চ্যালাকাঠের মতো চেহারা, এক অশীতিপর কোলকুঁজো বুড়ি বেরিয়ে এসে পিছুরুদ্দির গলা ধরে ঝুলে পড়ে এবং বারবার জিজ্ঞেস করে—কি এনেছিস, কি এনেছিস আমার জন্যে।

বুড়ির শরীরে নাক নেই, চোখ নেই, কান নেই স্রেফ চামড়া জড়ানো কয়েকটা হাড়। পিছুরুদ্দির গলা আঁকড়ে বুড়ি অদ্ভুদ গলায় গোঙাতে থাকে। তখন ঘরের ঝাঁপ সরিয়ে বাড়ির দাওয়ায় তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এক বৌ এসে দাঁড়িয়েছে। এক নজরেই ধরা পড়ে এরা পিছুরুদ্দির স্ত্রী এবং সন্তান। উপসিমুখ, কঙ্কাল-সার শরীর। বিপ্লবী পিছুরুদ্দি, কমরেড পিছুরুদ্দির সংসারের এই ভীতিপ্রদ, শ্রীহীন চেহারা দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। অমিয়দা নিস্পন্দ। ঝুলন্ত মাকে গলা থেকে নামিয়ে মাটির ওপর দাঁড় করিয়ে রহস্যময় এক জাদুকরের ভঙ্গীতে পিছুরুদ্দি তার ঝোলার মধ্যে হাত ঢোকাল। প্রথমে আটার ঠোঙাটা বার করে মার হাতে দিয়ে বলল—পাঁচশো আটা।

আটার ঠোঙা হাতে রোমাঞ্চে শিউরে উঠে বুড়ি বলল—আহা আটা।

তারপর আলু আর ভেলিগুড়ের মোড়ক দুটো পিছুরুদ্দি পরপর হেঁকে হেঁকে তুলে দিল বুড়ির হাতে।

সেইরকম কাঁপা গলায় বুড়ি উচ্চারণ করল—আহা আলু, আহা ভেলিগুড়।

খুশিতে আর আবেগে বুড়ির মুখের অদৃশ্য ঠোঁট, চোখ কান নাক স্পষ্ট হয়ে ফুটে

উঠতে থাকল। দাওয়ার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পিছুবুদ্দির সন্তানেরাও খলবল করে উঠল।

অমিয়দা এবং আমি দুজনেই অবাক, শুদ্ধ কোন কথা বলতে পারি না। কেন যেন আমার মনে হলো, পাঁচপো আটা, আলু, ভেলিগুড় এবং ভারতীয় বিপ্লব সমান জরুরী।

বিরাম ঘড়ি

রাত নিশুত হলে ঘড়িটা কথা বলে। নিঝুম ঘুমে চরাচর ডুবে যায়। ঘড়ির গলা তখন পরিষ্কার, নিখুঁত। টিক-টক টিক-টক ভারী আওয়াজের সঙ্গে মহাকাল আর জন্ম জন্মান্তরের নানা গল্প, টুকরো স্মৃতি শ্রুতি কাহিনী অন্ধকারে ভেসে বেড়ায়।

ভেতর বাড়ীর দোতালার বারান্দায় রেলিংএ হাত রেখে মধুসূদন একা দাঁড়িয়ে আছে। চোখে ঘুম নেই। বাষট্টি বছরের জীবনে কম ঘুম তো আর হয় নি। জীবনের বাকী কটা দিন তাই ঘুমের একটু ঘাটতি হলে মধুসূদন ভাবে না। নীচের উঠোনে ঢোকার মুখে বিরাট থামের সঙ্গে গাঁথা ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে। এই একটা জিনিষ। কতোকাল জেগে আছে। ঘুম নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। তবু থামে না, ক্লান্ত হয় না। ঠাকুর্দা নরোত্তম রায়ের কেনা এই ঘড়িটাকে মধুসূদন জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছে। রদারহ্যাম কোম্পানীর তৈরী বিরাট সাদা বারকোসের মতো ডায়াল। ঠাকুরমা বলতো রাধারমণের ঘড়ি। হপ্তায় একদিন ঘেঁটুবাবু এসে বাড়ীর সব ঘড়িতে দম দিয়ে যেতো। তখন এই গ্র্যাণ্ড-ফাদার ক্লকেও দম পড়তো। মাঝে মাঝে মুখের পর্দা সরিয়ে ঘড়ির বুকে পেটে ঘেঁটুবাবু তেল দিতো। ঘেঁটুবাবু মরার পর তার ছেলেরা আর কেউ ঘড়ির লাইনে এলো না। পাড়ার আর এক ঘড়ির দোকানী শীতলবাবুর ওপর ঘড়ি সামলাবার ভার পড়লো। সেও আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। তখন বাবা নিকুঞ্জ রায়ের আমল। তার কিছুদিন আগে ঠাকুর্দা নরোত্তম গত হয়েছে।

এই বাড়ী তখন জমজমাট। কতো লোক, হৈ,হল্লা, ফুর্তি লেগেই আছে। এই সময়েই মধুসূদনের বিয়ে হয়। নীচের অন্ধকার উঠোনটার দিকে তাকিয়ে চল্লিশ বছর আগের এক বিকেলের ছবি মধুসূদনের মনে পড়ে। শাঁখ, উলুর ঝড় উঠেছে। দুটো ইঁটের উনুনের ওপর পেতলের হাঁড়িতে উথলে উঠছে দুধ। দুটো রাঙা লক্ষ্মীর পা মাটি ছুঁয়ে সদর দরজা পেরিয়ে প্রথম এই বাড়ীতে ঢুকলো। তখন নিভাননী সবে চোদ্দ পেরিয়েছে। সেদিনও এই ঘড়ি, এই টিক-টক শব্দ। ঘড়িটার লোভে বাড়ীতে দু একবার চোর এসেছে। অনেক বছর আগে মাঝরাতে ঠুকঠাক শব্দে ঠাকুর্দার ঘুম ভেঙে যায়। ঘরের দরজা খুলে

চুঁপসারে বারান্দায় দাঁড়াতে ঠাকুর্দার নজরে পড়লো একতলায় আবছা অন্ধকারে একটা চোর হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে ঘড়িটা খোলার চেষ্টা করছে। ঠাকুর্দা মিনিট খানেক ঘটনাটা দেখে নিরীহ সুরে বলে উঠলো—এই ঘড়ি খুলিতে পারিলে পাঁচশত টাকা পুরস্কার।

অন্ধকারের ভেতর থেকে হঠাৎ ঠাকুর্দার হেঁড়ে গলা ভেসে আসায় চোরটা ভড়কে গিয়ে দৌড় লাগায়। হাতুড়ি, ছেনি ফেলে নিমেষে পগার পার! বাড়িশুদ্ধ লোক জেগে শোনে অন্ধকার বারান্দায় ঠাকুর্দার সৌক একটানা খুকখুক হাসি। মধুসূদনের বয়েস তখন বছর চার। এ ঘটনা তার মনে নেই। ঠাকুমার মুখে গল্প শুনেছিল।

অনেক উঁচুতে এক চিলতে আকাশে কয়েকটা তারা জ্বলছে। ছাতের কার্নিশে মধুসূদন হঠাৎ একটা লক্ষ্মী পেঁচা দেখতে পেল।

সাদা ধবধবে গায়ের রঙ, অন্ধকারেও দেখা যায়! বাস্তু পেঁচা। মা লক্ষ্মীর এই বাহন কয়েক পুরুষ ধরে এই বাড়ীতে বাস করছে। চিলে কোঠার ঘুলঘুলি অথবা তিনতলায় কাঁচের ঝিলিমিলির ওপর বাসা বাঁধে। মাঝ রাতে কখনও সখনও গম্ভীর গলায় ডেকে ওঠে। জীবনের সব খোলস তখন কেমন ধীরে ধীরে খসে যায়। মানুষ দেখে সে একা, মুক্ত বন্ধনহীন। জীবন এবং মৃত্যু গায়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে। জীবন থেকে অনায়াসে মৃত্যুর পৃথিবী ঘুরে আবার জীবনে ফিরে আসা যায়। রোদ আর ছায়ায় বোনা জীবন মৃত্যু। কিছুতেই এখন আর মধুসূদনের কোনো উদ্বেগ নেই! ঘুমোলেই মৃত্যুর স্বপ্ন। বহুকাল আগে মরে যাওয়া কত্তো মানুষ, প্রিয়জন ঘুরে ঘুরে আসে।

সেদিন হঠাৎ কলেজ স্ট্রীটে মণীন্দ্রনাথ দেব মহাশয়ের সঙ্গে মধুসূদনের দেখা হলো। মণীন্দ্রবাবু য়ুনিভার্সিটিতে দর্শন পড়ান। মধুসূদনের অধ্যাপক। দেখা হওয়ায় দুজনেই খুশী! মণীন্দ্রবাবু সেই একইরকম শান্ত ধীর। নরম নীচু গলায় কথা। মুখে স্নেহ জড়ানো হাসি। ধুতির ওপর হাত গোটানো ফুলশার্ট, পায়ে পালিশ করা কালো চকচকে নিউকাট জুতো। মণীন্দ্রবাবুকে নিয়ে মধুসূদন কফি হাউসের দোতলায় ওঠে।

কয়েকজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে মণীন্দ্রবাবুর পরিচয় দিয়ে বলেছিল —ইনি শ্রীমণীন্দ্রনাথ দেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফির প্রফেসর। পণ্ডিত মানুষ।

টেবিলের সকলে মণীন্দ্রনাথকে নমস্কার করেছিল।

মণীন্দ্রনাথ নরম হেসে সকলের দিকে এক পলক তাকিয়ে বলেছিল—আমি আগে পড়াতুম। কিছুদিন হলো মারা গেছি। এখন আর পড়াই না, তবে আমি এই এলাকায় থাকি। সব কিছু দেখতে পাই, নজর রাখি।

মণীন্দ্রনাথের শান্ত নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মধুসূদনের গোটা শরীর কেমন শিউরে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল বেশ অনেক বছর আগে মণীন্দ্র-নাথ মারা গেছে। অথচ চেয়ারে বসা মণীন্দ্রনাথ একটুও বদলায়নি। পুরোনো দিনের মতো সহজ, স্বাভাবিক চেহারা কথাবার্তা।

মধুসূদনের মুখের ওপর দুচোখ রেখে মণীন্দ্রনাথ বলেছিল—তোমার সামনে ভালো দিন।
তখনই মধুসূদনের ঘুমটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। চারপাশে ঘন অন্ধকার নীরবতায় মধুসূদনের কানে নিজের বুকের ধকধক শব্দ বাজে। এইভাবে বার-বার মৃত্যুর সঙ্গে রোজ দেখা হয়। এই তো কয়েকদিন আগে সন্ধ্যের আগে হঠাৎ নিভাননী ঘরে ঢুকলো। মধুসূদনের জামা, কাপড় লুঙ্গিতে অগোছালো আলনাটা সেই আগেকার দিনের মতো তাড়াতাড়ি নিপুণ হাতে গুছিয়ে দিল। মধুসূদন অবাক হয়ে দেখছিল। ভাবছিল, হয়তো নিভাননী খাটের ওপর বিছ-নার ধার ঘেঁসে দুমিনিট বসবে। কিন্তু না, কাজ শেষ করে চুপচাপ চলে গেল। বড়ো মেয়ে আনু মারা গেছে, সেও প্রায় ত্রিশ বছর আগের কথা। মেয়েটার তখন বছর নয় বয়েস। পর পর তিন মেয়ে। আনুই বড়ো। ভালো নাম আনন্দ-ময়ী। তাজা ফুটফুটে ফুলের মতো মেয়েটা বেরিবেরিতে মারা গেল। ডাক্তার বদ্যি, বাঁচাবার সব চেষ্টাই হয়েছিল। মরার আগে বড়ো কষ্ট পেয়েছিল আনু। সেকি ছটফটানি, চোখে জল। অন্ধকার ছাতে একা দাঁড়িয়ে মধুসূদন বিড়বিড় করেছে আনুর সব রোগ আমাকে দাও। ও যেন কষ্ট না পায়। ও যেন বাঁচে। কিছুই হয় নি, কেউ শোনেনি। সেই বাচ্চা মেয়েটাও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। ভূত বা ভগবানে মধুসূদনের বিশ্বাস নেই। এই দৃশ্যমান জগতে একটাই জীবন। দুদিনের হাসিকান্না। তারপর অন্ধকার, ফাঁকা। আজকাল মধুসূদন নানা কথা ভাবে। জীবনের পর মানুষ কোথায় যায়? কতোকাল আগে মরে যাওয়া মানুষগুলো কেন বারবার চোখের সামনে ঘুরে ফিরে আসে? তাহলে কি ওরা এই পৃথিবীর মধ্যেই ডুব সাঁতার দিয়ে আছে? মাঝে মাঝে জল ঠেলে ভুস করে ভেসে উঠে আবার ডুবে যায়!
জীবন আর মৃত্যু নিয়ে সমস্যা মধুসূদনের মাথায় জেগে থাকে। মধুসূদন দর্শনের ছাত্র। মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়ে ও নিজের স্বপ্নগুলোকে বুঝতে পারেনি। ভারতীয় দর্শনের আত্মা, জন্ম জন্মান্তর তত্ত্বও ওর কাছে ধাঁধা। তবু জীবন এবং মৃত্যুকে দুহাতে ছুঁয়ে থাকার অনুভূতিকে একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যায় গাঁথার জন্যে মধুসূদন হাতড়ে বেড়ায়।
একতলায় ঘড়িতে রাত দুটোর শব্দ। মহাকালের কনিষ্ঠ পুত্র, এই ঘড়ি, কি চমৎকার নিজের কাজ করে যাচ্ছে। একটুও ফাঁকি নেই। একশো পাঁচ বছর

হয়ে গেলো। কতো জীবন মৃত্যুর সাক্ষী। ছেলেবেলায় গল্প উপন্যাসের পাতায় নায়ক, নায়িকা বা দুটো চরিত্রের মধ্যে প্রায় দশ, পনেরো বা বিশ বছর বাদে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার কাহিনী পড়ে মধুসূদন অবাক হতো। চোদ্দ, পনেরো বছরের মধুসূদন ভাবতো দশ, পনেরো বছর বাদে দেখা হলে চেনা মানুষকে কি চেনা যায় ? আর নিজের অল্প বয়সের জন্যে মধুসূদনের বুকের ভেতর কি এক কষ্ট পাক খেতো। দীর্ঘকাল বাদে দেখা হওয়ার রোমাঞ্চ বুঝতে কিশোর মধুসূদনকে আরো অনেক বছর অপেক্ষা করতে হবে। সেই বয়েসে পঁচিশ, ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছরের মানুষকেও খুব বয়স্ক, বুড়ো লোক মনে হতো। ত্রিশ মানেই অনেক বয়স। আসলে তখন চারপাশে তার চেয়ে কম বয়েসী মানুষ যে খুব একটা বেশী ছিল না ! এখন এই বাষট্টি বছরে দাঁড়িয়ে ত্রিশের ছেলে-টাকে দেখে বুকের মধ্যে কি এক ঢেউ উথলে ওঠে। দুধের শিশু সব।

আনু মরে যাওয়ার পর মনটা বড়ো ভেঙে গেছলো। আনুর তো মরার বয়েস হয়নি। মৃত্যুও সমুদ্রের সাজানো ঢেউ। নিয়মমাফিক, পরপর ভাঙ্গে। লাইন দিয়ে তীরের দিকে ছুটে আসে। এ তীরের নামই মৃত্যু। শিশুকাল থেকে এই নিয়মেই ও মৃত্যু দেখেছে। এক সময় চারপাশে কতো দাদু, ঠাকুমা, দিদিমা ছড়িয়ে ছিল। ক্রমশঃ তারা কমে যেতে যেতে একসময় মুছে গেল। তারপর বাবা মা, জ্যাঠা, কাকা, মামা, মামী, পিসীদের ঝাঁক থেকে দু একজন খসতে শুরু করলো। দাদু ঠাকুমাদের ঢেউ পাড়ের শক্তমাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা কাকা মাসীদের ঢেউ জোরালো বেগে চড়ার দিকে ছুটতে শুরু করেছে। বাবা মা-দের ঝাঁকও একসময় ফুরিয়ে যায়। তখন নিজেদের তৈরী হতে হয়। সামনে পারের শক্ত মাটি ওৎ পেতে বসে থাকে। পেছনে হাজার ঢেউ। অসংখ্য শিশুর হাসি, কথা হাওয়ায় বাজে। মহাসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে আসে। শিশুরা ভালো থাক, এই কথা বলে খেলা শেষ হয়। এটাই ছক। তার মধ্যে হঠাৎ আনুর মৃত্যু ভীষণ তাল কেটে দিয়েছিল। মধুসূদন এখন বোঝে, কিছু অনিয়ম নিয়েই নিয়ম। অনিয়ম না থাকলে জীবনের ছক মজবুত হয় না।

আজকাল এই ঘড়িটার মধ্যে থেকে সমুদ্রের শব্দ জাগে। অনেক রাতে গোটা পৃথিবী যখন চুপচাপ, আকাশ আর মাটিতে কেউ জেগে নেই, তখন এই ঘড়িটার টিকটক শব্দের আড়াল থেকে সমুদ্রের সাঁই সাঁই হাওয়ার ডাক, ঢেউ ভাঙার আও-য়াজ ছুটে আসে। দিন কয়েক আগে মাঝরাতে নীলু এসেছিল। নীলুর ভালো নাম, নীলাম্বর মজুমদার। মধুসূদনের বড়ো পিসীর ছেলে। খুব সুন্দর দেখতে ছিল নীলুকে। বয়েসে মধুসূদনের চেয়ে বছর চারেকের ছোট। মধুদা বলে ডাকতো।

নিভাননীর সঙ্গে খাতির ছিল খুব। একটু ভবঘুরে স্বভাবের মানুষ ছিল নীলু। কোনো চাকরী বেশীদিন টি'কতো না। সংসারে অশান্তি ঝগড়া। তবে নীলুর মনটা বড়ো ভালো ছিল। এ বাড়ীতে যাবতীয় মৃত্যুর খবর নীলু বয়ে আনতো। কোথায়, কোন আত্মীয়, স্বজন মারা গেল, রাতবিরেতে সদর দরজায় কড়া নেড়ে, ধাক্কা দিয়ে সে খবর জানানোর দায়িত্ব ছিল নীলুর। শহরের বাইরে এতোদূরে নীলু ছাড়া আর কেইবা আসবে! মাঝরাত্রে ফাঁকা অন্ধকারে নীলুর গলা, এক দঙ্গল কুকুরের হাঁকডাক শুনেই বোঝা যেত কেউ মরেছে। মৃত্যুসংবাদ দেওয়ার সেই মানুষটাও কয়েক বছর আগে মারা গেল। হঠাৎ সেদিন রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ, কুকুরের ডাক। নীলু ডাকছিল—মধুদা মধুদা। রাস্তার ধারের জানলা খুলে পরিষ্কার দেখা গেল নীলুকে। মধুসূদন বুঝলো, আবার কেউ মরেছে। কে মরলো, এটা ভাবতেই ঘুম ভেঙে গেল। তখনো মাথার মধ্যে নীলুর গলা, 'মধুদা মধুদা' ডাক। পরিষ্কার, নিখুঁত নীলু যেন মরেনি। দেওঘর বা শিমুলতলা থেকে সবে বেড়িয়ে এলো। মণীন্দ্রবাবু, নিভাননী আনু সকলেই তাজা জীবন্ত। কেউ একটুও টসকায় নি। অথচ সকলে বলে ওরা মরে গেছে। তাহলে ওরা কি কেউ মরে নি? পৃথিবীতে মরা ব্যাপারটাই কি মিথ্যে বাজে ধারণা? তাহলে তো সকলেই আছে। জীবন্ত মৃত সব মানুষই পৃথিবীতে আছে। সকলকেই দেখা যায়। কাউকে সবসময় কাউকে মাঝে মাঝে।

এই বিরাট ফাঁকা বাড়ীতে আজকাল দিনরাত একা একা এই সব ভাবনা নিয়ে সময় কাটে। মেজো মেয়ে ভারতী থাকে দিল্লীতে। ওর বর অনুপ সেখানে বড়ো অফিসার। বেশ ছেলে। ছোট মেয়ে আরতির শ্বশুরবাড়ী শ্যামবাজারে। ছোট জামাই তমাল ইঞ্জিনীয়ার, নিজের ব্যবসা। মেজো মেয়ের দুই বাচ্চা, ছোটর এক। হঠাৎ এক এক সময়ে নাতি নাতনীদের দেখার জন্যে মনটা হু হু করে। তখন দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবির মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে মনটা ঠাণ্ডা হয়। গোঁফ-ওলা ঠাকুর্দা এখনও হাসছে। নিরীহ বাবার মুখে কি এক অজানা খুশীর আলো। নিভাননীর ছবির মালাটা অনেকদিন বদলানো হয়নি। শুকিয়ে গেছে। ভারতীর মেয়ে মউ। মুখে দুষ্টু হাসি। তমাল আরতির মাঝখানে তাদের খোকা। জীবন্ত, মৃত সকলেই দেওয়ালে ঝুলছে। আনকা কেউ দেখে বলতেই পারবে না, এদের মধ্যে কে পৃথিবীতে আছে, কে নেই। চোখের আড়ালে থাকলে সব মানুষই ছবি। মধুসূদন জানে, সে নিজেও এখন ছবির মানুষ। পৃথিবীতে দিন ফুরিয়ে এলো। এই বাড়ীর ইঁট কাঠ পাথর আলো হাওয়ায় তৈরী মায়ার বাঁধনগুলো খুলে এবার ছুটি নিতে হবে। দায়দায়িত্ব এখন আর কিছু নেই। সংসারের সব কাজ শেষ। আর বেশীদিন এখানে থাকলে আলগা সুতোগুলো আবার কামড়ে

ধরবে। তাই চুপচাপ সরে যাওয়া দরকার। ছবি আর স্মৃতির মাঝখানে থেকে ভারমুক্ত হওয়া যায় না। এই বাড়ী, দেওয়ালের বড়ো ঘড়ি, দরজা জানলা, সকলেই কথা বলে। নীচের ঘড়িতে টিকটক্ শব্দ। আজই এ বাড়ী বিক্রীর সাফ কবলা হয়ে গেছে। রেজেস্ট্রি অফিসে সকালটা সই সাবুদে কেটেছে। উকিল বন্ধু শরৎ সঙ্গে ছিল। বাড়ী বিক্রীর টাকা দু মেয়ের নামে সমান ভাগ করে মধুসূদন দানপত্র করে দিয়েছে। সামনের বুধবার, মানে পাঁচদিন পরে নতুন মালিক এ বাড়ীতে এসে উঠবে। আসবাবপত্র এবং আরো হাজার জিনিষ টুক-টাক বিক্রী হয়ে গেছে। অনেকদিন ধরে চুপচাপ মধুসূদন এসব কাজ করে চলেছে। হাল্কা হওয়া দরকার। শরৎ ছাড়া আর কেউ জানে না। পাঁচকান হলে আত্মীয় বন্ধুরা আটকাবে, বাগড়া দেবে। মধুসূদন আর যুক্তি তর্কের ঝামেলায় যেতে রাজী নয়। ছেলে নেই, ভাইপো নেই, কার জন্যে এই বাড়ীঘর জিনিষ-পত্র! নিজেদের বাড়ী ছেড়ে জামাইরাও এখানে থাকবে না। স্রেফ একটা ধুতি আর শার্ট পরে ভোররাতেই মধুসূদন বেরিয়ে পড়বে।

বারান্দায় দুহাতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর জন্যে হাতের শিরায় ঝিনঝিন ভাব। মধুসূদন সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অন্ধকারে লক্ষ্মী পেঁচাটা ডেকে ওঠে। দু চারটে জিনিষপত্র যা রইলো, কাল সকালে শরৎ এসে নিয়ে যাবে।

কতো রাত হলো মধুসূদন বুঝতে পারে না। হঠাৎ ঘড়িটা কথা বলে—টিক্‌টক্! আমার কি হবে? আমাকে কোথায় রেখে যাবে? মধুসূদন চমকে ওঠে। সোজাসুজি স্পষ্ট ভাষায় যে ঘড়িটা এই প্রশ্ন করে বসবে, মধুসূদন ভাবে নি। ঘড়িটার দিকে অবাক চোখে মধুসূদন তাকিয়ে থাকে। কার কাছে যে একে রেখে যাবে ভেবে পায় না। একশো বছরের ওপর এই দেওয়ালে এটা গাঁথা। আজ ঘড়িটাও প্রায় পাথর। কেউ একে খুলতে পারে না। অথচ এটাও একটা ভালো আশ্রয় চাইছে। মধুসূদনের কপাল ঘেমে ওঠে। ঘড়িটা আবার কথা বলে। মধুসূদন ভাবে, কিছু একটা জবাব দেওয়া উচিত। অনেককাল ও এ বাড়ীতে আছে। ঠাকুর্দা, বাবা, এমন কি তার জীবনের সময়গুলো ও বুক চিরে উপহার দিয়েছে। আজ ওর কথা না ভাবা অন্যায়। মধুসূদন ভাবে শীতলের ছেলের কাছে ওকে রেখে যাবে। শীতলের ছেলেই তো আজকাল দম দেয়, তেল দেয়। ঢং ঢং করে তিনটে বাজতে মধুসূদনের মেজাজটা কেমন খিঁচড়ে যায়। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ও বিড় বিড় করে—তোমার কোনো দায়িত্ব আমি নেবো না। তুমি আমার শত্রু, তুমি রাক্ষস। ঠাকুর্দা, বাবাকে খেয়েছো। এখন আমায় খাবে। আমি তোমার কেউ নয়।

ঘড়ির পেণ্ডুলামে নিরীহ টিকটক টিকটক শব্দ। অন্ধকারে সাদা ডায়ালটা আবছা দেখা যায়। মধুসূদনের রাগ কমে আসে। উঠোনের অন্ধকারে একটা আবছা

মানুষকে মধুসূদন দেখতে পায়। গুটি গুটি পায়ে লোকটা ঘড়ির তলায় এসে দাঁড়ায়। মধুসূদন বোঝে, চোর। মধুসূদন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। চোরটা কাঠবেড়ালীর ভঙ্গীতে উঠোনের কার্নিসে উঠে পড়ে। কাঁধের কাপড়ের থলিতে হাত ঢোকায়। মধুসূদন জানে হাতুড়ি আর ছেনি বেরোবে। ঠিক তাই। টুক টুক ঠকাস ঠক। হাতুড়ি আর ছেনির কাজে দেওয়ালের বালি খসে পড়ে। মধুসূদন দম চেপে ব্যাপারটা দেখতে থাকে। বহুবার চেষ্টা করেও যে ঘড়ি দেওয়াল থেকে কেউ খুলতে পারেনি, এ চোরটা কি আজ তা পারবে! মধুসূদন দু চোখ বুজে মনে মনে বলে, ঘড়িটা যেন ও নামাতে পারে। পেণ্ডুলামের শব্দ ছাপিয়ে এখন শুধু হাতুড়ি আর ছেনির আওয়াজ। প্রায় আধঘণ্টা পরে সেই বিশাল ঘড়ি দেওয়াল থেকে খুলে চোরটা কাঁধে রাখে। তারপর চুপচাপ বেরিয়ে যায়। উঠোনের দেওয়ালে অন্ধকারে একটা আবছা গোল দাগ। কোনো সাড়া শব্দ নেই।

মধুসূদনের মাথাটা খুব হাল্কা লাগে। মাথা থেকে ঘড়ির ভার নেমে গেছে। এই ঘড়ি তার পঁয়ষট্টি বছরের জীবন খেয়ে নিয়েছে। সময়চোর এই যন্ত্রটাকে চোরের হাতে তুলে দেওয়ার পর মধুসূদনের বুকের মধ্যে কি এক খুশী উথলে ওঠে। শরীরে কোনো ক্লান্তি, জরা নেই। মধুসূদনের মনে হয়, এবার ঘুমোনো দরকার। পুরোনো পৈত্রিক বাড়ীতে শেষরাতের এই ঘুমে মধুসূদন আজ আর কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের স্বপ্ন দেখবে না!

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রিপোর্ট

তদন্তে প্রকাশ কুতবপুরে হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার মূল কারণ দুটো হৃদয়ঘটিত ঘটনা, যা পরবর্তীকালে দুটো বিবাহে রূপান্তরিত হয়। প্রথমতঃ একজন হিন্দু যুবক একজন মুসলমান তরুণীর প্রেমে পড়ে। গোপনে কিছুদিন প্রেম চলার পর প্রেমিকাকে বিয়ে করে হিন্দু যুবকটি কুতবপুর ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে পাশের গ্রাম, মোহনচকের এক মুসলমান যুবক তার বান্ধবী এক হিন্দু তরুণীকে বিয়ে করে মোহনচকেই থেকে যায়। এখানে বলে রাখা দরকার যে প্রেমিক দুজন পুরোনো বন্ধু।

এ দুই ঘটনায় দু গাঁয়ের বাসিন্দারা রীতিমতো বিস্মিত, হতচকিত, ক্রুদ্ধ হয় এবং পরস্পরের ওপর দোষারোপ করতে থাকে। অতঃপর কুতবপুর গাঁয়ে একটি ধর্মের ষাঁড়ের আবির্ভাব হয়। ষাঁড়টি এই অঞ্চলে একেবারেই আগন্তুক। তার বংশ পরম্পরা এবং জন্মপরিচয় সংক্রান্ত সঠিক হদিস জানা না গেলেও তার চালচলন এবং মেজাজ দেখে বোঝা যায় যে, সে নিখুঁত নাগরিক, কলকাতার বাসিন্দা। সম্ভবতঃ কালিঘাট ও বড়বাজার অঞ্চলে পুণ্যার্থীদের সেবা ও যত্নে সে লালিত হয়েছে। ঘন কালো মেঘের মতো বিশাল, নধর শরীর, আভূমিলুণ্ঠিত ঢেউ-খেলানো গলকম্বল, আধবোঝা দুচোখে গম্ভীর, বেপরোয়া দৃষ্টি। সামান্য ল্যাংড়া। তবু হাঁটাচলায় রাজকীয় মহিমা। ষাঁড়ের ওজন পাঁচশো কেজির কম নয়। কুতবপুরের উত্তেজনাকর আবহাওয়ার মধ্যে স্বর্গীয় দেবদূতের মতো হঠাৎ এই ষাঁড়ের উপস্থিতি নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। হাতের থেলো হুঁকোয় একটা জম্পেশ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাধব ঘোষাল বললো—পরশু রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, স্বয়ং মহাদেব ডম্বরু বাজাতে বাজাতে এই কুতবপুর গাঁয়ে হাজির হয়েছেন। বাহনকে আগেভাগে পাঠিয়ে দেবাদিদেব এখন গাঁয়ের বাইরে অপেক্ষা করছেন। যে কোন সময়ে তিনি এসে হাজির হবেন।' মাধব ঘোষাল সিদ্ধ, গৃহী লোক। গাঁয়ে তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রবল। সুতরাং কে তার কথায় অবিশ্বাস করবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবছর মাধব ঘোষাল সরকারী তরফের প্রার্থী। ভোটে জিতলে ঘোষাল যে অঞ্চলপ্রধান হবে, এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই।

গাঁয়ের আর এক মুরুব্বি নসু ঘোষ, গঞ্জে তার ধানচালের বিরাট আড়ত, মাধব

ঘোষালকে সমর্থন করে বললো -এতো হবেই। অনাচার বাড়লে ভগবান কি স্থির থাকতে পারেন ? মানুষের ত্রাণের জন্যে তাঁকে আসতেই হবে। জয়গুরু !

কথাটা ঠিক। তা না হলে এই ধর্মের ষাঁড় হঠাৎ এই অজপাড়াগাঁয়ে আসে কি করে ! গাঁয়ের এক ছোকরা, নাম তপন, দক্ষিণ কলকাতার কোন এক কলেজে পড়ে। সে বললো -একদিন রাত নটা নাগাদ এই খোঁড়া ষাঁড়টাকে সে রাসবিহারী এ্যাভিনুর মোড়ে দেখেছিল। ভয়ঙ্কর মূর্তি, এই বৃষ অবতার অদূরে দাঁড়িয়ে থা।। একটা অল্পবয়সী, পৃথুলা গাভীর দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। যুবতী গাভী আনমনা ভঙ্গীতে আকাশ দেখছিল। হয়তো ঠিক আকাশ দেখছিল না, কেওড়াতলার দিক থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে আসা আর একটা নবীন ষাঁড়ের দিকে তার চোরা নজর ছিল। ফুটপাতে রাস্তায় তখন অনেক মানুষের ভীড়, গাড়ীর জট আর পিঁপি শব্দ। বৃষঅবতার নির্বিকার, অবিচল, পাথরের মতো স্থির, কোনদিকে নজর নেই। সশব্দ নিঃশ্বাস ছাড়া আর কো। বিকার নেই তার শরীরে। শুধু তার রক্তবর্ণ জননেন্দ্রিয়টা দীর্ঘতর হয়ে কালো পিচের রাস্তা স্পর্শ করেছে। ভীড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলেছিল—কি সাইজ্। শুধু ওটা পেলেই আমার গোটা সংসার এক হপ্তা পেট পুরে মাংস খেতে পারে।' রাত বাড়তে থাকায় সেদিন তপন আর দাঁড়ায়নি। মেসে ফিরে গিয়েছিল। পরের ঘটনা তাই সে জানে না। তবে লোকমুখে শুনেছে যে, নবীন ষাঁড়টা দ্বন্দ্বযুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকে রাসবিহারী চত্বরে তাকে কেউ দেখেনি।

শহরে পড়া নাস্তিক, ডেঁপো ছোকরা তপনের কথা বয়স্করা উড়িয়ে দেয়। কম বয়েসী ছেলেরা কেউ কেউ বিশ্বাস করে।

কুতবপুরের মানুষের সেবা ও আস্কারায় ধর্মের ষাঁড় গাঁয়ের মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করতে লাগলো। গৃহস্থের দেওয়া মূলো কলার সিধেতে তার ক্ষিদে মিটলো না। ফলে গ্রামবাসীদের ক্ষেতখামার থেকে শুরু করে গোয়াল, ভাঁড়ার, যত্রতত্র সে অবাধে হানা দিতে থাকলো। স্বয়ং ভগবানের বাহনকে কিছু বলার সাহস কার আছে ? সুতরাং কেউ টুঁ শব্দ করলো না। গাঁয়ের প্রায় সবকটি বিভিন্ন বয়সী গাভীকে তার নামে উৎসর্গ করা হলো।

কুতবপুর গাঁয়ের আখ, ভুট্টা, ধান এবং সব্জি খেত খেয়ে খেয়ে কিছুদিনের মধ্যেই তার অরুচি ধরে যায়। ফলে পাশের মুসলমান গ্রাম মোহনচকের সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং মুসলমান গৃহস্থদের যত্নে পুষ্ট অধিকতর স্বাস্থ্যবতী, দুধেল গাভীদের ওপর তার নজর পড়ে। ধর্মের ষাঁড় হলে কি হবে, বোঝা যায়, জাতধর্মের ব্যাপারে সে রীতিমতো সেকুলার, ধর্মনিরপেক্ষ। একরাতে হঠাৎ মোহনচকে গেরিলা কায়দায়

হানা দিয়ে সে প্রায় একবিঘে জমির ফসল সাবড়ে দেয় এবং ফেরার সময় আধ-ডজন যুবতী গাভীকে হরণ করে।

পরদিন সকালে মোহনচকে হৈ হৈ কাণ্ড। ফসল চুরি, গোধন লুঠ। বেলা গড়াবার আগেই নদীর ধারে বমাল সমেত চোরের দেখা পাওয়া গেল। ছটা গাভী পরিবেষ্টিত ধর্মের ষাঁড় চোখ বুজে জাবর কাটছে। অনেক কষ্টে নিজেদের গরু উদ্ধার করে মালিকেরা বাড়ী ফিরলো। ফেরার আগে ষাঁড়কে লক্ষ্য করে দু'দশটা গাল পাড়তেও তারা কসুর করলো না। বেলা দশটা নাগাদ বৃষরাজ গজেন্দ্রগতিতে কুতবপুর গ্রামে ফিরে এলো। মাধব ঘোষাল এবং নসু ঘোষের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষ সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করলো তাকে। ষাঁড়ের দৈনন্দিন খাদ্যের বরাদ্দ দ্বিগুণ করা হলো। সৈন্ধব নুন ও ভেলিগুড়ের সঙ্গে এবার থেকে রোজ এক কেজি জিলিপি দেওয়ার দায়িত্ব নসু ঘোষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলো।

এতো সত্ত্বেও অগম্যাগমন ও অখাদ্যে ষাঁড়ের আসক্তি বিন্দুমাত্র কমে না। রোজ রাতেই সে মোহনচকে হানা দেয় এবং গরীব কৃষক ও গোরমণীদের সর্বনাশ করে। মানিকচকের মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষোভে রাগে আগুন হয়। একটা কিছু বিহিত করার জন্যে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। মজিদ হাসানের ঘরে সদ্যবিবাহিত হিন্দু যুবতী বৌ। বৌ কুতবপুরের সেই ঘরপালানো মেয়ে। অতএব সম্পর্ক না থাকলেও কুতবপুর মজিদের শ্বশুরবাড়ী।

সে বললো—আপোষে মিটিয়ে ফেলাই ভালো।

ষাঁড়কে না বাঁধলে আপোষ হয় কি করে—প্রশ্ন করলো পীর মহম্মদ।

ন্যায্যকথা, সকলেই সায় দেয়।

মজিদ ঠিক করে, কাল সকালেই কলকাতায় গিয়ে শুকদেবের সঙ্গে দেখা করে তার বুদ্ধি নেবে। শুকদেব কুতবপুরের সেই পলাতক প্রেমিক, মোহনচক গাঁয়ের জামাই।

কুতবপুর জুড়ে ষাঁড়ের মাহাত্ম্য এবং খ্যাতি ক্রমশঃ প্রকট হতে থাকে। একটা ছোটখাটো কালো পাহাড়ের মতো ঢিমেতালে সে ঘুরে বেড়ায়। ছেলে, বুড়ো, নারীপুরুষ কাউকে গ্রাহ্য করে না। ষাঁড়ের নামে নানা অলৌকিক গপ্প মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে, মেয়েমহলে নীচু গলায় হাসাহাসি কানাকানির ধূম পড়ে যায়। হবেই তো। সাতগাঁয়ের সব গাভী যে ইতিমধ্যেই গর্ভিনী হয়ে গেছে।

এর মধ্যে মাধব ঘোষাল এবং তার দলের লোকেদের নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে ওঠে। মাধব ঘোষাল সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে জানানো দরকার। সত্যিকারের চৌখস লোক বলতে যা বোঝায়, মাধব ঘোষাল সেই জাতের মানুষ। পারি-

ব্যরিকভাবে যজমানি পেশা হলেও লোকটি সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম এবং সময়ের চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। তাই যজমানির পাশাপাশি ভূসম্পত্তি, কীটনাশক ওষুধ ও সারের দোকান এবং আরো নানাবিধ প্রকল্পে ঘোষাল কর্তার বিনিয়োগ আছে। কুতবপুর সীমান্ত এলাকা হওয়ায় আরো কিছু গোপন ব্যবসার সঙ্গে মাধবের যোগসাজস আছে। সীমান্ত এলাকার ভদ্রবাবুদের এটা জন্মগত অধিকার। সাকুল্যে এগারোটি সন্তানের মধ্যে আট মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। তিন ছেলের মধ্যে বড়োজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী। মেজোটি বাপের ব্যবসায় আছে এবং তাকে সমৃদ্ধতর করছে। কনিষ্ঠজন, ডঃ অমলেশ ঘোষাল বিদেশ ফেরৎ, উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত লোক। কলকাতার কোন এক বিশ্ববিদ্যা-লয়ে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক। র‍্যাডিকাল বলে অমলেশের খ্যাতি আছে।

ভোটের কিছুদিন আগে একজন শিল্পী ও আর একজন সাদা চামড়ার সাহেবকে নিয়ে মোটর গাড়ি চালিয়ে অমলেশ একদিন কুতবপুর গাঁয়ে হাজির হয়। ষাঁড়টিকে দেখার জন্যেই এতোটা পথ আসা। ষাঁড়ের বিশাল চেহারা ও বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে সাহেবের দুচোখ বিস্ফারিত হয়। মুগ্ধ গলায় সাহেব বলে—এ্যামেজিং।

সঙ্গী শিল্পীকে ষাঁড়ের সামনে দাঁড় করিয়ে অমলেশ বললো—কাজ শুরু করুন।

কাঁধের ঝোলা থেকে রং তুলি বার করে শিল্পী ভয়ে ভয়ে ষাঁড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। লাল রঙে তুলি ডুবিয়ে শিল্পী ষাঁড়ের গায়ে 'মাধব ঘোষালকে ভোট দিন' লেখা শুরু করলো। রসসিক্ত জিলিপির ধামা ষাঁড়ের মুখের সামনে ধরে নসু ঘোষ জিভের ডগায় নানারকম আদরসূচক শব্দ করে। ষাঁড়ের পেছনে মাধব ঘোষালকে দাঁড় করিয়ে দামী বিদেশী ক্যামেরায় সাহেব ঘনঘন ছবি তোলে। এতো ভীড় এবং আদিখ্যেতায় ধর্মের ষাঁড় বিরক্ত হয়। দু'চারটে জিলিপি মুখে পুরে হঠাৎ সে হাঁটা শুরু করে। লাল কালিতে গোটা গোটা হরফে তার বিশাল কালো বপুর ওপর তখন সবেমাত্র 'মাধব ঘোষাল' নামটা লেখা হয়েছে, ব্যস্ ওখানেই শেষ। ষাঁড়ের শিংনাড়া ও নিঃশ্বাসের শব্দে শিল্পী তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। হাজার অনুরোধেও সে আর তুলি ধরতে রাজী হলো না। মাধব ঘোষালের নাম দেহে ধারণ করে ধর্মের ষাঁড় দুলকি চালে মোহনচকের দিকে চলে যায়।

সেই রাতে ধর্মের ষাঁড় মোহনচকের দুটো পান বরোজ তছনছ করে। গাঁয়ের মানুষের জমে থাকা ক্ষোভ, রাগ সহ্যের সীমা ছাড়ায়। ষাঁড়কে সায়েস্তা করার জন্যে লাঠি, সড়কি হাতে তারা রেরে করে বেরিয়ে পড়ে। গাঁয়ের প্রান্তে সবের খাঁ তাদের পথ আটকায়। সবের খাঁর পাশে মজিদ। সবের খাঁ মোহনচকের

সম্পন্ন গেরস্থ, ধর্মভীরু, বৈষয়িক লোক। গাঁয়ের মানুষ খাঁ সাহেবকে খাতির করে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবের খাঁও একজন প্রার্থী, বামপন্থী প্রার্থী। বলে রাখা ভালো যে খাঁ সাহেবর প্রতিদ্বন্দ্বী মাধব ঘোষালও বামপন্থী মোর্চার লোক। এই অঞ্চলে বামপন্থীদের দুটো ভাগ, হিন্দু বামপন্থী আর মুসলমান বামপন্থী। হিন্দু বামপন্থীদের নেতা মাধব ঘোষাল আর মুসলমান বামপন্থীদের সবের খাঁ। দুজনের বাড়ীতেই মার্কস লেনিনের বই-এর বঙ্গানুবাদ আছে।

নির্বাচনী প্রচারের কলাকৌশলে সবের খাঁ পাকা। সে জানে অবাধ, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হলে মুসলমান প্রধান এই এলাকায় তাকে হারাবার সাধ্য মাধব ঘোষালের নেই। তাই অশান্তি, দাঙ্গা ঝামেলার সে ঘোরতর বিরোধী। গণ্ডগোল হলেই মুসলমান ভোটাররা বাড়ী থেকে বেরোয় না। গাঁয়ের বাইরে যেতে ভয় পায়। জনা তিনেক সঙ্গী নিয়ে আলোচনার জন্য সবের খাঁ কুতবপুরে আসে। ষাঁড়ের উপদ্রব বন্ধ করার জন্য মাধব ঘোষাল আর নসু ঘোষের সঙ্গে কথা বলে। সবের খাঁ বলে-- এতোকাল পাশাপাশি বাস করেও আমাদের অঞ্চলে কখনো হিন্দু মুসলমানে কাজিয়া হয়নি। আজই বা হবে কেন ?

কি করতে হবে আমাদের—মাধব ঘোষাল জানতে চাইলো।

জানোয়ারটাকে বেঁধে রাখুন—পীর মহম্মদ বললো।

জানোয়ার নয়, ভগবানের বাহন—মাধব ঘোষাল বললো।

পীর মহম্মদের ধৃষ্টতায় নসু হতবুদ্ধি এবং হতবাক হয়। কথা বলতে পারে না। ভগবানকে বাঁধার কথা আমরা কল্পনাই করতে পারিনা—এতোক্ষণে নসু ঘোষ কথা বলে।

পীর মহম্মদের মাথায় তাপ বাড়ে। কি একটা খারাপ কথা মুখে এলেও সবের খাঁর গোপন চিমটি খেয়ে সে চুপ করে যায়। আরো কিছু সময় আলোচনার পর ঠিক হয়ে যে ষাঁড়ের সঙ্গে রাত পাহারায় একজন রাখাল থাকবে। রাখালের সব খরচ সবের খাঁ নিতে রাজী হয়, আর মনে মনে ভাবে, ভোটটা চুকলেই মজা দেখাবে।

সেই বিকেল থেকেই নিতাই নামে এক বছর পনেরোর ছোকরা ষাঁড় পাহারার কাজে লেগে যায়। কিন্তু নিতাই চাষীর ছেলে হলে হবে কি, এ ষাঁড় সামলানো তার কর্ম নয়। তিনদিন পরেই সে কাজে ইস্তফা দেয়। কুতবপুর এবং মোহনচকে ষাঁড়ের তাণ্ডব সমানে চলতে থাকে। দলবল নিয়ে সবের খাঁ আবার একদিন কুতবপুরে আলোচনার জন্যে হাজির হয়। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেও সমাধানের পথ মেলে না।

সেদিন দুপুর থেকে হঠাৎ অসময়ের বৃষ্টি নামলো। ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেল কুতবপুর, মোহনচক আর চারপাশের আকাশ। দিন শেষ হওয়ার আগেই অন্ধকার আর গভীর নীরবতায় পৃথিবী ডুবে গেল। নিস্তব্ধ চরাচর জুড়ে ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির সাঁইসাঁই শব্দ। ফাঁকা পরিত্যক্ত গাঁ, গঞ্জ। রাস্তাঘাটে জনপ্রাণী নেই। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের তীব্র আলোয় ঝলসে ওঠে বনস্থলী। অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে বাজ পড়ার শব্দ হয়।

পরদিন সকালে দেখা গেল, গাঁয়ের শিবমন্দিরের উত্তরে ধর্মের ষাঁড় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। গলায় আড়াই প্যাঁচ জবাইয়ের দাগ। বৃষ্টির জলেও মাটি থেকে জমাট রক্তের চিহ্ন মুছে যায়নি। কুতবপুর গাঁয়ে ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে যায়। মেঘলা আকাশের নীচে কি এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা থমথম করে। নিষ্প্রাণ অতিকায় কালো দেহটা ঘিরে ভীড় বাড়তে থাকে। সেই ভীড়ের মধ্যে থেকেই কে যেন আবিষ্কার করে, ষাঁড়ের কপালে এক গভীর রক্তাক্ত ক্ষত। একটু নজর করলেই ধরা পড়ে বুলেটের আঘাত। খুব কাছ থেকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রিভলভার চালালে এমন ক্ষত হয়। সমবেত জনতার মধ্যে আবার চাঞ্চল্য জাগে। গলায় আড়াই প্যাঁচ দেওয়ার পর গুলি করার মানে কি ?

তপন বলতে গিয়েছিল, গুলি করার পর হয়তো আড়াই প্যাঁচ দেওয়া হয়েছে। নসু ঘোষ এক বেদম ধমকে তাকে থামিয়ে দেয়।

কে যেন বললো—থানায় খবর দেওয়া উচিত।

অসম্ভব শান্ত, গম্ভীর গলায় মাধব ঘোষাল বললো—দরকার নেই।

ব্রহ্মতেজে মাধব ঘোষালের মুখ আগুনের শিখার মতো রক্তাভ, উজ্জ্বল দেখায়। কেউ আর কথা বলতে সাহস পায় না। ধরাশায়ী জন্তুটার পিঠের ওপর লাল কালিতে লেখা 'মাধব ঘোষাল' নামটা জ্বলজ্বল করতে থাকে।

ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে গো হত্যার কাহিনী মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে। মেঘলা আকাশে শকুনির দল শ্লথ গতিতে পাক খায় আর নেমে আসতে থাকে। মাটির অদৃশ্য, গোপন আশ্রয় থেকে পিল পিল করে পিঁপড়ের দল মৃত ষাঁড়ের গন্ধে বেরিয়ে আসে। সেদিন আর বৃষ্টি হয় না। অথচ ফ্যাকাসে, ধুসর আবহাওয়ায় কি এক অশুভ ছায়া মিশে কুতবপুরের ওপর ছড়িয়ে থাকে। গাঁয়ের শেষ-প্রান্তের ভাগাড়ে ভগবানের বাহনকে ফেলে দিয়ে আসা হয়। দিন ফুরোবার আগেই শকুন, কাক, কুকুরের খোঁচায় অতোবড়ো দশাসই জন্তুটা একটা হাড়ের কাঠামোয় পরিণত হয়! এমন এক দুর্ঘটনার খবরে পাশের গ্রাম মোহনচকের লোকেরাও কি এক দুর্ভাবনা আর অস্বস্তিতে গুম হয়ে থাকে। অন্ধকার ঘন হলে এঁটোকাটার লোভে একদল শিয়াল এসে ভাগাড়ের দখল নেয়।

কুতুবপুরের মানুষজন রাগে শোকে দিশাহারা। চাপা ক্রুদ্ধ গলায় ঘরে ঘরে গুজগুজ ফুসফুস আলোচনা চলে। নানা অলৌকিক গল্প আর কল্পকথায় কিছুদিনের মধ্যেই মৃত ষাঁড় অবতারপ্রতিম হয়ে ওঠে। কয়েকদিন পরে এক উজ্জ্বল সকালে মোহনচকের মসজিদের দরজায় একটা শুয়োরের মৃতদেহ পাওয়া গেল। এককোপে ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধারালো অস্ত্র ও নিপুণ হাতের পরিচ্ছন্ন কাজ। কালো, কুৎসিত চেহারার শুয়োরটার গায়ে তখনো শুকনো পাঁক, কাদা লেগে আছে। নোংরা শরীরে এলোমেলো লোমের গুচ্ছ। শুকনো জমিতে থকথকে রক্ত তখনো শুকোয়নি। দৃশ্যটা দেখে পীর মহম্মদ বিড়বিড় করে, ইনসাল্লাহ।

তারপর সবের খাঁর বাড়ীর দিকে দৌড় লাগায়। মজিদ খবর পায়। তার ঘরে হিন্দু বিবি। ঝামেলার আশঙ্কায় বাক্স, পেঁটরা আর বিবি নিয়ে সেই দুপুরেই সে কলকাতা রওনা হয়। মজিদের বাড়ী থেকে সোজা রাস্তা কুতবপুর হয়ে ষ্টেশনে গিয়ে পোঁচেছে। মাইল তিনেক পথ। কুতবপুর ছুঁয়ে বিবি কিছুতেই স্টেশনে যেতে রাজী না হওয়ায় মজিদকে দ্বিতীয় পথটা ধরতে হলো। এটা একটু ঘুরপথ এবং নির্জন। স্টেশনে পৌঁছতে সময় সামান্য বেশী লাগে। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে মজিদ বিবিকে বললো—বোরখাটা পরে নাও।

বৌ গররাজি। চাপা গলায় জবাব দিল—মাগো, বোরখা পরলে গায়ে যা বোঁটকা গন্ধ হয়!'

হিন্দু বিবিকে মজিদ আর বেশী চাপাচাপি করলো না। শেষ দুপুরের ফাঁকা রাস্তা জুড়ে ঠাঠা রোদ। পথের মাঝে মাঝে কিছু বুনো ঝোপ আর দু'একটা পেল্লাই গাছ ছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন বিবির লম্বা হাঁটার অভ্যেস নেই। হাঁপিয়ে, জিরিয়ে এতোটা পথ পাড়ি দিতে তার বেশ সময় লাগে। বেলা পড়ে আসে। স্টেশনের কাছাকাছি একটা ছোট জঙ্গল টপকে মূল রাস্তায় উঠতে হয়। বড়ো বড়ো পিপুল আর ঘূর্ণিগাছের ছায়ায় উঁচু জমির চারপাশ আবছা হয়ে আছে। জঙ্গলের মাঝ বরাবর আসতেই ডানপাশের তেলাকুচো আর শ্যাওড়ার ঝোপ থেকে কয়েকজন লোক মজিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের মুখে তেল আর ভুষোকালির নক্সা। হাতে ধারালো হেঁসো, সড়কি আর লোহার ডাণ্ডা। তাগড়াই চেহারার একজন লোক মজিদের বিবির মুখটা শক্ত থাবায় চেপে ধরলো। আতঙ্কে বিবির গলা কাঠ। গলা দিয়ে শব্দ না বেরোলেও দুচোখের মণি যেন ছিটকে পড়ছে। একজনের হাতের ঝকঝকে হেঁসোটাকে বিদ্যুৎগতিতে সে ঘুরে যেতে দেখলো, এবং তখনই তার নজরে এলো মজিদের ধড় আর মুণ্ড আলাদা হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। ঘন রক্তে লাল

হয়ে উঠেছে জঙ্গলের হাল্কা সবুজ ছায়া। হুঁশ হারাবার আগে মজিদের বিবি বিড়বিড় করে, হায় ভগবান!'

মুখ বন্ধ থাকায় তার কথা কেউ শুনতে পেল না। দাঙ্গাবাজ লোকগুলো যাওয়ার আগে মজিদের টাকা পয়সা, টিনের বাক্স এবং তার বিবির একজোড়া কানপাশা ও দুহাতের দুটো রুলি লুঠে নিল। বিধর্মী নারীসঙ্গে জাত যাবার ভয়ে মজিদের সুন্দরী ফুটফুটে বিবির শরীরটা তারা ভোগ করার সাহস পেল না। দলের যণ্ডামার্কা এক সদস্য এই ক্ষোভে জঙ্গল ছাড়ার আগে মজিদের বিবির বেহুঁশ শরীর থেকে নতুন জামদানি শাড়িটা খুলে নিল। ম্লেচ্ছের শাড়ি বাড়ীতে ব্যবহারের অযোগ্য হলেও বাজারে ভালো দর পাওয়া যাবে।

মজিদের আর কলকাতা যাওয়া হলো না। তার দুখও মৃতদেহ এবং তার আধমরা, অর্ধনগ্ন বিবিকে মোহনচকের লোকেরা সেই সন্ধ্যাতেই উদ্ধার করে আনলো।

মজিদ মরে গেলেও তার আশঙ্কা বাস্তবে হুবহু মিলে গেল। দু'তিনদিনের মধ্যেই কুতবপুর এবং মোহনচকের কয়েকজন মানুষ ইতস্ততঃ চোরাগোপ্তা খুন হলো। হপ্তা না পুরোতেই গোটা ব্যাপারটা রক্তক্ষয়ী, ভয়ঙ্কর দাঙ্গার রূপ নিল। গাঁয়ে দাঙ্গা মারামারির খবর পেয়ে দূর কলকাতায় বসেও শুকদেব ব্যাকুল হয়। বিশেষ করে মজিদের খুন হওয়ার কাহিনী শুনে দুঃখে তার বুক ফাটতে থাকে। কি এক পাপবোধ তার মনের মধ্যে কাজ করে। এসব কি তারই কৃতকর্মের ফল! এক দুপুরে কুতবপুর যাওয়ার জন্যে সে তৈরী হলো। বৌকে বললো কাল দুপুরের আগেই ফিরবো।

শিয়ালদা থেকে কুতুবপুর ট্রেনে ঘণ্টা চারেকের পথ। ট্রেন লেট করলো। কুতুবপুরে ট্রেন যখন পৌঁছোলো, তখন দিন প্রায় শেষ। আলো আর অন্ধকারে চারপাশ কেমন ঘোলাটে হয়ে আছে। অনেক দূরে দিগন্তের গায়ে ঝাপসা রেখার মতো কুতুবপুরকে দেখা যায়। স্টেশন চত্তরের গাছ-গাছালিতে অসংখ্য পাখির কলরব।

ট্রেন থেকে কুতুবপুর স্টেশনে দু'চারজন যারা নামলো, তাদের কেউ কুতুবপুরের লোক নয়। মাটির প্লাটফর্মে এক পলক দাঁড়িয়ে শুকদেব ভাবলো, সোজাপথে গাঁয়ে না ঢোকাই ভালো। সময় একটু বেশী লাগলেও নির্জন মেঠো রাস্তা ধরে গেলে চেনাজানা কারো চোখে পড়ার ভয় নেই। কোনমতে একবার বাড়ীতে পৌঁছোতে পারলে তাকে পায় কে! শুকদেব জানে, তার মা বাবা ছেলে অন্ত প্রান। এই রাতে শুকদেবকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে না নিশ্চয়। শুধু গাঁয়ের কিছু পাষণ্ড মাতব্বরের চোখ এড়িয়ে বাড়ীতে ঢুকতে হবে। দরকার হলে

বৃদ্ধ বাবা মাকে সে কলকাতায় নিয়ে যাবে। হয়তো ধর্মভীরু বাবা-মা যেতে চাইবে না। তবু শুকদেব বলবে। স্টেশন ছেড়ে নীচু জলাজমি ধরে একচিলতে জঙ্গলের মধ্যে শুকদেব উঠে এলো। বেশ অন্ধকার নেমেছে পৃথিবীতে। ট্রেনটা দেরী না করলে সে দিনমানেই বাড়ী পৌঁছে যেত। তবে বেলাবেলি লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশী। এই অন্ধকারে তার ভয় নেই। তাছাড়া এই দেশ গাঁ, এখানকার মাটি জলহাওয়ার গন্ধ শুকদেবের চেনা। চোখ বেঁধে দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়ে তাকে যদি এখানে নিয়ে আসা হয়, তবু এই কুতুবপুরকে চিনতে তার ভুল হবে না। এর নাম জন্মভূমি, নাড়ীর টান আর মায়া স্ত্রী সম্ভোগের চেয়ে অনেক বেশী।

তেলাকুচো ঝোপের কাছে এসে শুকদেব একটু থমকে গেল। অন্ধকার চাপ বেঁধে আছে। ডাইনে, বাঁয়ে নজর ফেলে শুকদেব আবার হাঁটতে শুরু করতেই অন্ধকার ফুঁড়ে কয়েকজন বলবান লোক তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ধারালো অস্ত্রে শুকদেব নিমেষে ধরাশায়ী হলো। মৃত শুকদেবের পকেট হাতড়ে লোক-গুলো টাকা পয়সা বার করে নিল।

পরদিন সকালে শিয়াল কুকুরে খাওয়া শুকদেবের মৃতদেহ কুতবপুরের মানুষেরা সনাক্ত করলো। কলকাতায় শুকদেবের বৌয়ের কাছে এই অপঘাত মৃত্যুর খবর পৌঁছোলো দু'দিন পরে। শুকদেবের বিধবা বৌ 'ইয়া আল্লা' বলে দেওয়ালে কপাল ঠুকে রক্ত ঝরাতে লাগলো।

ইতিমধ্যে গাঁয়ে পুলিশ নামলেও দাঙ্গা থামেনি। এবার সশস্ত্র মিলিটারী নামলো। তাদের পেছনে পেছনে এলো নাগরিক শান্তি কমিটি। শান্তি কমি-টির লোকেরা পোষ্টার দিল, 'এতো হানাহানি এবং রক্তপাতের মধ্যেও ঈশ্বরের বুকে আল্লা ছুরি বসাইল না।' কুতবপুর আর মোহনচকের যাবতীয় বাড়ীর দেয়াল এবং গাছের গুঁড়ি এই পোষ্টারে ছয়লাপ হ'য়ে গেল। দু'গাঁয়ের লোকই পোষ্টারগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো—এর মানে কি ?

অবশেষে দাঙ্গা থামলো। শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার পুরো কৃতিত্ব নাগরিক কমিটি দাবী করলো। মিলিটারি গোঁফ মুচড়ে হাসলো।

যথারীতি দু'হপ্তা পরে শেষ হলো পঞ্চায়েত নির্বাচন। সবের খাঁর ভোটাররা অধিকাংশই ভয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে গেছল। যারা ছিল, তারাও হিন্দু এলাকার ভোটকেন্দ্রে যেতে ভরসা পেল না। মুসলমান বামপন্থী সবের খাঁ হিন্দু বামপন্থী মাধব ঘোষালের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হলো।

বাবার জয়ের এই খবর পাওয়ার আগেই ডঃ অমলেশ ঘোষাল বিদেশে রওনা হয়ে গেছে। প্যাট্রিস লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজতত্ত্বে গবেষণার জন্যে গত বছর তাকে পি, এইচ, ডি ডিগ্রী দেওয়া হয়েছিল। দু'একদিনের মধ্যেই সমাবর্তন অনুষ্ঠান। তার গবেষণার বিষয়ে ভাষণ দেওয়ার জন্যে অমলেশ সেখান থেকে নিমন্ত্রণের চিঠি পেয়েছে। অমলেশের গবেষণার বিষয় ছিল—ভারতীয় সমাজে ষাঁড় ও শূয়োরের প্রভাব।

কমলি, তুই ঘরে যা

এই হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল শহরে তুই কেন এলি কমলি ? এমন কোন্ বাপের বেটা আছে যে, এই তীক্ষ্ণ নখদন্তওলা হাজার হাজার মানুষ নামক ভয়ঙ্কর পশুদের ক্ষুধা থেকে তোর বাইশ বছরের পুষ্ট, সুন্দর যৌবনকে বাঁচাবে ? হায়রে, অপুষ্ট আধপেটা পুরুষও এই শহরে মেয়েমানুষের শরীর কামড়ে ছিঁড়ে নেওয়ার জন্যে লকলকে জিভ আব ধারালো দাঁত বার করে থাবা গেড়ে ওৎ পেতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে বসে আছে। কমলি তুই ঘরে যা। দেশ-ঘরে শাক, পাতা, ঘাস খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মর, কিংবা আধমরা হয়ে বেঁচে থাক। সুখের চেয়ে শান্তি ভালো—একথা কি তুই জানিস না ?

সেই তুলকালাম বৃষ্টি আর দুর্যোগের সন্ধ্যায় শিয়ালদা স্টেশন থেকে এক লোভী রেল-পুলিসের মুঠো থেকে নিছক তাৎক্ষনিক আবেগে তোকে উদ্ধার করার পর থেকে আমি যে কিভাবে নাজেহাল হচ্ছি, তার সব খবরই তো তুই জানিস। এখন ভাবি, কেন যে তোকে ডাকতে গেলুম। তোকে বাঁচাবার কোনো দায়িত্ব আমার ছিল না। তবু তোর নিরীহ, নিষ্পাপ মুখ আর লাবণ্য দেখে আমি মজে গিয়েছিলুম। দুর্ভিক্ষপীড়িত, গেঁয়ো গরীবের এতো রূপ, ভালো নয়। শক্তিমান পুরুষের পাহারা না থাকলে মেয়েদের রূপ, যৌবন তছনছ হয়ে যায়। তবু সেই নির্জন, নিশুত বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে স্টেশনের বাইরে ঝাঁকড়া বটগাছটার তলায় তোর অসহায়, আর্ত, ধসে পড়া মূর্তি দেখে আর উর্দি পরা পশুটার হুমকি শুনে আমার মধ্যবিত্ত পৌরুষ হঠাৎ মহানুভব হয়ে উঠলো। কেন হলো, কি ঠেকা পড়েছিল আমার ? অজপাড়াগাঁয়ের কুলবধূ হয়ে তুই কি বুঝবি আমার মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের পীড়া, গ্লানি, সততা, নষ্টামির বিচিত্র টানাপোড়েনের রক্তাক্ত জটিল নক্সার ইতিবৃত্ত ? প্রতিদিন স্বার্থপর, নীচ, অমানুষ হয়ে যেতে যেতেও আমার মধ্যে কি এক বেপরোয়া প্রতিরোধ, বিশুদ্ধ পবিত্র হয়ে ওঠার তাগিদ গাঝাড়া দিয়ে ওঠে। কিন্তু আমি পারিনা। প্রতিদিন হেরে যেতে যেতে মরে যেতে যেতে হঠাৎ কখনো মাথা গরম করে অগ্রপশ্চাৎ পরিণতি না ভেবে বুখে দাঁড়াই। এবং এই ধরনের এক ক্ষ্যাপামির তাগিদেই আমি সেই উর্দিপরা মানুষটার মুখ থেকে তোকে ছিনিয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিলুম। আশ্রয় শব্দটার ব্যবহারে বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। আমি আশ্রয় দেওয়ার কে ?

ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের বংশধর এই আমারই বা আশ্রয় কোথায় ? মাথার ওপর একটা ছাত আর চারপাশে দেওয়াল থাকলেই কি আশ্রয় গড়ে ওঠে ? তাও তো আমার ঘরের ফাটা ছাত দিয়ে প্রতি বর্ষায় জল পড়ে।

তবুও তুই যখন কেঁদে বললি, বাবু আমাদের কি একটা থাকার জায়গা হয় না ? তখন সেই মধ্যবিত্ত অহমিকায় আমি তোকে আশ্রয় কবুল করে বসলুম। তোর স্বামী, ওই রোগা, শুকনো, দড়িপাকানো লোকটা, পরে জেনেছিলুম, নাম ইষ্টপদ, কাঁকে একটা রুগ্ন বছর দুয়েকের শিশুকে নিয়ে একটু দূরে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় আর আতঙ্কে ঠকঠক করে কাঁপছিল, সেও তখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ইষ্টপদকে দেখে রাগে, ক্ষোভে আমার ভেতরটা টগবগ করছিল। বেহুদ্দ, দুর্বল, হতশ্রী একটা মানুষ হয়ে তুই বেটা কি করে এমন এক রূপবতী মেয়ের স্বামী হওয়ার দুঃসাহস দেখাস ? ইষ্টপদ তখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে নিজের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী শোনাচ্ছিল। গাঁয়ে নাকি দারুণ অভাব আর উপোস চলছে। দিন সাতেক আগে অখাদ্য-কুখাদ্য গিলে পাঁচবছরের ছেলেটা ওলাউঠোয় মরেছে। ক্ষিদের জ্বালায় বাপ পিতামোর ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে আগেরদিন সন্ধ্যেতে ওরা শেয়ালদায় এসে উঠেছে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা না পুরোতেই কমলির চারপাশে হাঙ্গর কুমিরের ভিড় শুরু হয়ে গেছে। রেল পুলিসের লোকটা আজ রাতে কমলিকে না খেয়ে ছাড়বে না।

কমলি সেদিন তোর দারিদ্র্য, পুত্রবিয়োগ, ইজ্জত নষ্টের সম্ভাবনায় আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি। দেশ গাঁ খরা, বন্যা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, গরীব মানুষ ক্ষেতে খামারে, কলকারখানায় না খেয়ে শুকিয়ে প্রতিদিন লাইন দিয়ে ইহজগৎ ছেড়ে চলে যাবে বা তাদের ছেলেমেয়েরা কলেরা, মায়ের দয়া এবং আরো নানা অধিব্যাধিতে বিনাচিকিৎসায় সাবাড় হবে, এটাই তো স্বাভাবিক। এসব ঘটনায় নতুনত্ব, চমক বা সহানুভূতি মিশ্রিত আদিখ্যেতা দেখাবার দিন আর নেই। তবু যে সপরিবারে তোকে আমার সঙ্গে আস্তে বলেছিলুম, তার কারণ রক্তের মধ্যে মারখাওয়া পৌরুষের পাগলাটে জেহাদ আর অসহনীয় চাপ। উত্তেজনার ঝোঁকেই তো মানুষ মহৎ কাজ করে, শহীদ হয়। মানুষ যতো অপমানিত লাঞ্ছিত হয় ততো দীর্ঘস্থায়ী, ঘন, বিস্ময়কর উত্তেজনা তাকে ভর করে।

সচ্চরিত্র, বিবেচক, ভালো মানুষ হিসেবে পাড়ায় আমার খ্যাতি থাকার জন্যেই সম্ভবত প্রতিবেশী সনৎবাবু তার বাড়ির সামনে ঢাকা রকের ওপর তোকে থাকতে দিতে রাজি হয়েছিল। আমার বিধবা মা তোর কাহিনী শুনে দুঃখ পেয়েছিল।

আর আমার বিবাহিত অবিবাহিত ভায়েরা ভেবেছিল এটা তাদের পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই আইবুড়ো, নীতিবাগীশ দাদার এক নতুন খেয়াল। রাতে বিছানায় শুয়ে যখন মনের উত্তেজনা থিতিয়ে এলো, তখন ভাবলুম, এসব উটকো ঝামেলায় এই বয়েসে জড়িয়ে পড়া একধরণের হঠকারিতা। রেল পুলিসের সেই পালোয়ানটা নেহাৎ আমায় দেখে কি ভেবে যেন সরে পড়েছিল। কিন্তু সে যদি আমাকে ঘাড় ধরে ফাটকে পুরে দিত, তাহলে কি করতুম আমি? ঠাণ্ডা মাথায় গোটা পরিস্থিতিটা ভেবে অন্ধকার ঘরে বর্ষার আর্দ্র আবহাওয়াতেও আমি ঘেমে উঠি।

তবুও যাওয়া আসার পথে সনৎবাবু রকে তোর মাটির হাঁড়ি আর ফুটোফাটা কড়া, বাটির সংসার দেখে আমার তৃপ্তি হয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিলুম যে, ভেসে যাওয়া একটা সংসারকে আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি। আমিও একজন পরিত্রাতা, স্রষ্টা। সৃষ্টি করার একটা বাসনা সব মানুষের মধ্যেই থাকে। তার ভূমিকা বড়ো মোহময়, প্রবঞ্চক। চুনোপটি, হেজিপেজি লোককেও সে গড়ার নেশায়, স্বপ্নে মশগুল করে রাখে। তোদের দেখে আমারও মনে হয়েছিল যে, একটা ছিন্নমূল সংসারকে বেশ সরেস মাটিতে পুঁতে দিয়ে আমি চারপাশে শেকড় চালানোর সুযোগ করে দিয়েছি। তোর সিঁথিতে, কপালে ইঁট গুঁড়োর সিঁদুর আর কপাল ঢাকা খারে কাচা কাপড়ের ঘোমটা দেখে পথচলতি মানুষ, মানুষ না শকুন, শেয়াল, জুলজুল করে তাকালে আমার বুকের মধ্যে কি এক অনিশ্চয়তা গুড়-গুড় করতো। কিন্তু একটা বিশ্বাস, ভরসা আমার ছিল যে, এ পাড়ায়, আমার চোখের সামনে কোনো অঘটন হবে না। তোর স্বামী ইষ্টপদকে অবশ্য আমি মোটেই নির্ভরযোগ্য ভাবতুম না। সবসময় কেমন যেন একটা ভেঙ্গে পড়া, চোর চোর ভাব। অভাব বোধহয় মানুষকে মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ করে দেয়। বিশেষ করে পুরুষ মানুষকে। মেয়েদের মধ্যে দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়ার একটা সহজাত প্রতিরোধ থাকে।

সনৎবাবুর রকে দিন সাতেক না যেতেই একদিন মধ্যরাতে সেই ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটলো। পাড়ার এক দাগী ছেলে, জংলি, তার দলবল নিয়ে চড়াও হলো তোর ওপর। ওদের মত্ত শরীরে নারী মাংসের দাউ দাউ ক্ষুধা। অন্ধকারে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে তুই যেন কেমন করে শ্রীনাথ গোয়ালার অন্ধকার খাটালে গরুর জাবনার জন্যে রাখা খড়ের গাদায় ঢুকে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলি। জংলি এবং তার দলবল তোর হদিশ না পেয়ে রাগে ইষ্টপদকে বেধড়ক পিটিয়ে, গায়ে কালসিটে ফেলে দিয়ে, তোদের বাসনপত্র ভেঙ্গে, ছড়িয়ে ফের ফিরে আসার হুমকি দিয়ে সে রাতের মতো চলে গিয়েছিল। ইষ্টপদ ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাবছিল, বৌয়ের হদিশ জানলে আমি কি তোমাদের বলতুম না?

জ্ঞানের চেয়ে কি মানের দাম বেশী ! তোদের আড়াই বছরের বাচ্চাটা এতো হট্টগোলের মধ্যেও তখন ঘুমে অসাড়। হয়তো সুখের স্বপ্ন দেখছিল। নিদ্রিত শিশুদের রাজত্বে দুঃস্বপ্নের প্রবেশ নিষেধ।

ঘণ্টাখানেক পরে তখন ফুটি ফুটি ভোর, খাটাল থেকে তুই বেরিয়ে আসার পর, তোকে দেখে কি এক আক্রোশে ইষ্টপদ তোর দুগালে অন্ধের মতো চড়িয়ে মনের ঝাল মিটিয়েছিল। ওর মনের ঝাল মিটেছিল কি ? মিটলে তোকে পেটাবার পর ওই কালোকুলো খ্যাংড়া কাঠির মতো চেহারার মানুষটা কেন অনেক সময় ধরে দুহাতে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল ?

এসব জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাবার সময় তখন আমার ছিল না। কেননা সেই বর্ষায় আমার দোতলার ঘরের ফাটা ছাত থেকে জল পড়া বন্ধ করার জন্যে আমি হন্যে হয়ে সিমেণ্ট আর রাজমিস্ত্রির খোঁজ করছিলুম। রাজমিস্ত্রির সন্ধান পেলে সিমেণ্ট দুর্লভ হয়। সিমেণ্টের জোগাড় হলে রাজমিস্ত্রি নিরুদ্দেশ। অথচ ঝড়-বাদল, দুর্যোগ, দুর্বিপাক থেকে বাঁচার জন্যে ভাঙ্গা ছাত, যা কিনা আজীবনের আশ্রয়, সেটাকেও তো মেরামত করা দরকার।

তবু সাতসকালে ইষ্টপদর মুখে রাতের হামলার খবর শুনে সিমেণ্ট, রাজমিস্ত্রি, ফাটা ছাতের কথা ভুলে মাথা গরম করে আমি থানায় ছুটেছিলুম। গলির মুখে রকের ওপর ছেলে কোলে তোর মুখ চুন করে বসে থাকা মূর্তি দেখে আমি চোখ ফেরাতে পারিনি। গরীব মেয়ের শরীরের এতো জৌলুস যে তার শত্রু। একথা বোধহয় আজ স্বীকার করাই ভালো, যে, তোর অপমান বা ইষ্টপদর মার খাওয়ার জন্যে আমি থানায় যাইনি। ওসব পুতুপুতু বস্তাপচা মূল্যবোধ আর ধ্যানধারণা আমি অনেককাল ত্যাগ করেছি। আসলে জংলির কার্যকলাপে আমার অভিমান, সম্মান ঘা খেয়েছিল। আমার আশ্রিতদের ওপর হামলা করে তারা আমার সামাজিক সম্মান এবং প্রতিষ্ঠার খুঁটি ধরে নাড়া দিয়ে আমাকে তুচ্ছ, খেলো করার চেষ্টা করেছে। এই ঔদ্ধত্য, আমার পক্ষে চুপচাপ হজম করা সম্ভব নয়।

থানার বড়বাবু পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে, এক অধস্তন বিশালদেহী পুরুষ, নাম বোধহয় মিশির, তাকে পাঠিয়ে দিল আমার সঙ্গে। ইষ্টপদর কাছ থেকে ডাইরি নিল। মিশির পাড়ায় এসে জংলি এবং তার দলবলের খোঁজ করে কোন, সন্ধান না পেয়ে চলে গেল। কিন্তু মিশিরের টহল দেওয়ার খবর পাঁচ-মুখে ছড়িয়ে পড়ায় জংলিরা দিন কয়েকের জন্যে গা ঢাকা দিল। নিজের ক্ষমতা এবং প্রভাবের পরিচয় পেয়ে আমি পুলকিত হলুম। আমার আশ্রিতরা বুঝলো, আমিও একজন কেউকেটা।

কিন্তু দিন চারেক যেতে না যেতেই এক সকালে ইষ্টপদ আবার আমার ঘরে এসে হাজির। কি এক ভয়ে তার শুকনো মুখ চোয়ালের মধ্যে আরো খানিকটা ঢুকে গেছে। কি ব্যাপার—আমি জানতে চাইলে ইষ্টপদ বললো—কাল রাত প্রায় দুটোর সময় মিশির এসে কমলিকে তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হাতে-পায়ে ধরে কমলি বেঁচেছে। কমলি বলেছে—মোব এখন মসিক চান চলেছে। আর তিনদিন সময় দ্যান সিপাই সাহেব।

ইষ্টপদর দিকে আমি তাকাতে পারি না। এক নিরুপায় আত্মসমর্পণের পীড়নে অবনত হতে হতে নিজের মনে নিঃশব্দে বিড়বিড় করি, কমলি তুই ঘরে যা। আমার ফাটা ছাত আজও মেরামত হয়নি। আমার মধ্যবিত্ত দমকা দুঃসাহসের ঘাড়ে চেপে শেষপর্যন্ত তুই আমাকেও হয়তো ধ্বংস করে দিবি। শত্রু বড়ো মহাকায়, ভীষণ শক্তিধর, তার সঙ্গে আমি একা লড়াই করবো কি করে ?
ইষ্টপদ বলে—আমাদের বাঁচান বাবু।

ইষ্টপদর এই একটি কথায় আমি আবার চাঙ্গা হয়ে উঠি। মনে মনে ভাবি, এতো সহজে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া সমাজ, সংসারে আমারও তো একটা ভূমিকা আছে। অতি বড়ো বুড়বাক, বুদ্ধুর মতো সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় একবার তালেবর সাজার ইচ্ছে আমাকেও পেয়ে বসে। তাছাড়া সকালের আকাশে মেঘ ধোয়া ঝকঝকে রোদ, গাছপালায় ছড়িয়ে থাকা সবুজ স্নিগ্ধতা আমার মধ্যে অদ্ভুত সাহস আর আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তোলে।

ইষ্টপদর সঙ্গে রাস্তায় এসে সনৎবাবুর রক থেকে কমলিকে বাড়িতে নিয়ে আসি। মাকে বলি—কমলি এখন থেকে এবাড়িতে কাজ করবে। মা আপত্তি করে না। ভায়েরাও আমার প্রস্তাব মেনে নেয়। শুধু আমার ছোট ভাই, একজন ব্যাংক কর্মচারী, বলে—বড়োবাবুকে গিয়ে মিশিরের কীর্তি তোমার জানানো উচিত।

মেজোভাই প্রস্তাবটা উড়িয়ে দিয়ে যোগ করে—তাহলে এরপর রাতে স্বয়ং বড়োবাবু এসে হানা দেবে।

মেজোভায়ের কথাটা ঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু এই আশঙ্কাতেই আমি বড়োবাবুর কাছে যাইনি। আমাদের বাড়িতে কমলি কাজে বহাল হলেও ইষ্টপদ তাদের আড়াই বছরের মেয়েকে নিয়ে সনৎবাবুর রকেই থেকে যায়। কমলির কাজে বাড়ির সকলে খুশী হলেও আমার মেজোভায়ের স্ত্রী সুলতার ব্যবস্থাটা মনঃপূত হয় না। আমার ধারণা, সুলতার চেয়ে কমলির রূপ, সৌন্দর্য বেশী হওয়ার জন্যই এই মেয়েলি হিংসা।

সংসারের সাত পাঁচে আমার ভূমিকা খুবই সামান্য। তবু সেদিন মাঝরাতে এক-তলায় তোর ঘরের পাশ দিয়ে কলঘরে যাওয়ার সময় তোর চাপা গলার সেই অমোঘ কথাগুলো শুনে আমি পাথর হয়ে গিয়েছিলুম। গোড়াতে ভেবেছিলুম যে, হয়তো ইষ্টপদর সঙ্গে তুই কথা বলছিস। কেননা মাঝে মাঝে রাতে ইষ্টপদ এসে তোর ঘরে থাকতো, এখবর আমার জানা ছিল। তা ইষ্টপদ আসতেই পারে। সে তো তোর স্বামী। কিন্তু তোর কথার মাঝখানে সেই নিঃশব্দ ঘন, অন্ধকার দালানে চেনা পুরুষ গলার শব্দ শুনে আমার পায়ের নীচের গভীরতম ভূস্তর পর্যন্ত দুলে উঠেছিল।

কাকে যেন বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার জন্যে তুই বলেছিলি—বৌদি জানলে বড় কষ্ট পাবে। মাথার ওপর চাল আর পেটে ভাত না থাকলে শরীরের ক্ষিদে মরে যায় গো বাবু। আপনি শুতে যান।

তারপরেই সেই পুরুষের গলা, যে আমার সহোদর, অনুজ, আমারই রক্তস্রোত যার ধমনীতে বয়ে যাচ্ছে। কিছুটা ধস্তাধস্তি, লম্বা নিঃশ্বাসের হাপর টানা আওয়াজ, তারপর সূচীভেদ্য নৈঃশব্দ্য।

আমার আর কলঘরে যাওয়া হয় না। ভূতগ্রস্তের মতো বেসামাল পায়ে টলতে টলতে দোতলায় নিজের ঘরে ফিরে আসি।

কমলি, এই দ্যাখ, তোর ঘরে ফেরার ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। টিকিট দুটো যত্ন করে আঁচলে বেঁধে রাখ। ঘুরে ফিরে দেখবি, গাঁয়ে আবার নতুন চাষ আবাদ শুরু হয়েছে। তা যদি নাও হয়, শাক, পাতা, কন্দ খেয়ে আধমরা হয়ে শুকিয়ে আরো কিছুদিন বেঁচে থাক। এতোদিনে আমিও একসঙ্গে সিমেন্ট আর রাজ-মিস্ত্রির আয়োজন করতে পেরেছি। এই বর্ষায় যে কোনভাবেই হোক আমার ফুটো ছাত মেরামত হয়ে যাবে। সুসময়ের কথা ভাবতে ভাবতেই মানুষ একদিন নিজের হাতে সুসময় গড়ার দায়িত্ব তুলে নেয়।

তাছাড়া তুই তো ভালো করেই জানিস যে, দেহের ক্ষুধার চেয়ে আরো প্রবল এক ক্ষুধা আছে, তার নাম, শ্রম, শান্তি, শুদ্ধতা।

আতর আলির রাজসজ্জা

যাত্রা দলের রাজার পোষাক পরে আতর আলি বিয়ে করতে যাচ্ছে। ওর লম্বা চওড়া কালো দশাসই চেহারায় ঝলমলে জরিদার কুর্তা, মেরজাই আর নবাবী টুপি চমৎকার মানিয়েছে। শুধু ফাটাফুটো দুটো চাষাড়ে ঢাউস পায়ে কাঁচা চামড়ার শুঁড়তোলা একজোড়া নাগড়া কিছুতেই ঢুকতে চায় না। অনেক চেষ্টায় সে দুটো লাগানো হলো। বেজায় কষ্টেও আতর আলি টুঁ শব্দ করেনি। জীবনে এই প্রথম বিয়ে, প্রথম জুতো পরা। হাঁটার আগেই দুপায়ে অগুনতি ফোস্কা উঠে গেল।

একটা ছোটখাটো মিছিলের মাঝখানে আতব আলি, সামনে বাজনার দল। দল বলতে দুজন, জগু ডোম আব তার বেটা গোঁড়া ডোম। জগুর কাঁধে একটা পেল্লাই ঢাক, গোঁড়াব পেটের ওপব দড়িতে ঝোলানো ছোট একটা ডুগি। ওদের দলে কাঁসর বাজায় কন্ন ডোম। তার ছোট ছেলের ওলাউঠো। তাই সে আসেনি। এ চত্বরে বাজনার দল এই একটাই। বিয়ে সাদি, মড়ার জুলুস এবং আরো নানা পালাপার্বণে এবা ভাড়া খাটে।

পায়ের ব্যথায় আতর আলি খোঁড়াচ্ছিলো। মেঠো রাস্তার দুপাশে জম্পেশ ভীড়। ছেলে-মেয়ে. বুড়ো-বুড়ি, বৌ. বাচ্চা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বরবেশে আতর আলিকে সকলেই দেখতে চায়। আর আতর আলি তো যে সে লোক নয়, অনেক গালগপ্পের নায়ক। দেড়শো লুচি আর পাঁচ কেজি বোঁদে খাওয়ার পর, বাজী ধরে আড়াই সের ছোলা আর পাঁচপো ভেলিগুড় এক চুমুক জল না গিলে সাবাড় করে দেয়। বাবুদের বাড়ীর মেয়ের বিয়েতে দশ সের চালের পোলাও রাঁধা হয়েছিলো শুধু আতর আলির জন্যে। এক গাঁ লোকের সামনে একটা জ্যান্ত সাপ কচকচ করে চিবিযে খেয়ে সে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলো। বাবুপাড়ায় শহর থেকে আত্মীয় কুটুম এলে মাঝে মাঝে আতর আলির ডাক পড়ে। এক উঠোন অবিশ্বাসীর সামনে, একজন মানুষ কি পরিমাণ খেতে পারে, সেটা দেখাতে আতর আলি দমভোর খায়। খাওয়ার মাঝখানে নানা খুচরো কথা ওর কানে আসে।

বকরাক্ষস—কেউ বলে।

মিষ্টি মেয়েলি গলা রিন রিন করে—মাথা ঘুরছে। অজ্ঞান হয়ে যাবো।

কেউ বলে— কেমন যেন পাগল পাগল লাগছে। তারপর খিলখিল হাসি।

আতর আলি কোনদিকে তাকায় না। চোখকান বুজে খেয়ে যায়। বাবুদের

কেউ কেউ মদত দেয়—সাবাস আতর। আত্মীয় বন্ধুদের জিজ্ঞেস করে—কি বিশ্বাস হলো ?
অবিশ্বাসীর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। শুধু একটা অসহায় ঘন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ওঠে, হুম্।
এ গাঁয়ে এরকম কজন আছে—কোন কোন কুটুম জিজ্ঞেস করে।
মেজো কর্তা বলে—অনেক, প্রায় সকলেই।
বলেন কি ? তবু এরকম শুকনো প্যাঁকাটি মার্কা চেহারা কেন ? হজম হয় না ?
মেজো কর্তা হাসে। নীচু গলায় জবাব দেয়—আসলে এরা খেতে পায় না। শীতে, ধান চাল উঠলে একবার এসে দেখবেন, স্বাস্থ্য কাকে বলে।
খুবই ন্যায্য কথা। বছরে এরকম খাবার মওকা কদিনই বা আসে। বড়ো জোর চার পাঁচ দিন। তাও সব সনে সমান নয়। তাছাড়া আতর আলির পাড়ার সকলেই কমবেশি খেতে পারে। বাবুপাড়ায় যার বাড়ীতে যার খাতির, সে ডাক পায়। মেজোবাবুর কাছে বছরে আতর আলি তিন চার মাস জনমজুর খাটে। তাই মেজোবাবুর বাড়ীতে তার পাত পড়ে।
মাঘের শেষ বেলা। মরা আলোয় চারপাশ কেমন মিয়ানো, ধোঁয়াটে। একটা আবছা কুয়াশার সর গাছপালায় জড়িয়ে আছে। রাস্তার দুদিকে দিগন্তছোঁয়া ফাঁকা মাঠ। গোছা গোছা হলুদ নাড়া জেগে আছে। ডালপালা ছড়ানো উঁচু আলপথ পাঁচ আঙুলে দুরদূরান্তের গ্রামগুলোকে ছুঁয়েছে। মিছিলটা বাবুপাড়ায় ঢুকতে জগু ডোম তেড়ে ঢাক বাজাতে শুরু করে। বাবুদের বাড়ীর মেয়ে বৌরাও জানলায়, বাড়ীর রকে এসে দাঁড়িয়েছে। মিছিলের সঙ্গে মুসলমান, বাগ্দী আর কৈবর্ত পাড়ার কিছু ছানাপোনা জুটে গেছে। গাঁয়ের দু-চারটে কুকুরও সঙ্গ ছাড়ে নি। আতরের এখন একটু একটু লজ্জা করে।
ডোমপাড়ার সুন্দরী আর মাখনী টিউবওয়েলে জল নিচ্ছিল। সুন্দরী বলে—আতরকে বেশ মেইনেছে কিন্তু।
মাখনী হাসে। খোঁচা দেয়—নিকে করবি নাকি লা ?
দূর মুখপুড়ি—সুন্দরী ওর মুখে এক আঁজলা জল মারে।
মেজোকর্তা, অন্নদা ভৌমিক দুপুরের ঘুম শেষ করে ফোলা ফোলা ভারী চোখে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। আতর আলি বাবুকে দেখে নমস্কার করতে হাত বাড়ায়।
থাক, থাক—মেজোকর্তা পিছিয়ে যায়। অবাক চোখে আতরকে দেখে তারিফ করে। বলে-ড্রেসটাতো তোকে বেশ ফিট করেছে। কোমরে একটা তরোয়াল ঝুলিয়ে দিলে আর কোনো খুঁৎ থাকতো না।
মেজো গিন্নীও এখন রাস্তায় নেমে এসেছে। আকাশ ফাটিয়ে ঢাক আর ডুগি বাজছে। কুকুরগুলো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। আতর ভাবছে, তরোয়ালটা ঝুলিয়ে নিলে মন্দ হতো না।

আতরের দাদা শের আলি হঠাৎ একটা সিগারেটের প্যাকেট খুলে মেজো কর্তার সামনে এগিয়ে দেয়। মেজোকর্তা একটা সিগারেট নিয়ে হুসহুস টানে। ভায়ের বিয়ের পয়সা মেরে শের আলি আজ এই প্যাকেটটা কিনেছে। যতোই হোক, সে বরকর্তা, তার একটা ইজ্জত আছে বৈকি !

নাগরার ভিতরে আতরের দুটো পা যন্ত্রণায় টনটন করে। আতর ভাবে, শালা, ভালো বিপদ হলো দেখি। জুতোর চাপে পরান যায়।

মেজোকর্তা নিচু গলায় হঠাৎ আতরকে বলে—বিয়ে চুকলেই কাজটা করতে হবে কিন্তু।

আতর আলি একটু চমকে ওঠে, তারপর ঘাড় হেলায়।

বাবুপাড়া থেকে মিছিল আবার ফাঁকা রাস্তায় আসে।

শের আলি জিজ্ঞেস করে—মেজোকর্তা কী কাজের কথা বলতেছিল ?

কিছু নয়—আতর আলি প্রশ্নটা উড়িয়ে দেয়।

আতরের শ্বশুরঘর চকমানিক ছাড়িয়ে আরো এক ক্রোশ পথ। সামনে দুটো বিশাল মাঠ। ত্যাড়াবাঁকা মেঠো রাস্তায় নুনছাল ওঠা দুটো পায়ে জ্বলুনি বাড়ে। সকালে, বাজারে মেজোকর্তার দোকানে আতর আলি গিয়েছিলো বিয়ের পোশাকটা আনতে। বাজারে মেজোকর্তার ডেকোরেটিং-এর দোকান। বেশ জমজমাট ব্যবসা, আশপাশে দশ-বিশ মাইল জুড়ে যাত্রা, থিয়েটার, পুজোয় মেজোকর্তার দোকানের মাল ভাড়া খাটে। দু'জন পেণ্টার আছে। তারা রাজা, রাণী, সখী সাজায়। মেজোকর্তা নিজেই বলেছিলো, ড্রেসের ভাড়া তোকে দিতে হবে না। তুই আমার ঘরের লোক।

আতর আলি খুশী হয়েছিলো খুব। এমন সাজসজ্জা করে বিয়ে করতে যাওয়া বড়ো ভাগ্যের কথা ! সবুর খাঁর ছেলে সাজাহান গিয়েছিলো এই পোষাক পরে। সেও চার বছর আগের ঘটনা। তার পর এ গাঁয়ে আর কেউ এ পোশাক পরে নি। জ্যাকেট, জামা, কুর্তা ওর শরীরের মাপে মাপে লেগে গেলো। মেজোকর্তা তখন কাজের কথা বলছিল—সুদামের নতুন সাইকেলটা নিয়ে মাঝরাতে নবপাঁজার পুকুরে ফেলে আসবি। কাকপক্ষীতে টের পাবে না। সকালে আমরা যখন জোর তল্লাশ চালাবো, তখন তুই এসে জানাবি। পুলিশ আসবে, কিন্তু তোর কোনো ক্ষতি হবে না। তোর টিকি কেউ ছুঁতে পারবে না।

কথাগুলো শুনে আতর আলির বুক কাঁপছিলো। সামনে মানুষ প্রমান বড়ো আয়না। সেখানে হঠাৎ আতর আলি নিজেকে দেখতে পেয়েছিল। তাজা টগবগে শরীরে রাজ পোশাক পরা এক অচেনা লোক। আতর আলির মাথায় ধাঁধা লেগে গিয়েছিল।

পারবি না—মেজোকর্তা খুঁচিয়েছিল—এরকম চেহারা, এতো শক্তি তোর শরীরে।

আয়নার ঝলমলে চেহারার সেই মানুষটা ওকে নেশা ধরিয়ে দিল। কি এক ঘোরের মধ্যে আতর আলি বলেছিল –পারবো কর্তা। নিশ্চয় পারবো। রাজপোশাকটা ওর শরীর কামড়ে ধরেছিল। আতর আলির মনে হচ্ছিল, এটা সে সারা জীবনে আর ছাড়তে পারবে না।

গাছপালার আড়ালে চুনবালি খসা একটা পুরোনো গির্জা দেখা যায়। মাদা সাহেবের কেল্লা। চারপাশে গড়খাই, মাঝখানে একটা মসজিদ। মসজিদের চূড়োয় পাঁচ, সাতটা বাঁশে লাল, সবুজ, হলুদ নিশান উড়ছে। বহুদূর থেকে ঝাণ্ডাগুলো দেখা যায়। মাদা সাহেবের কেল্লার সামনে এসে মিছিলটা দাঁড়ায়। জগু ডোম আরো একবার জোর কদমে ঢাকে আওয়াজ তোলে। গাছপালার ছায়ায় কেল্লার ভেতরে অন্ধকার ঘন হ'য়ে উঠেছে।। কেল্লার চাতালে কে একজন প্রদীপ জ্বালছে। আতরের দু'টো পা যন্ত্রণায় যেন খসে পড়বে। ও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে–খুতত্তুরি শালার জুতোর নিকুচি করেছে।

শের আলি ভাইকে বলে—জুতোজোড়াটা খুলে বগলদাবায় রাখ। শ্বশুর ঘরের কাছ বরাবর গিয়ে পায়ে গলিয়ে নিবি।

বুদ্ধিটা আতরের পছন্দ হয়। জুতো জোড়া খুললে সকলে নজর করে, আতর আলির পা কেটেকুটে রক্ত ঝরছে। আতরের ছোট ভাই বরবানি তাড়াতাড়ি এক মুঠো ম্যালেরিয়া পাতা চটকে দাদার পায়ে লাগিয়ে দেয়।

বাবুপাড়ায় মেজোকর্তা আর গিন্নী তখন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছোঁড়াটার চেহারা দেখছো—মেজোগিন্নী বললো—আমাদের সুদানও তো ওর বয়েসী। অথচ কি ভোগাই ভুগছে। শরীরটা আর সারে না।

মেজোকর্তা সাড়া দেয়—হুঁ। তবে এই তিনমাস। ঘরে ধানচাল ফুরোলে আবার রোগা পটকা সেপাই।

তা ঠিক—মেজো গিন্নী ঘাড় নাড়ে—কিন্তু আমাদের ঘরে ভগবানের দয়ায় কখনো অভাব নেই, তবু আমাদের ছেলেদের শরীর সারে না। শরীরে জোয়ার ভাঁটা নেই। সব ঋতুতেই এক।

তুলনাটা মেজোকর্তার বেশ যুৎসই লাগে। এইমাত্র ভরা জোয়ারের শরীর দেখছে। শুধু আতর নয়, এখন গাঁয়ের প্রায় সব গরীবদের শরীর, শরীরের প্রতিটা শিরা পেশী সজাগ, টইটুম্বুর। পেট ভর্তি খাওয়ার এতো রহস্য আর আরাম রোজ পেটপুরে খেয়েও বোঝা যায় না কেন!

গিন্নী আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ীতে ঢোকে। হেঁসেলে অনেক কাজ পড়ে আছে।

কেল্লার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শের আলি দু-কান আর নাকে হাত ছুঁইয়ে কি যেন বিড়বিড় করে। আতর ভাবে, আশ্বিনের পরবে নতুন বিবিকে নিয়ে এখানে

মেলা দেখতে আসবে। এ অঞ্চলে মুসলমানদের এটা বড়ো পরব। সারাদিন বেজায় ভীড়। গুড়জল আর তাড়ির ফোয়ারা ছোটে। সঙ্গে গোস। হল্লাগুল্লার একশেষ।

দু পায়ের কাটা ছেঁড়ায় ম্যালেরিয়া পাতার রস লেগে চিড়বিড় করছিল। শিংওলা নাগরা দুটো বগলের তলায় ঢেকে মিছিলের সঙ্গে আতরআলি এগোয়।

বিয়ের পর হপ্তা না ঘুরতেই আতরআলি ফতুর হয়ে গেল। ঘরে দানাপানি শেষ। বিঘে চারেক জমি ও ভাগে চাষ করে। সারা বছরের খোরাকি হয় না। তার ওপর নতুন বৌ পেয়ে ফূর্তিতে খিদে বেড়ে গেছে। বেধড়ক খেয়েছে। আত্মীয় কুটুম্বরাও দু-তিনদিন পাত পেড়েছে। খোরাকির ধান বেচে আতরআলি বৌকে এক জোড়া রূপোর মল, রঙ্গীন ফিতে আর গন্ধ তেল কিনে দিয়েছে। ওর বৌয়ের নাম নুরজাহান। বছর চোদ্দ বয়স। খুশিতে সে ডগমগ।

সন্ধ্যের পর বন্ধ ঘরে কুপির আলোয় বিয়ের পোশাকটা পরে আতরআলি রাজার মতো ঘুরে বেড়ায়। অবাক তাজ্জব চোখে নুরজাহান দেখে। আতরআলি ভাবে, একটা তরোয়াল থাকলে চেকনাই বাড়তো।

পোশাকটার ওপর নুরজাহানেরও মায়া পড়ে গেছে। বলে, ওটা গায়ে দিলে তোমায় খুব সোন্দর দেখায়। মুই বলি কি, ওটা আর ফেরৎ দিও নি।

আতর আলির মাথাতেও মতলবটা পাক খায়। আবছা আলোয় মাটির দেওয়ালে একটা জবরজং ছায়া। ছায়াটার নাক, মুখ চোখ নেই। মাথার বাহারী টুপিটাও চেনা যায় না। আতর আলি সরে দাঁড়ায়। দেওয়ালের ছায়াটা লাফিয়ে ওঠে। ঠিক তখনই কে যেন বাইরে থেকে তার নাম ধরে ডাকে। আতরআলি দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। সামনে নিকষ গাঢ় অন্ধকারে নিজের শরীরটা পর্যন্ত দেখা যায় না। অচেনা শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। একটা জোরালো টর্চের আলো আতর আলির মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুজন লোক সামনে এসে দাঁড়াতে মেজোকর্তা আর তার পেয়ারের চাকর লগেনকে আতর আলি চিনতে পারলো। টর্চের আলোয় এখন চারপাশ পরিষ্কার দেখা যায়। মেজোকর্তা ওকে দেখে হেসে বললো—বেটা রাজা সেজে সারাদিন বিবির সেবা করছিস নাকি ?

আতরের জিভ জড়িয়ে যায়। মুখে কথা নেই। লগেন টর্চটা নিভিয়ে দেয়। আবার অন্ধকার।

নীচু গলায় মেজোকর্তা বলে, একটু আড়ালে চল। জরুরী কথা আছে। আতর আলির বুকটা গুড়গুড় করে ওঠে। অন্ধকার মেঘলা আকাশে একটাও তারা নেই। পায়ের চাপে নরম ঘাসের ঘাড় মটকে যায়। আতর আলির দুটো পা শিশিরে ভিজে ওঠে। আতর আলি বোঝে, মেজোকর্তার হিসেব চুকোতে হবে।

আজ রাতে চলে আয়—মেজোকর্তা নীচু গলায় বলে—বারোটার পর। লগেন সদরে থাকবে। সাইকেলটা নিয়ে সোজা চলে যাবি। তারপর বাড়ী ফিরে বৌয়ের পাশে শুয়ে ঘুম।
আতর আলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।
কি হলো—মেজোকর্তা খেঁচায়।
ঠিক আছে—আতর আলি সাড়া দেয়।
সময়টা আরো একবার মনে করিয়ে দিয়ে মেজোকর্তা চলে যায়। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পায় না। ভিজে ঘাসলতার ওপর আতরআলি কিছু সময় একা দাঁড়িয়ে থাকে। চারপাশে ঝিঁঝির ডাক, কীটপতঙ্গের চলাফেরা। আতর আলির হঠাৎ ভয়ংকর শীত লাগে।
ঘরে ঢুকে আতর আলি কেমন গুম মেরে যায়। বৌয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। দেয়ালের ওপর তার সেই বিশাল ছায়াটা এখন কেমন যেন গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে। কুপির মুমূর্ষু আলোয় তার ছোট্ট ভিটেটা কাঁপছে।
পোশাকটা খুলে আতর আলি দড়িতে ঝুলিয়ে রাখে। খালি গায়ে কালো ইজের। ঘরের মাটিতে পাতা চাটাইতে বৌয়ের পাশে শুয়ে আতর আলি ছটফট করে। নুরজাহান কিছু সময় চোখ বুজে স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করে। তারপর গভীর ঘুমে ডুবে যায়। সারাদিন ঢেঁকিতে ধান ভেনে তার মাজা টনটন করছিল। আতর আলির শরীরটা আজ তার বড়ো ঠাণ্ডা লাগে।
মাঘের শেষে আকাশে মেঘের গন্ধ পেয়ে অন্ধকারে ব্যাঙ ডাকে। মাথার কাছে খুপরি জানলার পাশে বাঁশবনে এক ঝাঁক জোনাকি নেচে বেড়ায়। আতর আলি জেগে থাকে। দড়িতে মরা মানুষের মতো ঝুলছে সেই রাজপোশাক। আতর আলি আর সেদিকে তাকাতে পারে না। তার চিন্তা ভাবনা কেমন গুলিয়ে যায়। নব পাঁজার সঙ্গে মেজোকর্তা শত্রুতা করছে কেন, ও ভাবতে চায়। গরীব, ছাপোষা ঘরামি নবপাঁজার নিরীহ মুখটা ওর মনে পড়ে। মানুষটা খারাপ নয়। কারো সাতেপাঁচে নেই। তার সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া, আতর আলি ভেবে পায় না। লোকটা দুঃখীও বটে। তিনটে বৌ-এর একটাও বাঁচলো না। আবার চার নম্বর বউ এনেছে। আতর আলি ভাবে, আমি কেন গুনাহের ভাগী হবো! মাথার মধ্যে ঝিমঝিম ভাব। আতর আলি বলে, খোদা বাঁচাও।

আন্দাজে রাতের বাড় ঠাহর করে তবুও আতর আলিকে উঠতে হয়। চারপাশে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। এ অন্ধকার তার অচেনা নয়। অনেক খিদের রাতে পেটের ধান্দায় বাগানে বাগানে মুলো, কলার খোঁজে ওকে ঘুরতে হয়। বুকের পাটা আছে। ভয়ডর কাছে ঘেঁসে না। আজ কিন্তু ওর শরীর কাঁপে। কলজের

ধুকপুকুনিটা কিছুতেই থামতে চায় না। বাবুপাড়ার দিকে হনহন করে হাঁটতে থাকে। রাস্তার দু'একটা চেনা জানা কুকুর সামান্য চিল্লিয়ে সরে দাঁড়ায়। মেজোকর্তার বাড়ীর বাঁধানো রকে দাঁড়িয়ে ও চারপাশ ভালো করে দেখে নেয়। দরজায় খুট খুট টোকা দিতে লগেন দরজা খোলে। আতর আলিকে একটু দেখে ভেতরে মিলিয়ে যায়। মিনিটখানেক আতর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সুদামের নতুন সাইকেলটা লগেন ওর হাতে ধরিয়ে দেয়। লগেনের পেছনে মেজোকর্তা। আতর আলির হঠাৎ সাইকেলের ঘণ্টিটা প্রচণ্ড জোরে বাজিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মেজাকর্তা চাপা গলায় বলে, রাজার ড্রেসটা তোকে আর ফেরৎ দিতে হবে না, ওটা তোর মজুরী।

অন্য সময় হলে আতর আলি খুশিতে লাফিয়ে উঠতো। এখন তার কানে কথাগুলো পৌঁছোয় না। সাইকেলটা ধরে ও নিঃশব্দে রাস্তায় নামে। চোখের সামনে রাশি রাশি ঘন অন্ধকার। আতর আলির মনে হয় সে যেন একটা সীমাহীন গোবের তলা দিয়ে হাঁটছে। বাবুপাড়া থেকে নবপাজার ভিটে পায়ে হেঁটে মিনিক দশকের পথ। খড়ের ছাউনি লাগানো দুটো মাটির ঘর। সামনে দাওয়া, উঠোন। তারপর একঝাড় কলাগাছ। পাশে ছোট একটুকরো পুকুর। আতর আলি মাঝ পুকুরে সাইকেলটা টেনে নিয়ে যায়। গলা পর্যন্ত ওর হিমশীতল জলে ভিজে যায়। গোটা শরীর যেন বরফ হয়ে গেছে।

আচমকা ঘুম ভাঙ্গতে মেজো গিন্নী বিরক্ত হয়েছিল। বিছানায় হাত বুলিয়ে দেখলো, কর্তা নেই। গিন্নী ধড়মড় করে উঠে বসতেই কর্তা এসে বিছানায় শোয়। কর্তার শরীরের চেনা গন্ধ অন্ধকারে গিন্নীর নাকে লাগে।

কি ব্যাপার—গিন্নী জিজ্ঞেস করে।

চোর এসেছিল বোধহয়।

সে কি। গিন্নী আতঙ্কে কাঁপতে থাকে, বলে—লগেনকে ডাকো।

দরকার নেই। আমি নিজেই দেখে এলুম, কেউ নেই।

গিন্নী আর কথা বাড়ায় না। লোকটা যেন কি, চোর ছ্যাচোরের সাড়া পেয়েও মাথা ঘামায় না।

কাজ শেষ করে ঘরে পৌঁছোনোর আগেই আতর আলির শরীর শুকিয়ে যায়। ভিজে ইজেরেই সে চ্যাটাই-এর ওপর বৌয়ের পাশে শুয়ে পড়ে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। দড়িতে টাঙ্গানো জোব্বাটা ধীরে ধীরে অন্ধকার সরিয়ে চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সেই পোশাকের মধ্যে একটা অচেনা, অজানা ভয়ঙ্কর মানুষ এসে দাঁড়ায়। আতর আলি গোঙাতে থাকে।

সকালে সদরের বাইরে জনাকয়েক লোক আতর আলির নাম ধরে ডাকছে। আকাশের মেঘ কাটেনি। কেমন যেন থমথমে ভারী আবহাওয়া। নুরজাহান ঘাটে গিয়েছিল।

এতো মানুষ দেখে সে ভড়কে যায়। স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে তোলে। ভোর রাতে আতর আলি ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর শরীর জুড়ে রাতের ক্লান্তি, ধকলের ছাপ। লাল টকটকে দুটো চোখ।

দাওয়ায় দাঁড়াতে লগেনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। লগেন চোখের ইশারা করে।

ছেকরদ্দি বলে, কাল রাতে খোকাবাবুর সাইকেল চুরি হয়েছে। মেজোকর্তা তোকে ডাকতেছে। কয়েকজন ওকে ঘিরে ধরে। ছোটকর্তা বলে, শালা, চোরের পেশাকেই রাতে ঘুমিয়েছিল।

আতর আলি ওদের সঙ্গে রাস্তায় নামে। ঘরের মধ্যে নুরজাহান ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

শেষ শীতের ফ্যাকাসে সকাল। গাছপালা, রাস্তার ধুলো, সব কিছুতে ভিজে ভিজে ঠাণ্ডা ভাব। বাবুদের বাড়ীর খামারে তখন বিস্তর লোকের ভীড়। আতর আলিকে দেখে সকলে ফুঁসে ওঠে। গাঁয়ের আরো দু'চারজনকে ধরা হয়েছে। হাত-পা বাঁধা দুঁদে আলি মাটিতে শুয়ে আছে। বড়ো গোলার পাশে বুনো নাপিত। দু হাঁটুতে মুখ ঢাকা। পিঠে চড় চাপড়ের ছাপ। সুদামের সঙ্গে থানা থেকে পুলিস এলো।

মেজোকর্তার সঙ্গে চুকতি মতো জেরার সময় আতর আলি ফাঁস করলো সাইকেল চুরির কথা। নবপাঁজার সঙ্গে যোগসাজসে কাল রাতে সাইকেল সরিয়েছে। ঘরামির পুকুরে গাড়ীটা আছে।

ভীড়ের মধ্যে তুমুল হৈ চৈ উত্তেজনা। উর্দিপরা অফিসার রাগে আতর আলির কাঁকালে একটা জব্বর লাথি কসালো।

মেজোকর্তা বলে, ছি ছি আতর।

তারপর অফিসারকে শাসিয়ে আতরের হয়ে সাফাই গায়, এ লোকটা আসলে বোকা, নিরেট গর্দভ। শুধু খেতে জানে। এসব নবপাঁজার মতলব। ও লোকটাই আসল শয়তান। গাঁয়ের গরীবদের মাথা চিবোচছে।

দুজন সিপাই নিয়ে অফিসার নবপাঁজার বাড়ির দিকে যায়। সুদাম পথ দেখায়। বাকী পুলিস খামারে পাহারায় থাকে। ভিড় থেকে নানা টিকাটিপ্পনি উড়ে আসে। শালা চোর। মাগের গয়না বানাবে।

এক ফাঁকে মেজোকর্তা কানে কানে বলে গেল—ঘাবড়াসনি আতর।

আতর আলি ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে থাকে।

গলায় গামছা দিয়ে নবপাঁজাকে টেনে আনা হয়। পেছনে দুলাল রঞ্জর কাঁধে কাদামাখা সাইকেল। বমাল সমেত দুই চোরকে পেয়ে অফিসারের তর্জন গর্জন বেড়ে যায়। ভিড়ের কিছু লোক গলা মেলায়। নবপাঁজাকে নিয়ে পুলিশ চলে

যায়। আতর আলির হয়ে মেজোকর্তা জামিন দাঁড়ানোয় দু'দিন পরে আতর আলি থানা থেকে মুক্তি পেল।
ভরদুপুরে আতর আলি ঘরে ফেরে। বিবর্ণ, ভীতু চোখে নুরজাহান স্বামীকে দেখে। আকাশে ঘন মেঘ। নিস্তব্ধ পাড়াগাঁয়ের দুপুরে ঘুঘুর ডাক ভেসে বেড়ায়। বিকেলের আগেই আতর আলি আবার রাজা সাজে। বাক্স, পেঁটরা হাতড়ে কিছু টাকা জোগাড় হয়। আতর আলি বাড়ি থেকে বেরোয়। নুরজাহান দাওয়ায় চুপচাপ বসে থাকে।
রাত দশটা নাগাদ মাধব শুঁড়ির দোকান থেকে আতর বেরোয়। গাঁটের কড়ি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুঁড়ি ওকে তুলে দিয়েছে। অনেকটা গুড়জল আর তাড়ি খালি পেটে ঢুকে আতর আলির মাথায় তখন তুলকালাম কাণ্ড চলছে। সারা বিকেল তুমুল বৃষ্টি হয়েছে। নিকষ অন্ধকারে কাদা থকথকে রাস্তায় আতর আলি বেসামাল পায়ে হাঁটে। জরি বসানো ওর পোশাক নিয়ে শুঁড়ি—খানায় অনেক হাসি, ঠাট্টা হয়েছে। আতর আলি কান দেয় নি। অন্ধকার ফাঁকা রাস্তায় আতর আলি হাঁটতে থাকে। দুপাশে খাল, বিল, পুকুর। আতর চোখে ঝাপসা দেখে। কোথায় যেন সাপে একটা ব্যাং ধরেছে। ব্যাংটা আর্ত গলায় ডাকছে। বাবুপাড়ার কাছাকাছি এসে আতর আলি একটা ডোবায় পড়ে যায়। নরম পাঁকে ভারী শরীর ডুবে যেতে থাকে। দুহাতে ঘাস লতা ধরে আতর আলি ওঠার চেষ্টা করে। কিন্তু চটচটে এঁটেল মাটির কামড় ছাড়াতে পারে না। হঠাৎ ও দারুণ ভয় পায়। মনে হয় পৃথিবীর তলায় লুকিয়ে থাকা সেই বাসুকী নাগ ওকে গিলে নিচ্ছে। অদূরে ব্যাঙের প্রাণান্তকর কাৎরাণি। আতর আলি হঠাৎ ভূতুড়ে গলায় ডুকরে ওঠে—ও নুরজাহান, তোর স্বামী যে পথে মরে লো। ও নুরজাহান ... ...
ফাঁকা অন্ধকারে ওর গলা টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে যায়। মুখে পানের খিলি গুঁজে মেজোগিন্নী জিজ্ঞেস করে—আতর আলি না?
মেজোকর্তা বলে—হুঁ।
—যত্তো সব মোদো মাতালের কাণ্ড। ঘরে মাগ ছেলেকে খাওয়াতে পারে না, অথচ মদ খেয়ে গড়াগড়ি। পুলিসের হাত থেকে তোমার ওকে ছাড়ানোই ভুল হয়েছে।
মেজোকর্তা জবাব দেয় না।
কাদা পাঁক সরিয়ে আতর আলি আবার রাস্তায় উঠেছে। মাথার ঝাপসা ভাবটা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। টলমল পায়ে আতর আলি এগোয়। এখনি তাকে একবার মেজোকর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। ওর মাথায় এখন রুপোলি কিংখাপে মোড়া ইস্পাতের একটা ধারালো তরোয়াল ঝলমল করে। আতর আলি নিজের মনেই বিড়বিড় করে, কর্তা আমার তরোয়াল আমাকে ফেরত দাও।

দিন নেই রাত নেই

সেদিনের কথা আমার বার বার মনে পড়ে।

ঠিক এইরকম রোদ ঝলসানো, নিঝুম দুপুর, চারপাশ চুপচাপ, রাস্তায় লোকজন কম, মাঝে মাঝে কাকের ডাক। জানলার একটা পাল্লা খুলে বাসষ্টপের দিকে আমি তাকিয়ে আছি। দরজা বন্ধ, ঘরের মধ্যে আমি একা। এখন আমি পলাতক। তাই সব সময়ে খুব সতর্ক, সাবধান। রাস্তা থেকে কোনো সন্ধানী ক্ষতিকর চোখ যেন আমাকে দেখে না ফেলে!

একটা বাস এসে ষ্টপে দাঁড়াতে আমার দৃষ্টি উদগ্রীব হয়ে উঠলো। ধূলো, শাল-পাতা আর টুকরো কাগজের ঘূর্ণি উড়িয়ে বাসটা চলে গেল। কিন্তু বাস থেকে মঞ্জরী নামলো না। তার বদলে নামলো একজন বয়স্কা মহিলা, সঙ্গী এক কিশোর। দুরুদুরু হৃৎপিণ্ডে জানলায় চোখ রেখে আবার দশ মিনিট বাসের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে। কি এক অশুভ আবহাওয়া আমাকে ঘিরে ধরছে। বুঝতে পারছি, আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। এবার আমায় ধরা পড়তে হবে। পর পর আমার সবকটা গোপন ডেরার হদিশ পুলিশ জেনে গেছে। বিট দেওয়া জানোয়ারের মতো আমি ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছি। নজর এড়িয়ে আর বেশীদিন আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব নয়।

রাস্তার দুপাশে সার সার বাড়ি। সামনের বারান্দায় এক মহিলা ভিজে কাপড় মেলছে। নীচের রাস্তায় চোখ বুজে জাবর কাটছে একটা মোষ। ল্যাজের ঝাঁটা ঘুরিয়ে নেইআকড়া একদল মাছিকে বারবার তাড়ানোর চেষ্টা করছে।

আজ থেকে দুমাস আগে ঠিক এমন এক দুপুরে মঞ্জরী এসেছিল। সেদিনও ঠিক এই নির্জনতা, ঝলসানো রোদ আর কাকের ডাক। কিন্তু সেদিন আমার এতো উদ্বেগ, এতো অস্বস্তি ছিল না। নরম বিছানায় বুকে বালিশ দিয়ে শুয়েছিলুম। এমন নরম বিছানায় কতোকাল শুইনি! মাথার কাছের খোলা জানলা দিয়ে রাস্তা আর বাসষ্টপটা দেখা যাচ্ছিল। ঘণ্টা দুই আগে প্রণব এই ফ্ল্যাটে পৌঁছে দিয়েছিল আমাকে। তারপর গিয়েছিল মঞ্জরীকে আনতে। বালিসের পাশে আমার সঙ্গী বইগুলো, কম্যুনিষ্ট পার্টির ইস্তেহার, নয়া গণতন্ত্র, রাষ্ট্র ও বিপ্লব সাজিয়ে রেখেছিলুম।

বাইরে ঘন রোদ। বারান্দায় কয়েকটা চড়াই পাখি খুশির হাট বসিয়ে দিয়েছিল। নয়া গণতন্ত্রের পাতায় চোখ রেখে নানা কথা ভাবছিলুম। অসংখ্য টুকরো স্মৃতি, স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা আমার মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কিছুদিন পরেই মঞ্জরীর সঙ্গে বর্ধমানের গ্রামে চলে যাবো। তার আগে আইনতঃ বিয়েটা করে নেওয়া দরকার। আরো কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হবে। তাতে কোন ক্ষতি নেই। মঞ্জরী থাকবে। মঞ্জরী আর আমি, স্বামী, স্ত্রী। নয়া গণতন্ত্র মুড়ে রেখেছিলুম। বিছানার পাশে একটা ম্যাগাজিন স্ট্যাণ্ড। পুরোণো পত্রপত্রিকা নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিলুম, ছবি দেখছিলুম। হঠাৎ হাতে এলো একটা ছোট সাইজের বই, হলদেটে মোটা পাতা, কেমন নরম নরম, স্যাঁতসেঁতে। ছাপাও ভালো নয়। নাম, ভানুমতীর খেলা। দু'একটা পাতায় চোখ বুলিয়েই বুঝলুম যে, এ বই আগে পড়িনি। কি এক প্রচণ্ড ক্ষিধেতে পাতার পর পাতা শেষ হয়, রক্ত গরম হয়, নিঃশ্বাসে আগুন ছোটে, অদ্ভুত এক ছটফটানি জাগে শরীরে। ইচ্ছে করলেও বইটা ফেলে দিতে পারি না। দাঁতে দাঁত চেপে পড়ে যাই। আমার প্রিয় বই-গুলো বালিসের পাশে পড়ে থাকে। হঠাৎ মনে হলো, মঞ্জরী বড়ো দেরী করছে।

মঞ্জরীর ভীতু ভীতু চোখ আর পা টিপে আসার সতর্ক ভঙ্গী দেখে আমি হেসেছিলুম।

হেসো না, বড়ো ভয় করে—নীচুগলায় মঞ্জরী বলেছিল।

প্রণব কোথায়—আমি প্রশ্ন করেছিলুম।

দূর থেকে এই বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল—মঞ্জরী বললো—সন্ধ্যের পর আসবে।

ভয় কাটলো—আমি খোঁচা দিলুম মঞ্জরীকে।

উঁহুঁ—শব্দ তুলে এক চোখ আলো নিয়ে মঞ্জরী তাকালো আমার দিকে।

মঞ্জরীর নরম শরীর থেকে হাল্কা সুবাস বেরোচ্ছিল। চাঁপা রঙের শাড়ী, কপালে কুমকুমের লাল ছোট টিপ, মঞ্জরীকে দেখাচ্ছিল, টাটকা চাঁপা ফুলের মতো। বোধহয় কিছু আগে ও স্নান করেছে। ভিজে চুলের মৃদু গন্ধ ওড়ে। চুল খোলা। হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে এলো চুলের তলার দিকে সংক্ষিপ্ত বিনুনি।

হাতের প্যাকেটটা টেবিলে রেখে মঞ্জরী ঘুরে ফিরে ঘরটা দেখলো। বেশ বড়ো ঘর। গোটা চারেক জানলা, দুটো দরজা, সঙ্গে বাথরুম, রান্নাঘর। ঢাউস খাটে পরিপাটি বিছানা। ড্রেসিং টেবিল, আলমারি, আলনা, পড়ার চেয়ার টেবিল এবং আরো টুকিটাকি আসবাবপত্র থাকা সত্ত্বেও সাজানোর গুণে ঘরটা খালি খালি দেখায়। হাল্কা সবুজ ডিস্‌টেম্পার করা দেওয়ালে খাজুরাহোর যুগল মিলনের

ব্লো-আপ ছবি ঝুলছে। ষ্টিলের ফ্রেমে সস্ত্রীক অমলেশদার একটা ছবি ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা।

ফ্ল্যাটটা অমলেশদার। অফিসের কাজে মাস তিনেকের জন্যে বৌ নিয়ে অমলেশ-রাজস্থানে গেছে। ফ্ল্যাট দেখাশোনার ভার দিয়ে গেছে প্রণবকে। ফ্ল্যাটের চাবিও আছে প্রণবের কাছে। প্রণব, অমলেশদার মামাতো ভাই। ওরা দুজনেই আমাদের পার্টির সমর্থক এবং দরদী। তাছাড়া প্রণব আমার বহুদিনের বন্ধু।

ফ্ল্যাটটা বেশ—মঞ্জরী বলেছিল। তারপর টেবিল থেকে প্যাকেটটা এনে আমার সামনে খুলে ধরেছিল। প্যাকেট ভর্তি চীনা খাবার, ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন, চিংড়ি মাছ। দারুণ গন্ধ। প্রণবের মুখেই মঞ্জরী আগে ভাগে খবর দিয়ে রেখেছিল।

এতো—খুশীতে ভরপুর হয়ে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম।

মঞ্জরী হাসলো। বললো—এমন কিছু বেশী নয়।

নক্সাকাটা কাগজের থালায় ও খাবার সাজিয়ে দিয়েছিলো। চারপাশ বড়ো শান্ত. সুন্দর হয়ে উঠলো। খেতে খেতে দু'এক গ্রাস প্রায় জোর করে আমি ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম মঞ্জরীর মুখে। মঞ্জরী কিছুতেই খাবে না। আমিও ছাড়বো না। মুখে রাগ, চোখে হাসি নিয়ে ও খেয়েছিল। কি এক লাবণ্য টলটল করছিল ওর সরু চিবুকে। বাইরের পৃথিবী, বাসের আওয়াজ, ডিজেলের গন্ধ সব কিছু মুছে গিয়েছিল আমাদের জগৎ থেকে।

ঝলসানো রোদ মরে গিয়ে আকাশে কখন যেন মেঘ জমতে শুরু করেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে গায়ে লাগতে জানলার সামনে গিয়ে মঞ্জরী আকাশ দেখলো। তারপর বললো—ইস্ কি মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে।

আমি জানলার দিকে হুমড়ি খেয়ে আকাশ দেখতে যেতেই আমার কাঁধ ধরে মঞ্জরী সরিয়ে দিল।

জানলার কাছে যেও না, কেউ দেখে ফেলবে—নীচু গলায় ও সাবধান করলো আমাকে।

অথচ তখন আমার মেঘ দেখার, তুমুল বৃষ্টিতে সপসপে হয়ে ভেজার দরকার। ভানুমতীর নেশা আমার রক্তে ঢুকে আমাকে তাতিয়ে তুলেছে। এসব কথা মঞ্জরীকে বলতে পারি না। বালিসের তলা থেকে ফ্যাকাশে, বিবর্ণ ভানুমতীর হলুদ কোনাটা উঁকি মারছিল। খালি থালা, প্যাকেট একপাশে সরিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়েছিলুম। ঘাড়ে, মাথায় জল দিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা হতে হবে।

মিনিট পাঁচ সাত বাদে ঘরে ঢুকে দেখলুম, মঞ্জরী আকাশের দিকে তাকিয়ে বিছানার ওপর বসে আছে। ফ্যানের হাওয়ায় একগুচ্ছ দলছুট চুল ওর কপালে

মাতামাতি করছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি চেয়ারে বসতেই বড়ো বড়ো ফোঁটায় চড়বড় শব্দ তুলে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। জাঁকালো বৃষ্টি। তপ্ত পীচের রাস্তা থেকে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার সঙ্গে সিক্ত পৃথিবীর গন্ধ এসে ভারী করে তুললো আমাদের ঘরের বাতাস।

বাড়ী ফিরবো কি করে—রহস্যমাখা গলায় মঞ্জরী প্রশ্ন করেছিল।

নাই বা ফিরলে—আমি বললুম।

আহা—আমার কাঁধে আলতো হাতে মঞ্জরী ঘুঁসি মারলো! তারপর চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো—বালিসের তলায় ওটা কি বই?

সামান্য চমকে উঠেও সহজ গলায় আমি বললুম—দ্যাখো না।

অসভ্য—মঞ্জরী ফিসফিস করলো।

অবাক চোখে মঞ্জরীর দিকে তাকিয়ে আমি দেখলুম, ওর মুখের রঙ বদলে গেছে। চোখের মণি দুটো কেমন গলাগলা, শুকনো ঠোঁট, নাকের ডগায় ঘাম। আমার রক্ত হঠাৎ বেসামাল হয়ে গেল। ঘুলিয়ে গেল সব কিছু, আমার আদর্শ, নীতি, বিবেক, সংযম ধ'সে পড়লো নিমেষে। আমি ভুলে গেলুম, আমার মহৎ, পবিত্র দায়িত্বের কথা। ভুলে গেলুম যে, গত ছমাস যাবৎ আমি ফেরার, হন্যে হয়ে পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে আমাকে। ঘরের মধ্যে ধোঁয়া ধোঁয়া অন্ধকার, আকাশে বিদ্যুৎ, কোথায় যেন কড়কড় শব্দে বাজ পড়লো।

মঞ্জরীর বুকে, মুখে, কালো জ্যোৎস্নার মতো গভীর উজ্জ্বল চুলে ওকে খুঁজতে থাকি। তরমুজের ফালির মতো মঞ্জরীর ঠোঁট ভিজে, লাল। সময় বহে যায়। দেওয়ালে টাঙ্গানো খাজুরাহোর যুগলমূর্তির মতো আমরা পরিতৃপ্ত, পবিত্র হয়ে শুয়ে থাকি। ছ'মাস ধরে জমে থাকা আমার রাগ, উত্তেজনা, আতঙ্ক আর ক্লান্তি কেটে গিয়েছিল। মঞ্জরীর ভিজে চুল শুকিয়ে গিয়েছিল। বিছানায় বসে লালচে রেশমের মতো চুলে ও বিনুনি বাঁধছিল। বাইরে তখনও বৃষ্টির রিমঝিম শব্দ।

ঘরে অন্ধকার ঘন হতে ভাঁজ মিলিয়ে শাড়ী ঠিক করে মঞ্জরী চেয়ারে গিয়ে বসলো। ঘরটা কেমন যেন শব্দহীন, নীরব হয়ে গিয়েছিল। আমরা কেউ কথা বলছিলুম না। ফাঁকা চোখে অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে কি এক কষ্টে আমার কান্না আসছিল। এ আমি কি করলুম? মুহূর্তের উত্তেজনায় একজন মানুষের আদর্শ, বিশ্বাস এভাবে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলে, সে মানুষকে কে বিশ্বাস করবে? দারুণ ঘৃণায় আমার নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে করছিল।

ঘরের গুমোট স্তব্ধতাকে ভাঙ্গার জন্যে আমি মঞ্জরীকে প্রশ্ন করলুম—তুমি বাড়ী ফিরবে কি করে?

চমকে উঠে মঞ্জরী তাকালো আমার দিকে। মঞ্জরী যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। বুঝতে পারলো যে, ওকে বাড়ী যেতে বলছি আমি। আবছা আলোয় ওর মুখে জমে ওঠা বিষাদ আমার নজর এড়ালো না। নিজের বোকামিতে আমি লজ্জা পেয়েছিলুম। তবু মুখে কিছু না বলে বিছানার ওপর বসে আমি একটা সিগারেট ধরালুম। মঞ্জরী বিছানা ছেড়ে মেঝেতে দাঁড়ালো। ঠিক তখনই দরজার বেলটা ঝনঝন করে বেজে উঠতে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল আমার বুক। আজকাল কলিংবেল বা দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনলে আমি ভীষণ ভয় পাই। ধীর পায়ে গিয়ে মঞ্জরী দরজা খুলতে প্রণব ঘরে ঢুকলো। জলে ভিজে সপসপ করছিল প্রণবের শরীর, জল ঝরছিল হাতের ছাতা থেকে। ফ্যাকাসে মুখ, সন্ত্রস্ত গলায় প্রণব বললো —কাল রাতে বিপুল আব গৌতম ধরা পড়েছে। প্রণবের কথায় আমার বুকের রক্ত চলকে উঠলো। শীত শীত ভাব ছড়িয়ে পড়লো শরীরে। গত সন্ধ্যেতেই প্রাচী সিনেমার পেছনে একটা বাড়ীতে ওদের দুজনের সঙ্গে আমি বসেছিলুম। বর্তমান পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্তব্য নিয়ে আমাদের তিনজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। দায়দায়িত্ব, আমরা তিনজনে ভাগ করে নিয়েছিলুম। হঠাৎ আমাব নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ, অসহায় লাগলো। কাল রাতে কি একটা মিটিং সেবে ফেবার সময়ে ওবা ধরা পড়েছে—প্রণব বললো।

টিমেতালে তখনও বৃষ্টি পড়ছিল। সেইদিকে তাকিয়ে আমি চুপচাপ বসেছিলুম। ঘরের মধ্যে সূচিভেদ্য স্তব্ধতা। প্রণব উঠে গিয়ে ঘরের আলো জ্বালাতে আমি মঞ্জরীর দিকে তাকালুম। কি এক লজ্জা আর দুঃখে বুকটা ভারী হয়ে ছিল। মঞ্জরীর চাঁপা রঙেব শাড়ী, শিথিল বিনুনি, টিপ মুছে যাওয়া পরিষ্কার কপালের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, এ আমি কি করলুম? যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বটুয়াটা হাতে তুলে মঞ্জরী বললো—আসি। বাইরে তখনও বৃষ্টি, হু হু হাওয়া, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘনঘন। মঞ্জরী চলে যেতে প্রণব বললো—ছাতাটা নিয়ে মঞ্জরীকে বাসে তুলে দিয়ে আসা উচিত ছিল। বেচারী খুব ভিজবে।

আমি কোন জবাব দিলুম না। আমার সমস্ত চেতনা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল।

মেঘ আর অন্ধকার মিশে ঘনীভূত রাত। বৃষ্টি তখন ধরে এসেছিল। বাইরে সিক্ত পৃথিবীর টুপটাপ, ছপছপ, কুলকুল আওয়াজ। পকেট থেকে একটা ছোট ডায়েরি বার করে প্রণব কি যেন লিখছিল। চেয়ারে বসা ওর শরীরটার ছায়া পড়েছিল দেয়ালে। ভাঙ্গাচোরা তালগোল পাকানো ছায়াটার লম্বা থুতনিটা

বিসদৃশভাবে ঝুলে আছে। কলমটা বন্ধ করে পকেটে রেখে প্রণব বললো— গ্রেপ্তার বাইশ হাজার তিনশো সাতাত্তর। জেলে আর জেলের বাইরে মৃত, সাতশো ছিয়াশি জন।

ফাঁকা চোখে প্রনবের দিকে তাকিয়ে আমি হিসেব শুনলুম। ওর দাদা পিণ্টুর নাম দিয়ে হিসেবের খাতা শুরু হয়েছিল! বছর চারেক আগে বেলেঘাটায় পিণ্টু খুন হয়েছিল। প্রণবের ডায়েরিতে এই সংক্রান্ত আরো নানা হিসেব আছে। সেই মুহূর্তে আমার আর কিছুই শুনতে ইচ্ছে করছিল না। কি এক আগুনে আমি জ্বলে, পুড়ে যাচ্ছিলুম। প্রণবের দিকে মুখোমুখি তাকাবার সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলুম।

প্রণব বললো—একটা ভুল হয়ে গেছে। পরশু যে সাতটা বেওয়ারিশ লাস পাওয়া গেছে, তার হিসেব কিন্তু লেখা হয়নি।

ডায়েরি বার করে প্রণব আমার দিকে তাকাতেই ওর ঘোলাটে দুটো চোখে আমার নজর আটকে গেল। প্রণবকে ঠিক সুস্থ লাগলো না। ওঠার আগে প্রণব বললো—আমি যদি হঠাৎ মারা পড়ি, তুই কিন্তু হিসেবটা রাখিস।

প্রণব চলে যেতেই ঘরের আলো নিভিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। আমার আর নিজের দিকে তাকাবার ভরসা ছিল না। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এলো। আমার প্যাণ্ট, শার্ট, দু'হাত আর বুকে তখনও মঞ্জরীর চুলের মিষ্টি গন্ধ জড়িয়ে আছে। সেই সুবাসে অন্ধকার ভবে গেল।

রাতে আজকাল আমার বার বার ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিশেষ করে গভীর রাতে সদর রাস্তায় হঠাৎ কোন গাড়ী ব্রেক চেপে দাঁড়িয়ে পড়লে, সেই শব্দের ধাক্কায় আমার গোটা শরীর টানটান হয়ে ওঠে। তারপর বহুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে জেগে থাকি। সে রাতে আমি অন্য কারণে জেগেছিলুম। আমার পাপ, আমার স্খলন এক বিষাক্ত বজ্রকীটের মতো কুরে কুরে খাচ্ছিল আমাকে। বিছানা, বালিস যেন কাঁটার মতো বিঁধছিল, আর বার বার মনে পড়ছিল মঞ্জরীর বিষণ্ণ মুখ। মঞ্জরীকে কেন আমি বাঁচাতে পারলুম না। আমার আদর্শ এবং বিশ্বাসকে কেন আমি এভাবে জলাঞ্জলি দিলুম। আমি কি লম্পট, নীতিহীন, নিছক বাক্যবাগীশ? কি এক শুষ্ক কান্নায় আমার দম আটকে যাচ্ছিল।

মেয়েদের সম্বন্ধে কোনদিন আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। অন্ততঃ দিনেরবেলাতে তো নয়ই। সারাদিন কাজের চাপে এমন ব্যস্ত, বিব্রত থাকি যে মেয়েদের দিকে তাকানোর পর্যন্ত আমার ফুরসুৎ ছিল না। শুধু রাতে অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুলে আমি বদলে যাই। রক্তের মধ্যে এক ক্ষুধার্ত কুমীর সাঁতার কাটে। দপদপ করে স্নায়ু, শিরা। রক্ত, মাংসের নিবিড় অন্ধকারে ডুবে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু

রাতের এই সব ব্যক্তিগত, গভীর, গোপন আকাঙ্ক্ষা দিনের আলোয় মরে যায়। দিনমানে আমি অন্য মানুষ, শুদ্ধ, সাত্ত্বিক। এভাবে দিনের পুণ্য আর রাতের পাপ নিয়ে আমার সময় কাটছিল। সেই আমি আজ দিনের বেলাতেও পাপ করে ফেললুম। হাতেকলমে সত্যিকারেব পাপ। সারারাত কেঁদেও হয়তো এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। কষ্টে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল।

শ্রীলেখা, দময়ন্তী, কেয়ার মুখ মনে পড়েছিল আমার। কতোবার, কতোদিন তাদের সঙ্গে নিভৃততর সময় কাটিয়েও কখনো কাজের কথার এক পা বাইরে যাইনি। সকলে আমাকে দেবতা ভাবুক, এরকম এক লোভ ছিল আমার। তাই নিজের তথাকথিত শুদ্ধতা সম্পর্কে বানানো অহমিকায় ফুলে থাকতুম আমি। দেবতা না ভাবলেও বন্ধুরা মনে করতো, আমার রসকস নেই, আমি পাথরের তৈরী।

একটা ঘটনার কথা আজও মনে আছে। আমার সহপাঠীদের মধ্যে কে একজন, বোধহয় তরুণ, আমার নামে একটা ভুয়ো প্রেমপত্র লিখেছিল শ্রীলেখাকে। শ্রীলেখা রীতিমত সুন্দরী। তরুণেরও কিছু দুর্বলতা ছিল। শ্রীলেখা বোঝেনি যে চিঠিটা জাল। হঠাৎ একদিন হাতে পেলুম শ্রীলেখার একটা চিঠি। কলেজের সামনে, কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে, নির্জনে আমার হাতে চিঠিটা ও গুঁজে দিয়েছিল। বেশ অবাক হয়েই চিঠিটা খুলে আমি পড়েছিলুম। শ্রীলেখা লিখেছিল যে, আমার প্রস্তাবে সে রাজী।

অস্বীকার করি না যে, ওর দিকে চোরাচোখে কয়েকবার তাকিয়েছি। ভালো লাগতো ওকে দেখে। সেদিনও তুমুল আলোড়ন উঠেছিল মনে। তবু কলেজ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বন্ধুদের দেখে নিমেষে আমি বদলে গেলুম। সকলকে দেখিয়ে শ্রীলেখার চিঠিটা তার সামনেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে বললুম—কলেজটা বৃন্দাবন নয়।

তখন ফাল্গুন মাস। দক্ষিণের হাওয়ায় কাগজের টুকরোগুলো রাস্তায় মাথা খুঁড়তে থাকলো। অপমানিত শ্রীলেখা রক্তাক্ত মুখে মাথা নীচু করে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর শুরু হলো তরুণের সঙ্গে ওর জমজমাট প্রেম। কলেজের শেষ পরীক্ষা তখন হয়ে গেছে।

কেয়া, দময়ন্তীর সঙ্গেও কিছু টুকরো স্মৃতি আছে। কিন্তু সবগুলোই একতরফা। আমার দিনেরবেলার এই বীরত্ব রাতের অন্ধকারে গলে যায়। সারা শরীর জ্বালা করে। যে কোন একজন বান্ধবীর শরীর ছুঁয়ে ভিজে যেতে ইচ্ছে করে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পর পর সিগারেট ফুঁকে যাই। লেনিন, স্তালিন, মাওসেতুং-এর লেখা পড়ে নিজেকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করি। সেই সব মুহূর্তে কি দুর্বোধ্য যে লাগে লেখাগুলো! একটা লাইনও মাথায় ঢোকে না।

য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে ঠিক করলুম যে, এইবার একটা প্রেম করা দরকার। মঞ্জরীর কথা আমার মাথায় ছিল। মঞ্জরীকে খুঁজতে শুরু করলুম। য়ুনিভার্সিটিতে তখন ভর্তির হুল্লোড়। টাকা জমা দেওয়ার কাউণ্টারে একগাদা ফি বুক রয়েছে। আমার ফি বুকটা নিতে গিয়ে দেখলুম যে, মঞ্জরীর বইটাও সেখানে রয়েছে। দুটো ফি বুকই পকেটে ঢোকালুম।

মাস কয়েক আগেই মঞ্জরীর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়েছিল। মিনিট দশেকের জন্যে। অনেক রাস্তা হেঁটে, সারা রাত প্রায় না ঘুমিয়ে, এক বুক উদ্বেগ নিয়ে সেদিন প্রথম ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম। তখন চারপাশে ব্যাপক ধরপাকড়, সন্ত্রাস। আমাদের দলের অনেক নেতা আর কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছে। পালিয়েছে অনেকে। যারা আছে, তাদের মুখে তালা, কানে তুলো। আমার মন্ত্রগুরু পাড়ার হরিপদদা সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢেকে সেদিন গলির মুখে দাঁড়িয়েছিল। চাপা গলায় ডাকলো আমাকে। বড়ো খারাপ ছিল মনমেজাজ। শ্রীলেখার চিঠি নিয়ে সেই বিকেলেই কেলেঙ্কারিটা হয়েছিল। মনে মনে আমি খুব অনুতপ্ত। কেননা, অনেক রাতে বিছানায় শুয়ে শ্রীলেখার কথা আমি ভেবেছি। তাকে কাবু করার অনেক ফন্দি এঁটেছি। স্বপ্নের মধ্যে কতো বেআইনী খেলা খেলেছি শ্রীলেখার সঙ্গে। সেই শ্রীলেখাকে নিয়ে এরকম একটা বাজে নাটকীয় কাণ্ড বাঁধিয়ে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল আমার। শ্রীলেখার কাছে মাপ চাইবো, দোষ স্বীকার করবো, এইসব ভাবছিলুম। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছিলুম। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুলে আমার মাথাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে যায়। ভাবনা চিন্তাগুলো স্পষ্ট, যুক্তিসম্মত চেহারা নেয়।

হরিদার ডাকে থমকে দাঁড়ালুম।

তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে—ফিসফিস করে হরিদা বললো—চলো কোথাও গিয়ে বসা যাক।

হরিদা চারপাশ ভালো করে দেখে নিল। কাছাকাছি একটা অন্ধকার পার্কে আমরা বসলুম। আমি একটা সিগারেট ধরাতে গেলে চাপা গলায় আমাকে নিষেধ করে হরিদা বললো—এখন নয়। আমার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। সিগারেটের আলোয় কেউ দেখে ফেলতে পারে।

ঘাসের ওপর আমরা বসেছিলুম। অদূরে অন্ধকারে একটা দোলনা নিয়ে বাচ্চারা মাতামাতি করছিল। একজন ফুচকাওলাকে ঘিরে একদল কিশোরী হেসে কুটিপাটি। কাজের কথাটা হরিদা গুছিয়ে বললো। রোগা, কালো, শীর্ণ মানুষটার বোঝানোর ক্ষমতা আছে।

সাঁতরাগাছির রেল কোয়ার্টারের কাছে কোনো এক মুদির দোকানে একটা

কিড্‌স্‌ব্যাগ বোঝাই নিষিদ্ধ দলিল আর কাগজপত্র রাখা আছে। খবর এসেছে আজ রাতে পুলিশ সে দোকানে হানা দেবে। কাগজপত্রগুলো সরানো দরকার। রাত দশটায় দোকান বন্ধ হওয়ার আগেই আমাকে সেখানে পৌঁছোতে হবে।

কথা শেষ করে আমার হাতে একটা খাম দিয়ে হরিদা বললো—এই চিঠিটা দোকানে দিলেই ব্যাগটা পেয়ে যাবে। চিঠিটা দেখলুম। খামের ওপর লেখা ঠিকানাটা অন্ধকারে আবছা দেখা যাচ্ছিল।

দশটার আগেই একটা টেম্পো এসে দাঁড়াবে—হরিদা বললো—ওটা ডানকুনির এক কমরেডের গাড়ি। ব্যাগটা নিয়ে তুমি উঠে পড়বে গাড়িতে।

ছোট একটা কাগজের টুকরো আমার হাতে গুঁজে দিয়ে হরিদা বললো—এই ঠিকানায়, ঢাকুরিয়া ষ্টেশনের কাছে ব্যাগটা পৌঁছে দেবে।

অন্ধকারে হরিদার মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। আকাশের দিকে তাকালুম। ধূসর আকাশে কয়েকটা নিষ্প্রভ তারা জ্বলছিল।

ভয় পেলে নাকি—পার্কের বাইরে এসে হরিদা জিজ্ঞেস করলো।
আমি জবাব দিলুম না। পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে হরিদা আমাকে দিল। রাহা খরচ। ঘড়ি দেখে বুঝলুম, যে, এখনি রওনা হতে হবে। আর বাড়ী ফেরা হলো না। এক প্যাকেট চারমিনার আর একটা দেশলাই কিনে পকেটে ঢোকালুম।

সাঁতরাগাছিতে সেই মুদির দোকান খুঁজে বার করতে রাত ন'টা বেজে গেল। মোটা কালো একটা লোক চুলটুল আঁচড়ে দোকান বন্ধের তোড়জোড় করছিল। চুল বলতে মথায় কিছু নেই। তবু সেই দশ বারোটা চুলেই লোকটা সস্নেহে চিরুনি বোলাচ্ছিল। ফেত্‌তা দিয়ে কাপড় পরা, আদুল গা। দোকানের ভেতর ঝোলা গুড় আর কেরোসিনের গন্ধ। দোকানে কোনো খদ্দের ছিল না। চিঠি পড়ে লোকটা একচমক আমাকে দেখলো। তারপর বললো—ঠিক সময়ে এসেছেন। এখনি ঝাঁপ ফেলে বাড়ী চলে যেতুম।

মুখে চেন লাগানো বেশ বড়ো আর ভারী একটা ব্যাগ ভেতর থেকে এনে দোকানী আমার সামনে রাখলো। চারপাশের নিকষ ঘন অন্ধকারের মধ্যে নজর চালিয়ে আমি একটা টেম্পোর সন্ধান করছিলুম। কিন্তু টেম্পোর কোন হদিশ নেই। সাড়ে ন'টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে মোটা লোকটা চলে গেল। কাগজের বস্তা আগলে সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে টেম্পোর প্রতীক্ষায় আমি রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। চারপাশ নির্জন, নিঃশব্দ। রাস্তায় মানুষজন নেই। কৃষ্ণবর্ণ একটা সন্দিগ্ধ কুকুর অন্ধকার থেকে মাঝে মাঝে বের হয়ে আমাকে শুঁকে আবার

অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল। রেল ষ্টেশন থেকে শান্টিংএর শব্দ আর ইঞ্জিনের হাঁসফাস আওয়াজ ভেসে আসছিল।

ক্লান্তিতে ঝিমঝিম করছিল আমার মাথা। দুটো পা ভারী। আকাশে অনেক তারা। ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছিল। হাওয়া লেগে গাছের পাতায় ঝিলমিল শব্দ বাজছিল।

কিন্তু কোথায় টেম্পো? প্রায় এগারোটা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর টেম্পোর আশা ছেড়ে সেই দুরমুশ ব্যাগটা কাঁধে তুলে, ষ্টেশনে এসে হাজির হলুম। সেখানে শুনলুম যে রাতের শেষ গাড়ী পাঁচমিনিট আগেই ষ্টেশন ছুঁয়ে চলে গেছে। এতোক্ষণে আমার কেমন অস্বস্তি হতে থাকলো, শিরশির করে উঠলো বুক। দুজন টহলদার রেলপুলিশকে প্ল্যাটফর্মের অন্ধকার প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসতে দেখে দ্রুতপায়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালুম। ফাঁকা রাস্তা। জোরালো হেড-লাইট জ্বেলে ঝড়ের গতিতে একটা লরি চলে গেল। সেই ভারী ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকলুম। পথচলতি দু'একজন লোক দেখছিল আমাকে। সাহস সঞ্চয়ের জন্যে আমি পরপর সিগারেট টানছিলুম। বুকের দপদপানি তবু কাটতে চাইছিল না। পুলিসের টহলদার গাড়ী দেখলেই কোন বাড়ীর রকে বা গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছিলুম। ঘোরতর ক্লান্তিতে মাথার নীচে ব্যাগ দিয়ে শুয়ে থাকলুম কিছুক্ষণ। হাওড়া ব্রিজের মাথার লাল আলোটা একসময় চোখে পড়তে বুকে বল পেলুম। কলকাতার কাছাকাছি তাহ'লে এসে গেছি। আর আমাকে কে আটকায়! মাথার ওপর ব্যাগটা পাহাড়ের মতো ভারী ঠেকছিল। যন্ত্রণায় টাটিয়ে উঠছিল, দুটো হাত, পা, কাঁধ। তবু ওই লাল আলো লক্ষ্য করে হাঁটছিলুম আমি। লাল আলোটার কাছে আমাকে পৌছোতেই হবে।

হাওড়া ষ্টেশনের সামনে পৌছে ষ্টেশনের ঘড়িতে দেখলুম রাত প্রায় দেড়টা। ব্রিজের মুখে মোতায়েন দুটো পুলিশ ভ্যান দেখে আমি আর এগোতে ভরসা পেলুম না। ষ্টেশন চত্বরে লোকজন বিশেষ ছিল না। জনা পাঁচেক কুলি গোল হয়ে বসে গাঁজা টানছিল। আমি ষ্টেশনের ভেতরে ঢুকলুম না। শুনেছি ওখানে সব সময়ে সাদা পোষাকের পুলিস থাকে। গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ালুম। ভিজে হাওয়ায় শরীর ভেসে গেল। ঢেউয়ের ছলছল শব্দ উঠছিল। স্রোতের জলে নেচে বেড়াচ্ছিল তারার ঝাঁক। শানবাঁধানো ঘাটে অনেক মানুষ ঘুমোচ্ছিল। ব্যাগটা বুকে জড়িয়ে আমিও সেখানে শুয়ে পড়লুম।

ঘুম ভাঙলো অনেক সকালে। তখনও সূর্য ওঠেনি। ঘাটে স্নানার্থীর ভীড়। দারুণ ক্ষিদে পেয়েছিল। একটা খাবারের দোকানে ঢুকে গরম কচুরি আর চা

খেলুম। ঢাকুরিয়ার ঠিকানাটা পেতে কপালে ঘাম জমে গেল। তখন সূর্য জেগেছে। কড়া নাড়তে এক তন্বী দরজা খুললো। বিস্ময়ের চোখে সে দেখলো আমাকে। নিশ্চয়ই আমাকে তখন চোরের মতো দেখাচ্ছিল। চিরকুটে যে ভদ্রলোকের নাম লেখা ছিল, তিনি এসে আমাকে বাড়ীর ভেতরে ডেকে নিলেন। বললেন এ আমার ভাইঝি মঞ্জরী।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার তো কাল রাতেই আসার কথা ছিল।
আমি সংক্ষেপে সব ঘটনা জানাতে ভদ্রলোক অবাক হলেন। ডাগর চোখ মেলে মঞ্জরী দেখছিলো আমাকে। কথা প্রসঙ্গে জানলুম যে, মঞ্জরীও এবছর য়ুনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে।

মঞ্জরীর ফি বুকটা পকেটে নিয়ে ওর প্রতীক্ষায় রোজ দুপুরে য়ুনিভার্সিটির সদর দরজায় বসে থাকতুম। নিশ্চয়ই ও আসবে একদিন। কখনও মনে হতো, মঞ্জরী চিনতে পারবে তো আমাকে ? কিংবা আমি মঞ্জরীকে ? মঞ্জরীর মুখটা স্মরণে আনার চেষ্টা করতুম। একটা আবছা পেন্সিল স্কেচের কখনও ওর চোখ কখনও বা নাক কিংবা চিবুক চোখের সামনে ভেসে উঠতো। বাইরে খাখা রোদ। হঠাৎ মেঘ জমে কোনোদিন তুমুল বৃষ্টিতে ধূসর দেখাতো চারপাশ। সেই কয়েক মিনিটের দেখা মঞ্জরীকে বৃষ্টির সীমাহীন কুয়াশার মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে নিজের চেতনার গভীরে মূর্তিময়ী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতুম। আমি জানতুম যে, অসুবিধে হবে না। মঞ্জরীর দুটো চোখ ভোলার নয়।
মঞ্জরীর সঙ্গে দেখা হ'লো শেষপর্যন্ত। ফি বুকটা এগিয়ে দিতে মঞ্জরী বললো. আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান। ভয় হলো, বোধহয় হারিয়ে গেছে।
ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে আমি প্রশ্ন করলুম, রাগ নেই তো ?

চোখে আলো ছড়িয়ে মঞ্জরীও হাসলো। মঞ্জরীর ওপর পুরোনো আকর্ষণটা কয়েকদিনেই গাঢ় হয়ে উঠলো। কোমর বেঁধে সাতদিনের মাথায় প্রেম নিবেদন করলুম। তড়িঘড়ি করা আমার স্বভাব। দেরি করলে, সবকিছু হয়তো হারিয়ে যাবে, ফসকে যাবে, এই রকমের একটা ভয়ও ছেলেবেলা থেকে আমার আছে। ব্যাপারটাকে আরো পাকাপোক্ত করার জন্যে রেস্টুরেন্টের অন্ধকার কামরায় প্রথম হপ্তাতেই চুমু খেলুম ওকে। দ্বিতীয় মাসে ছুঁয়ে দেখলুম ওর শরীরের চড়াই উৎরাই। তৃতীয় মাসে জড়িয়ে ধরলুম। পরের মাসে হঠাৎ একদিন মাঝরাতে বাড়ি থেকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল আমাকে।

এই কয়েক মাস মঞ্জরীর সঙ্গে নিয়ম মতো প্রেম করেছিলুম। পাশাপাশি দুটো বাড়িতে ক্লাস হতো আমাদের। হপ্তায় একদিন দেখা করতুম আমরা। হঠাৎ কোনোদিন করিডরে দেখা হয়ে যেত। কিন্তু কথা বলার সুযোগ হতো না।

রাজনীতির তখন তুলকালাম অবস্থা। দম ফেলার সময় ছিল না। বুঝতে পারতুন যে, মঞ্জরী রাগছে। ওর মনে জমছে ক্ষোভ আর অভিযোগ। কিন্তু মঞ্জরী নির্বাক, কিছু বলতো না। নিঃশব্দে হজম করতো আমার জবরদস্তি। আমার ধারণা ছিল যে, মঞ্জরীকে আমি পরিষ্কার বুঝি। ওর বানানো সংকট দেখে তাই হাসি পেত। ওর জন্য বেশী সময় বা মনোযোগ দেওয়ার অবস্থা তখন ছিল না। সেই ঘাটতি মেটাবার জন্যেই অন্ধকার কেবিনে ওর শরীর নিয়ে নিঃশব্দে হৈ চৈ করতুম। অবশ্য সেটা একেবারে ওপর ওপর। মঞ্জরী কখনো সীমানা পেরোতে দেয়নি।

সমস্ত ব্যাপারটা কেমন কাঠকাঠ, যান্ত্রিক লাগতো। চোখের আড়ালে গেলেই মঞ্জরীকে ভুলে যেতুম। দেখা হলে, ঢাকা কেবিনে না বসা পর্যন্ত আমার প্রেমে জোয়ার আসতো না। প্রাণপণে নিজেকে আদর্শ প্রেমিক বানাবার চেষ্টা করতুম। মনে মনে বলতুম, আমায় একটু প্রেম দাও। গাঢ়, গভীর প্রেম।

মঞ্জরী বুঝতো আমার সংকট। আমার প্রেম যে নকল, লোক দেখানো ব্যাপার এতে তার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই বাবদ আমার লজ্জা আর কষ্টের তীব্রতা ও ধরতে পারতো। ওর ধারণা ছিল যে আমি যোগ্য প্রেমিক হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি। ও মেনে নিত আমাকে।

এই সময় পরিচয় হলো কনিকার সঙ্গে। এক ক্লাসে আমরা পড়তুম। বড়ো অদ্ভুত মেয়ে কনিকা, চুপচাপ, শান্ত। কম কথা বলেও যে অনেক বেশী আকর্ষণীয় হওয়া যায়, এটা কনিকা জানতো। কনিকার শরীরে মুখে ছিল চাপা রোদের স্নিগ্ধ জ্বলজ্বলে ভাব। গান গাইতো ভালো। সেই সূত্রেই পরিচয় হয়েছিল। তারপর ও এলো আমাদের সংগঠনে। য়ুনিভার্সিটিতে সারাদিন ছায়ার মতো কনিকা লেগে থাকতো আমার সঙ্গে। কাজের জন্যে যেদিন বাইরে থাকতুম, সেদিন ও একাএকা নিজের মনে য়ুনিভার্সিটি চত্বরে ঘুরে বেড়াতো। সংগঠনের অনেক দায়িত্ব নিশ্চিন্তে চাপিয়ে দিয়েছিলুম ওর ঘাড়ে। প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত ও থাকতো। দু'চারটে মামুলি কাজের কথা হতো। রোজ রাতে কনিকা ফোন করতো আমাকে। রাত দশটা সাড়ে দশটায় ফোন বাজলে বুঝতুম, কনিকার ডাক। নানা ব্যক্তিগত কথা হতো তখন। অবশ্য তার একটাও প্রেমালাপ নয়।

কনিকা প্রশ্ন করতো—একটা গান শুনবে নাকি ?

—শোনাও।

—তুমি কানে রিসিভার লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ো।

—সে কি ?

গান গেয়ে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।
প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো না ওর টেলিফোন। কিন্তু আতঙ্ক ধরে গেল শেষ পর্যন্ত। রোজই দেখা হতো, কথা হতো ফোনে। হঠাৎ দুদিন অন্তর খামে মোড়া মোটা মোটা চিঠি পাঠাতে লাগলো আমাকে। খুঁটিনাটি নানা কথা, জীবনের কিছু সমস্যা আর প্রশ্ন, এইসব হলো ওর চিঠির বিষয়। কোথাও এক লাইনও প্রেম নেই। কনিকাকে আমার কেমন রহস্যময় লাগতো। বুঝতে পারতুম না ঠিক। বিরক্ত হতুম, অথচ এড়ানো যেত না। কোনোদিন ফোন ধরেই কেটে দিতুম, কোনোদিন কড়া কথা শোনাতুম। কাজ হতো না। আবার ফোন বাজতো। সব চিঠিতেই ও লিখতো, জবাবের আশায় থাকবো।
আমি সাড়া করতুম না। কনিকার সঙ্গে সম্পর্কটা এক দুর্বোধ্য ধাঁধার মতো হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আমার অবহেলা বা বদমেজাজ ওকে টলাতে পারলো না। একইভাবে ছায়ার মতো ও অনুসরণ করতে থাকলো আমাকে। কনিকা কি চায় আমার কাছে? ভেবে কুল পেতুম না আমি। ওকে দেওয়ার যে কিছু নেই এটা তো কনিকা ভালো করেই জানতো।
মঞ্জরী আর কনিকা পরস্পরকে চিনলেও কথা বলতো না। মঞ্জরীর সঙ্গে এইসময় আমার একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমার সঙ্গে কনিকাকে জড়িয়ে আমাদের বন্ধুরা নানা গুজব রটিয়েছিল। মঞ্জরী সে সব শুনেছিল। কনিকার সঙ্গে ওর ঠাণ্ডা লড়াইটা বরফের মতো কঠিন আর ধারালো হচ্ছিল। কনিকা ছিল খুব ফর্সা। সাদা তাঁতের শাড়ি পরতো। বন্ধুরা আড়ালে ওকে সিস্টার নিবেদিতা বলে ডাকতো।

মঞ্জরীর বন্ধুরা বলতো—সিস্টার নিবেদিতা একটা ছিনে জোঁক। সব সময় গায়ে লেপটে থাকে। কেউ ফোড়ন কাটতো—প্রশ্রয় না দিলে এ জিনিস হয় না।
একদিন শেষ বেলায় আধো অন্ধকার এক কেবিনে বসে এইসব কথা বলতে গিয়ে মঞ্জরীর দুচোখের পাতা ভিজে গেল। গলা প্রায় বুজে যাওয়ার অবস্থা।
এসব কী—কৈফিয়ৎ চাইলো মঞ্জরী—এভাবে দুজন মেয়েকে নাচাবার মানে কী?
খুব রাগ হচ্ছিল আমার। এক ক্ষুব্ধ অভিমান ঘিরে ধরছিল আমাকে। আমার যে কিছু করার নেই, এটা মঞ্জরীকে বোঝাই কি করে! মেয়েরা বড়ো স্বার্থপর। আমি গুম হয়ে বসেছিলুম। হঠাৎ এক তপ্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন করলো আমাকে। সেই নির্জন কেবিন, গোপনীয়তা আর রহস্য আমার ক্রোধের সঙ্গে মিলেমিশে সটান উত্তেজনার চেহারা নেয়। আমি ভালো কথা ভুলে যাই। আদিম জংলি-দের মতো আমি নিষ্ঠুর হাতে মঞ্জরীর শরীরে বেপরোয়া দামামা বাজাতে থাকি।
রেস্টুরেন্ট থেকে যখন বেরোলুম, চারপাশ অন্ধকার, রাস্তার আলো জ্বলছে।

মঞ্জরীর ক্ষোভ, অভিমান, আমার স্নায়ু শিরার চাপ ও তেজ কখন যেন জল হয়ে গিয়েছিল। মঞ্জরীকে ট্রামে তুলে দিয়ে আমি পার্টি অফিসে চলে গেলুম।

পার্টির উঁচু মহলের নেতা একদিন বললো—এসব কি শুনছি হে?

নেতার গায়ের রঙ রোলিং মিলে তৈরী স্টীল প্লেটের মতো ঝকঝকে কালো। পরণে পরিষ্কার ধুতি, পাঞ্জাবী। চোখে মোটা কাঁচের চশমা। হাতের চেটোয় খৈনির ওপর দুই চাপড় মেরে নেতা ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিল।

কি ব্যাপার—আমি জানতে চাইলুম।

একপলক আমার দিকে তাকিয়ে জিভের ডগা থেকে গুঁড়ো দোক্তা মেঝের ওপর থুথু করে ফেলে নেতা বললো—রাজনৈতিক আদর্শ বড়ো পবিত্র জিনিস। খুব সহজেই জাত যায়। মেয়েমানুষ আর আদর্শের দ্বন্দ্ব বড়ো সাংঘাতিক। ডায়ালে-কটিকাল্ মেটিরিয়ালিজ্মের নিয়ম মানে না।

কিছু বলার ছিল না। বসে রইলুম চুপচাপ। সুরুৎ করে খৈনির রস টেনে নিয়ে নেতা বললো—তোমাকে বিশ্বাস করি। আশা করি, আদর্শকে ভাসিয়ে দেবে না।

তখন ঠিক দুপুর। নীচের রাস্তায় বাঁদর নাচ হচ্ছিল। নেতার সামনে থেকে আমি উঠে গিয়ে জানলায় দাঁড়িয়ে বাঁদর নাচ দেখতে শুরু করলুম।

সেই রাতেই পুলিস তুলে নিয়ে গেল আমাকে। মনে অনেক অভিমান জমে-ছিল। জেলখানায় একা একা বসে সেসব কথা ভেবে মনটা বড়ো উদাস হয়ে যেত। চারপাশে লাল ইঁটের উঁচু দেওয়ালের এপারে বর্শামুখ লোহার পাঁচির বেষ্টনী, শূন্য মাঠ, ঘাস, লতা কম। বুড়ো গাছগুলোতে পাতা নেই। মানুষের হাড়ের মতো বিবর্ণ ফ্যাকাসে ডালপালা। প্রায়শঃ মনে হতো যে, সকলে আমার ওপর অবিচার করেছে। আমার বাবা, মা, দাদা, দেশ, দশ, সরকার, এমন কি মঞ্জরী পর্যন্ত অপরাধী। দিন সাতেক বাদে এই চিন্তাটা ফিকে হয়ে এলো। শরীরের মধ্যে কি এক অস্বস্তি খোঁচা মারতে শুরু করলো। আমাদের পার্টির অনেক লোক ছিল ভেতরে। একসঙ্গে খবরের কাগজ পড়া, আলোচনা, মিটিং, আড্ডা সবই হতো। কিন্তু তার মধ্যেও আমি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেতুম। মাথায় জমে থাকতো পাথরের মতো ভারী এক শূন্যতা। অনেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে ছটফট করতুম। মঞ্জরীর কথা মনে পড়তো। ভারতরক্ষা আইনে আমাকে ধরেছিল। সুতরাং তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়ার আশা ছিল না। দীর্ঘ-মেয়াদী হাজতের কথা ভেবে কষ্টটা আরো টাটিয়ে উঠতো। মঞ্জরীর সঙ্গে বেপরোয়া প্রেম করার দিনগুলোর স্মৃতি মনে পড়তো।

জেলখানায় বসে মনে হতো—ওটা কি সত্যি প্রেম! শুনেছি প্রেমে পড়লে বুকের মধ্যে কেমন আনচান করে, কান্না পায়, বদলে যায় দিনরাতের রঙ। আমার তো

সেসব কিছুই হলো না। সাতদিনের দিন মনে হয়েছিল যে, চুমু খাওয়ার নামই প্রেম। কিন্তু নাম্পে সুখমস্তি। শুধু চুমুতে সুখ নেই। আরো চাই, আরো, আরো। শরীরের নেশায় ডুবে যেতে থাকলুম আমি।
মঞ্জরী কিন্তু বেশীদূর এগোতে দেয় নি। বলতো—মনে রেখো, এটা রেস্টুরেন্ট। একদিন বললো—শরীরটা তবলা নয়, সেতার। বিয়ে হোক, বুঝতে পারবে।
আমি যুক্তি দেখাই নি। জোরও করিনি। শুধু একটা জ্বলন্ত আগুন পিংপং বলের মতো আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত লাফিয়ে বেড়িয়েছে।
জেলে আসার দিনসাতেক বাদে মঞ্জরীর একটা চিঠি পেয়েছিলুম। গভীব অনুরাগ ছিল চিঠিটায়। মঞ্জরী লিখেছিল—শরীরেব যত্ন নিও। দুশ্চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মঞ্জরীর চিঠিটা পড়ে আমার কেমন লজ্জা করছিল। ওর আন্তরিকতার পাশে আমার নিজেকে খুব খেলো মনে হয়েছিল। মঞ্জরীকে অবহেলা করার, দুঃখ দেওয়ার নানা ঘটনা আমার মনে পড়েছিল। মঞ্জবীর মতো একটা নিষ্পাপ, সরল মেয়েকে আমি বোধহয় ঠকাচ্ছি। এক কষ্টকর পাপবোধে আমি ভুগতে থাকলুম। মঞ্জরীকে একবার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল। অন্ধকার কুঠরিতে নিঃশব্দে চীৎকার করতুম—আমার বুকে একটু প্রেম দাও।

মনের সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার কথা আমি তখন ভাবতে শুরু করেছি। মেয়েদের শরীর ফুলের মতো। জোর করে পাপড়ি খোলা যায় না। অনেক চমৎকার সংলাপ ফুলের তোড়ার মতো মঞ্জরীর জন্যে আমি বাঁধতে লাগলুম। মঞ্জরীর দুঃখ এবং অভিমানের ন্যায্যতা আমি বুঝতে পারলুম। গর্দভের মতো কারবাইড দিয়ে আমি প্রেম পাকাতে চেয়েছিলুম।
আমার জেলের বন্ধ গরাদের সামনে রাতের পাহারাদার বিড়ি টানতো। আড়-চোখে দেখতো আমাকে। হাতের লম্বা লাঠিটা দেওয়ালে হেলিয়ে রেখে তাতে ঠেস দিয়ে অবলীলায় ঘুমোতো। জেলের পেটা ঘড়িতে রাত দুটো বাজার শব্দ হলে একটা পেঁচা অন্ধকারের মধ্যে ডেকে ডেকে উড়ে যেত। আমার ঘুম আসতো না।

জেলের মধ্যে আমার মনমরা ভাবটা অনেকের চোখে পড়তো। কেউ জিজ্ঞেস করতো—শরীর খারাপ নাকি ?

ঠাট্টা করতো অনেকে। দিন শেষ হয়ে এলে পশ্চিম আকাশে খুনখারাপি রঙ ধরতো। বিরাট নিমগাছটার তলায় বসালে গায়ে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতো। শান্তিপুরের মনুদা পাশে এসে বসতো। আকাশের দিকে নিঃশব্দে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে বলতো—মন খারাপ করে জেলে থাকা যায় না। বিয়ের সাতদিন

পরেই আমি ঘরছাড়া হয়েছিলুম। এক বছর লুকিয়ে থেকে ধরা পড়ে গেলুম। অবাক চোখে মনুদার দিকে তাকাতে মনুদা হেসে বললো—কল্যাণীর সঙ্গে আমার দশ বছর ধরে ভালোবাসা। বিয়ের পর কোথায় যাবো, কি করবো, এই সব নিয়ে বহু সাধ ছিল।

একটু থেমে প্রায় স্বগতোক্তির ভঙ্গীতে মনুদা বললো—মোহ কাটাতে হবে।

আমার কাঁধে সামান্য ঝাঁকুনি দিয়ে মনুদা চৌকোর দিকে চলে গেল। মনুদা ছিল আমাদের চৌকোর ম্যানেজার। ভালো রাঁধতে পারতো।

কি যেন একটা মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে, একথা প্রায়ই ভাবতুম। বড়ো হেলাফেলা করে ওপর ওপর দেখেছি জীবনটা। জেলে বসে গভীরতর অন্য এক জীবনের ইঙ্গিত পেলুম। কিন্তু সেটা তখনও আবছা, ভাসাভাসা। পরিষ্কার করে ভাবতে বা বুঝতে গেলে বুদ্ধি কেমন ঘুলিয়ে যেত।

বন্দীদশাতেই শুনলুম যে, কনিকার বুদ্ধিও ঘুলিয়ে যাচ্ছে। দিন তিনেক আগে বিশু ধরা পড়েছিল। বিশুই বললো, যে, কনিকার মাথাটা বিগড়ে গেছে। কোন এক তান্ত্রিকের কাছে কিছুদিন ধরে কনিকা যাচ্ছিল। কাকে যেন মারণ বাণ মারার জন্যে ও সাহায্য চেয়েছিল তান্ত্রিকের কাছে। হাতের বটুয়ায় কনিকা একটা ধারালো ছুরি রাখতে শুরু করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত তান্ত্রিকের জাদুতে কনিকা নিজেই ঘায়েল হয়ে গেল। শোনা যায়, তান্ত্রিকের সাধনসঙ্গিণী, ভৈরবী হয়েছিল সে। দিনরাত পড়ে থাকতো তান্ত্রিকের ডেরায়। করোটিতে ভরে কারণ খেত। বাড়ির লোকেরা দিন কয়েক আগে কনিকাকে রাঁচির পাগলা গারদে দিয়ে এসেছে। কনিকার খবর শুনে কষ্ট পেয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, কনিকা ব্যাগে ছুরি নিয়ে ঘুরতো কেন ? ও কি কাউকে খুন করতে চেয়েছিল ? বাণ মারার বাসনাই বা ওর ছিল কাকে ? অথবা কনিকা নিজেই খুন হওয়ার আতঙ্কে ভুগছিল ?

দুঃস্বপ্নে মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতুম, যে, সেলের লোহার গরাদে চাঁদের আলো লেগে আছে। হেলানো লাঠিতে ঠেস দিয়ে সিপাই ঘুমোচ্ছে। নিমগাছের পাতা হাওয়ায় কাঁপে। নিঃসঙ্গতার চাপে মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসতো। হপ্তায় একদিন বাড়ীর লোকেরা, লোক বলতে বাবা অথবা মা, দেখা করে যেত। মঞ্জরীর সঙ্গে একবার দেখা করার ভীষণ ইচ্ছে হতো। অস্থির হতুম। বিকেল হলে, ইণ্টারভ্যুর সময়ে একবুক প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকতুম। রোজ মনে হতো, আজ হয়তো মঞ্জরী আসবে। জেল গেট থেকে চিরকুট হাতে কোনো মেটকে আসতে দেখলে বুক গুড়গুড় করতো। নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে মঞ্জরী এসেছে। মঞ্জরী আসতো না। আমার অন্তরাত্মা কি এক কান্নায় মুষড়ে উঠতো।

মঞ্জরীর চোখ দুটো মনের মধ্যে সব সময় ভাসতো। কি এক দুঃখ আর কারুণ্য ওর দুচোখে কাজলের মতো লেগে আছে। দু'মাস কেটে গেল। মরা গাছ-গুলোর ডালপাতায় সবুজ, কচি পাতায় ভরে উঠেছে। অদ্ভুত এক হাওয়া বইতে শুরু করলো। রক্তের মধ্যে চনমনে ভাব। এর মধ্যে পুরোনো ক্ষিধে বা যন্ত্রণা ছিল না, কেমন এক স্বপ্নাবিষ্ট, গভীর আলোড়ন। যতোদিন মঞ্জরীর কাছাকাছি ছিলুম, ওকে ভালো করে দেখিনি, বুঝিনি। নিজের কাজে ডুবে ছিলুম। কয়েদখানায় বসে তাই অনুতাপ জাগতো। সহবন্দীদের নানা আলোচনা, বিতর্কে কোন রস পেতুম না। হৃদয়পাত্রটা হঠাৎ যেন ফুটো হয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্না ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া সেলের গরাদ পেরিয়ে দেহে লাগলে মনে হতো, এখন যদি একবার বাইরে যেতে পারতুম ময়দানের নরম, সবুজ ঘাসের ওপর মঞ্জরীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকার সুযোগ পেতুম!

এক বিকেলে একজন মেট এসে আমার নাম ধরে হাঁক দিতে আমার হৃৎপিণ্ডটা ধক ক'রে উঠলো। গায়ে জামা চাপিরে জেল অফিসে গিয়ে দেখলুম, যে, মঞ্জরী বসে আছে। নিভৃত ঝর্ণার মতো কি এক সুখ আমার বুকের মধ্যে কুলকুল করে বইতে লাগলো। শীতল স্নিগ্ধ তার জল। স্রোতস্বিনীর ছলছল কলকল শব্দে আবহলোকে সেতার বেজে উঠলো। দুজনে মুখোমুখি বসার পর আমি অবাক চোখে মঞ্জরীকে দেখতে থাকলুম। কয়েক প্যাকেট সিগারেট আমার সামনে টেবিলের ওপর মঞ্জরী রাখলো। অদূরে চেয়ারে বসে সাদা পোষাকের এক অফিসার নজর রাখছিল আমাদের ওপর। মঞ্জরীর চোখে, মুখে খুশীর ঝিলিক, যেন মেঘরোদ্দুর খেলা করছিল।

দেখা করার কতো ঝামেলা—মঞ্জরী বললো—গত দু'মাসে কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্যে প্রায় দশবার ধর্ণা দিয়েছি।

মঞ্জরী হাসছিল। আমার কথা আটকে গিয়েছিল। শুধু বলতে ইচ্ছে করছিল—তুমি না এলে আমি হয়তো মরে যেতুম।

মঞ্জরীর কথা বলার সঙ্গে কি এক অলৌকিক বাজনার ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ছিল ঘরের মধ্যে। আমি চুপচাপ শুনছিলুম।

তুমি খুব গম্ভীর হয়ে গেছো—মঞ্জরী বললো—বড়ো শুকনো দেখাচ্ছে তোমাকে। খেতে দেয় তো?

গলা খাঁকারি দিয়ে পুলিস অফিসার জানালো যে, এসব আপত্তিকর প্রশ্ন করা চলবে না। মঞ্জরী চমকে উঠতে আমি হাসলুম। মঞ্জরীর ঘন চুলে আমার হাত বোলাতে ইচ্ছা করছিল। অফিসারটার টিকটিকির মতো ড্যাবডেবে দৃষ্টির সামনে পারলুম না। আমি বললুম—বেশ আছি। এবার বোধ হয় ছেড়ে দেবে।

এসব কথাই বানানো। তবু এই বানানো কথা শুনেই মঞ্জরীর মুখে খুশী ছড়িয়ে পড়লো। বাইরেব অনেকের কথা মঞ্জরীকে জিজ্ঞেস করলুম। মঞ্জরীও নানা খবর দিল। শুধু কনিকাব প্রসঙ্গটা কেউ তুললুম না। এড়িয়ে যাওয়াটা দুজনেই বুঝতে পারলুম।

একসময় অফিসার বললো— সময় হয়ে গেছে।

মঞ্জরী উঠে দাঁড়ালো। আমিও ভেতরে ঢোকার জন্যে এগিয়ে গেলুম। পেছন ফিরে আর একবার মঞ্জরীকে দেখার তীব্র ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে সংবরণ করলুম। কি জানি, পেছনে তাকালেই হয়তো বুকের সেই উদ্দাম ঝর্ণাটা দুচোখে উপচে উঠবে! কিন্তু বুঝতে পারছিলুম যে, জেলখানার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে মঞ্জরী তাকিয়ে আছে আমার দিকে। জেলের ভেতরের সেই ঝাঁকড়া নিমগাছটার তলায় এসে মনে পড়লো যে, মঞ্জরীকে অনেক কথা বলার ছিল।

ছ' মাস বাদে জেল থেকে ছাড়া পেলুম। বাড়ীতে বন্ধুদের ভীড় লেগে গেল। নেতারা ঘনঘন তলব পাঠাতে লাগলো। এক সন্ধ্যেয় মঞ্জরীকে নিয়ে ময়দানের সবুজ ঘাসের ওপর বসলুম। ভিজে হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি হবে হয়তো। আকাশে তারা জ্বলছিল দু'একটা। মঞ্জরীর শাড়ি আমার কনুই ছুঁয়ে ছিল। ওর শরীর আর চুল থেকেউড়ে আসছিল মিষ্টি গন্ধ। কেবিনের অন্ধকার খুপরি ঘরগুলোর কথা ভাবলে এখন আমার গা ঘিন ঘিন করে।

কি ভাবছো—মঞ্জরী প্রশ্ন করলো।

—কিছু নয়।

আকশে বিদ্যুৎ চমকালে মঞ্জরী বললো—চলো, ওঠা যাক, বৃষ্টি আসবে।

দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে মেট্রোর কাছে আসতেই তুমুল বৃষ্টি নামলো। আশ্রয়ের খোঁজে পথচলতি মানুষেরা পড়িমরি দৌড় লাগালো। তাড়াতাড়ি একটা রিক্সা ডেকে আমরা দুজনে উঠে বসতে রিক্সাওলাকে মঞ্জরী বললো—তালতলা। বৃষ্টির হাত থেকে আমাদের বাঁচাবার জন্যে রিক্সাওলা তার গাড়ীর সামনে পেছনের পর্দা ফেলে দিল। রাস্তা ফাঁকা। অঝোর বৃষ্টি। রিক্সাওলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৃষ্টিও ছুটে চলছিল আমাদের সঙ্গে। রিক্সার ফাঁক ফোকর দিয়ে মিহি জলকণিকা এসে সিক্ত করছিল আমাদের। রাস্তার লাইটপোস্টগুলো অসহায়ের মতো ভিজছিল। মঞ্জরী হঠাৎ ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে এনে আমার ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ালো। কি নরম, ঘন, পবিত্র স্পর্শ! আমি নিষ্পাপ, কলুষমুক্ত হয়ে গেলুম।

এর মধ্যে ঝড় উঠলো রাজনীতিতে। দলে ভাঙ্গন দেখা দিল। আমাকে শিখণ্ডি খাড়া করে পার্টি নেতারা অধিকাংশ ছাত্র, যুব, তরুণ কর্মীকে দল থেকে তাড়াতে শুরু করলো। কিছু বয়স্ক কর্মীও ছাঁটাই হলো। বিতাড়িত লোকের

সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেছনে সমর্থকদের ভীড়ও কম হলো না। খেলা জমে উঠলো। আমাদের নামে ভয়ঙ্কর সব অভিযোগ চাপা গলায় কানে কানে ছড়িয়ে পড়লো। দারুণ আতঙ্কে আমার দিন কাটতে থাকলো।
এক সন্ধ্যেতে মঞ্জরী জিজ্ঞেস করলো—কি শুনছি ?
যা শুনছো, সব ঠিক নয় আমি বললুম, পার্টির নেতারা সুকৌশলে আমাদের পুলিসের হাতে তুলে দিতে চাইছে।
কেন—মঞ্জরী প্রশ্ন করলো।
—ওরা ভয় পায় আমাদেব। ঢরঢরে বুড়ো পঙ্গু, স্থবির এবং চাকরবাকর চরিত্রের কিছু ছাত্র যুবক ছাড়া ওরা কাউকে বিশ্বাস করে না।
মঞ্জবীর চোখে বিষন্নতা নামলো। ও বুঝেছিল, যে, আমার স্বাধীনতা এবং পরমায়ু শেষ হতে চলেছে।
মঞ্জরীকে সাহস দিয়ে আমি বললুম—ঘাবড়িও না। রাজনীতিতে এরকম হয়। আমি চাইছিলুম, যে, অমার কাজ, বিশ্বাস, আদর্শ নিয়ে মঞ্জরী প্রশ্ন তুলুক, তর্ক করুক আমার সঙ্গে। মঞ্জরী কিন্তু সেরকম কিছু করলো না। কিছু সময় চুপ করে থেকে বললো—চলো, আমার সঙ্গে কলকাতাব বাইরে।
অবাক হয়ে আমি প্রশ্ন কবলুম—কোথায় ?
বর্ধমানের একটা স্কুলে আমি কাজ পেয়েছি—মঞ্জরী জানালো—তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।
আমি রোমাঞ্চিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম—এভাবে গেলে লোকে কি বলবে ?
নীচু গলায় মঞ্জবী বললো—যেভাবে গেলে লোকে কিছু না বলে, সেভাবেই যাবো। ব্যবস্থা কবো।
তিন দিন বাদে গভীব রাতে আবার পুলিস এলো আমার বাড়ীতে। গোটা পৃথিবী তখন ঘুমে অসাড়। কড়া নাড়ার জোরালো শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আগে থেকেই জানতুম যে, এরকম কিছু ঘটবে। বাড়ীর পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার ব্যবস্থা করা ছিল। দাদা গেল সদর দরজা খুলতে। ঘুম চোখে পেছনের দরজা খুলে অন্ধকার, চোরাগলিতে আমি মিলিয়ে গেলুম।
ছ'মাস হলো, সেই থেকে আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমার বেশীর ভাগ বন্ধু এখন জেলে। আমি নিজে বার দুই ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি। একদিন দুপুরে মঞ্জরীদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে সাদা পোষাকের দু'জন পুলিসের একেবারে মুখোমুখি। সন্দেহক্রমে ওরা নজর রেখেছিল ওখনে। কিন্তু আচমকা আমাকে সামনে দেখবে, এটা ওরা ভাবেনি। বরাত জোরে, ঠিক তখনই মঞ্জরীর মাসতুতো দাদা, সেখানে এসেছিল একটা ট্যাক্সি নিয়ে। নজরদারেরা কিছু করার আগেই সেই ট্যাক্সিটা চেপে আমি হাওয়া হয়ে গিয়েছিলুম।

দ্বিতীয় দফায়, ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসের সামনে থেকে পালাতে হ'লো। মঞ্জরী ব্যবস্থা করেছিল, আইনী বিয়েটা চটপট চুকিয়ে ফেলার। আর দেরী করাও সম্ভব ছিল না। রেজিস্ট্রারের অফিসটা দূর থেকে দেখেই আমার মাথার মধ্যে সেই অদৃশ্য রাডারটা নড়ে উঠলো। বুঝলুম, খবর হয়ে গেছে। তিনবন্ধু সমেত রেজিস্ট্রার অফিসে আমার প্রতীক্ষায় প্রায় ঘণ্টা দুই বসে মঞ্জরী বাড়ী ফিরে গিয়েছিল। মাসখানেকও হয়নি এই ঘটনা।

দু'মাস আগের সেই দুপুরের ঋণ শোধ করছি। নিদারুণ অনুশোচনায় আমার অস্তিত্ব ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আজকের মতো, সেদিনও এমনই ঝলসানো রোদ, নির্জনতা, কাকের ডাক। স্রেফ একটা একটা বই পড়ে অথবা অন্য কোনো অজ্ঞাত কারণে আমার আত্মমগ্ন সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল। শুকনো মুখ, বিষন্ন চোখ, ঠোঁট টিপে মঞ্জরী একদিন দুর্ঘটনার খবরটা আমাকে দিয়েছিল। তারপরেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলুম আমরা। কিন্তু সে পরিকল্পনাও নিষ্ফল হলো। বুকের মধ্যে সেই ঝর্ণাটার কুলকুল শব্দ আর শুনতে পাইনা। নিদারুণ রুক্ষতায় দু'চোখ সবসময় জ্বালা করে। হপ্তাখানেক আগে মঞ্জরীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। প্রণবও ছিল। ঠিক হয়েছে, যে, আজ এই বাড়ীতে রেজিস্ট্রারকে এনে সইসাবুদের কাজ শেষ হবে। অনেক খরচ তবুও উপায় নেই। মঞ্জরীকে রক্ষা করতেই হবে। চারটে নাগাদ রেজিস্ট্রারকে নিয়ে প্রণব আসবে। মঞ্জরীর দুপুরেই আসার কথা।

নীচের রাস্তায় পরপর বাস চলে যায়। ধূলোয় ডুবে যায় চারপাশ। আমি ভাবি, এখন ধরা পড়ে গেলে কি হবে? কে দেখবে মঞ্জরীকে? যে শিশু পৃথিবীতে আসছে, কি হবে তার পরিচয়? মঞ্জরীকে আমি যেন এক রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে গেছি। চারপাশে কলঙ্ক, কুৎসিত কথাবার্ত্তা, দুর্গন্ধ আর পাঁক। দেওয়ালে মাথা ঠুকে আমার রক্ত ঝরাতে ইচ্ছে করে। ঘরের মধ্যে আমি দাপাদাপি করি আর নিজের মনে চেঁচিয়ে উঠি—আর একটা বা দুটো দিন সময় দাও আমাকে।

রাস্তায় আবার একটা বাস থামলো। মঞ্জরী নামলো না। বিছানায় বসে আমার মাথা ঝিমঝিম করে। ক্লান্তি জড়ানো দুচোখ ঘুমে ভারী হয়। হাই তুলি। সজাগ থাকার চেষ্টা করি। তবু রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘুমে দুচোখ বুজে আসে।

দরজার লোহার কড়ায় হঠাৎ তীব্র ঝনৎকার উঠে। উগ্র আওয়াজ তুলে একনাগাড়ে কলিং বেল বাজতে থাকে। বিছানায় লাফিয়ে উঠি। খোলা জানলা দিয়ে নীচে তাকাতেই সাদা পোষাকের এক গোয়েন্দা অফিসারের চোখে আমার চোখ পড়ে। দরজার কড়া, কলিং বেল নিরবচ্ছিন্নভাবে বেজে যায়।

দরজা খুলতেই পালোয়ান গোছের একজন লোক দ্রুত হাতে আমার কোমরে দড়ি আর দুহাতে হাতকড়া লাগিয়ে দিল। সামনে পেছনে পুলিস পাহারা নিয়ে নীচের রাস্তায় নামি। রাস্তায় বেশ ভীড় জমে গেছে। সকলে দেখছে আমাকে। পুলিস ভ্যানে ওঠার আগেই মঞ্জরীকে দেখতে পেলুম। দিনান্তের রক্তাভ টলটলে সূর্যের আলোয় ওর বেপরোয়া, ঝলসানো মূর্ত্তিতে কি এক দিব্য লাবণ্য স্তম্ভিত হয়ে আছে। ভ্যানের সামনে এসে আমার হাত ধরে মঞ্জরী বললো—দুশ্চিন্তা ক'রো না। সব কিছু সুস্থ, নিরাপদ থাকবে।
বহুদিন পরে আমার বুকের ভেতরের সেই নিভৃত. ঠাণ্ডা, নরম জলের ঝর্ণাটা আকাশচুম্বি উচ্ছ্বাসে উথলে ওঠে।

সুবলের হৃদয় ও ডাঃ কালিদাস পাল

কালিডাক্তার তার ঠাকুর্দা রামশরণ কবিরাজের ব্যাগ বইতো। সেই সুবাদে ডাক্তার। বাখরাবাজারে তার ডাক্তারখানা। দুটো কাঁচের আলমারি। কাঁচ নেই। সামনে তক্তাপোশ, তার ওপর জলচৌকি। দোকানের একপাশে ডাঁই করা কয়লা। লম্বা ওজন পাল্লা ঝুলছে। সারাদিন কালো ধূলো ওড়ে।

খোলার চালের ঘর। তার মধ্যেই রুগি দেখা. কয়লা বিক্রী। দোকানের মাথায় বড়ো সাইনবোর্ড। হলুদ জমিতে লাল হরফ -ধন্বন্তরি ক্লিনিক ও পঞ্চানন্দ কোল শপ। স্বত্বাধিকারী ডাঃ কালিদাস পাল। প্রখ্যাত কবিরাজ রামশরণ পালের পৌত্র। সাং+মোঃ—বাখরাহাট।

হপ্তায় তিন দিন ও সুবলকে ইনজেকশন দেয়. পেনিসিলিন। ইনজেকশন দিতে ওর হাত কাঁপে। ওষুধভর্তি সিরিঞ্জ কপালে ছুঁয়ে চোখ বুজে ইষ্টমন্ত্র জপে নেয়। দেওয়ালের দিকে তাকায়। ওখানে কুলুঙ্গিতে একটা কালির পট. পেতলের সিংহাসনে সিদ্ধিদাতা গণেশ। সুবলের মা সকালসন্ধে ফুল জল দেয়। সুবলের দাবনাটা টিপে টিপে ডাক্তার দেখে। তারপর কাঁপা হাতে ছুঁচ ঢোকায়। অনেক-দিন দু-তিনবার ছুঁচ ফুঁড়তে হয়।

ডাকতার বিড়বিড় করে—বড়ো মোটা ওষুধ।

সুবল দাঁত টিপে শুয়ে থাকে। বড়ো কষ্ট। সিরিঞ্জ যেন আর ফুরোয় না! ইঞ্জেকশন শেষ করে ডাকতার হাঁপায়। কপালে মুখে দরদর ঘাম। ডাকতার রুমালে মুখ মোছে। সাদা রুমাল নিমেষে কালো পতাকা হয়ে যায়।

কালী ডাকতার ঘামলে শরীর থেকে আলকাতরা বেরোয়।

এক কাপ গরম জলে ছুঁচ, সিরিঞ্জ ডুবিয়ে ডাকতার ওর নাড়ী দেখে জিজ্ঞেস করলো—লাগলো নাকি ভাইপো?

সুবল একটা আবছা শব্দ করে। এতোক্ষণ পলান দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলো। এবার এগিয়ে এলো। ওর হাতে ডাকতারের কিডস্‌ব্যাগ। পলান একই সঙ্গে কম্পাউণ্ডার এবং মুটে। সারাদিন কয়লা মাপে, বস্তা বোঝাই করে। কখনো মাথায় তুলে পৌঁছে দিতে হয়।

ডাকতার বাইরের বারান্দায় বসলো। কাপের সামনে উবু হয়ে পলান ডাক্তারের সরঞ্জাম সাফ করে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার। দিনের আলো মরে আসছে। এখনো হ্যারিকেন জ্বলেনি।

ইঞ্জেকশন শেষ হতেই মা রান্নাঘরে গিয়েছিল। ডাকতারের জন্যে চা বানাতে হবে।

মাকে শুনিয়ে ডাকতার বললো—ওফ্ ঘরের মধ্যে যা অন্ধকার। যেন অন্ধকারের জন্যেই ওর হাত কাঁপছিলো!

সুবলের কানের কাছে মুখ এনে পলান গুঞ্জন করলো—আর দু-বছর, তারপর আমিও বাজারে ঝাঁপ খুলে বসবো। ডাক্তার পলানচন্দ্র বনু. এবিসিডিইএফজি। ঘর দেখা আছে। পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া। সাইনবোর্ডে'র দরুন পঁচিশ। হলুদ জমিতে লাল বন্নের লেখা। ইঞ্জিকশান দিতে আমার হাত কাঁপবে না। তুমি দেখে নিও।

মা চা নিয়ে এলো। ডাক্তাবের জন্যে কাঁচের কাপ ডিশ। পলানের জন্যে কলাইএর মগ। পলান তাতেই খুশী। দু-হাত বাড়িয়ে চা নিল। বাইরে ডাকতারের মুখে সুরুৎ সুরুৎ শব্দ। ডাকতার বললো—বৌঠানের চায়ের হাতটা বড়ো পাকা।

মা সাড়া দিল না। দেরাজ খুলে দুটো টাকা বার করে দিল। ডাকতারের ভিজিট। সুবলের কানের কাছে মুখ এনে আলতো গলায় জিজ্ঞেস করলো—লেগেছে বাবা? সুবল বললো—না।

পলান ফঁু দিয়ে সিরিঞ্জ শুকিয়ে, সাদা রুমালে মুছে নিল। সুবলকে বললো—আসল কথা জলে ওষুধে মিল খাওয়ানো। কাজটা করতে দম চাই। দু-মিনিটে হয় না। নিদেন পক্ষে চার মিনিট লাগে।

কালি ডাকতার ওষুধের শিশিতে ডিস্টিল্ড ওয়াটার পুরে দু হাতের মাঝখানে রেখে পাক দেয়। পলান দেখে, ঝাঁকুনির চোটে ডাকতার ক্লান্ত হয়। পলান একদিন বলেছিল—আমায় দ্যান বাবু। এক দাবড়ানি দিয়েছিল ডাকতার।

দুটো আলমারির দরকার—পলান বলে, কাঁচ লাগানো আলমারি, সেই সঙ্গে একটা তক্তাপোশ আর জলচৌকি। অনেক ট্যাকার ধাককা। বৌয়ের একটা আলমারি আছে। চাইবো চাইবো করেও পারি না। ডর লাগে। বড়ো দজ্জাল মেয়েছেলে।

বাইরে ডাকতার কথা বলছিল। মাকে অভয় দিচ্ছিল—আর হপ্তাখানেক। তার মধ্যেই সুবলকে দাঁড় করিয়ে দেবো। আমি হলুম গিয়ে রামশরণ কবিরাজের নাতি। তাঁর গায়ের হাওয়া লাগলে মরা মানুষ লাফিয়ে উঠতো।

দরজার পাশে মায়ের শাড়ীর আবছা রেখা। মা নিচু গলায় কি যেন বললো। সুবল জানে, ডাকতারের একটা কথাও মা বিশ্বাস করে না। আড়ালে বলে হাতুড়ে, ঘোড়ার ডাকতার। কিন্তু কিছু করার নেই। কালী ডাকতার সুবলের বাবার বন্ধু। এ বাড়ীতে রোগভোগে সে বাঁধা।

ডাকতার বলে যায়—ঠাকুর্দা বলতেন, গোড়া বেঁধে কাজ করো। রোগের শেকড় উপড়ে দাও। হিলেত বিলেত ফেরৎ আচছা আচছা ডাকতার তাঁর পায়েব তলায় গড়াগড়ি দিতো। আসল কথা রোগ নির্ণয়।

পলান ব্যাগ গুটিয়ে বাইরে যায়।

ডাকতার গলা সাফ করে বললো—ভাইপোর রোগ দু-মাস আগেই ধরেছি। এ রোগের আসল ওষুধ মুকতাভস্ম। এক পুরিয়া খাওয়ালে বাহাত্তর ঘণ্টায় ব্যায়রামের গুষ্টির তুষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু মুকতাভস্ম পাই কোথায়? বাজারে আসল মুকতো নেই। কালচার মুকতো, নকল মাল। ভেজাল ওষুধে রোগ সারেনা। ঠাকুরদার আমলের মুকতাভস্ম বাড়ীতে সামান্য ছিল। এই পলান বেটা একদিন বয়াম খুলে ঢাকা লাগালো না। ব্যস্‌ ইঁদুরে মেরে দিল। বয়াম খালি। ইঁদুরগুলোর কি তাগড়াই চেহারা হয়েছে। বিষ খেয়ে হজম করে দেয়। ছিল নেংটি, এখন হয়েছে ধেড়ে ইঁদুর। বাড়ীর দুটো হুলো বেড়াল পর্যন্ত ভয়ে তাদের কাছে ঘেঁষে না।

মা চুপচাপ শুনে যায়। পলান কাঁচুমাচু মুখে মাথা চুলকোয়। বয়াম খুলে রাখার কোনো ঘটনা ওর মনে পড়ে না। সুবল কান খাড়া করে ডাক্তারের গল্প শোনে। বেশ মজা লাগে।

ডাক্তার আর কম্পাউণ্ডার এক সময় চলে গেল বাইরে। অন্ধকার ঘন হলো। মা এখন রান্নাঘরে। এগারোটা হ্যারিকেন আর সাতটা লম্পর পলতে কেটে জ্বালাতে হবে।

পায়ের কাছে খোলা জানলা। জানলার ওপর আমলকি গাছের কচি চিকন পাতা হাওয়ায় দুলছে। এখন আমলকির সময়। গাছটাতে বড়ো বড়ো আমলকি হয়। কি তাজা, তেলতেলে চেহারা। রস যেন ফেটে পড়ছে। ভোরবেলায় গাছের নীচে দু-চারটে পড়ে থাকে। শিশিরে ভেজা পীতাভ সবুজ রং। সকলের আগে সকালে ওর ঘুম ভাঙতো। তখনও চারপাশে আবছা অন্ধকার। পূর্বদিকের ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের ওপাশে সূর্য উঠছে। অন্ধকার ফেটে গাঢ় লাল রং গড়াচ্ছে। তেঁতুলগাছের ডাল-পালায় কয়েক হাজার হরিয়াল পাখি জেগেছে। তাদের কিচির মিচির ডানা ঝাড়ার শব্দ। ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়া বইছে। মানুষজনের সাড়া নেই। ধূধূ ফাঁকা মাঠে দু-একটা নিঃসঙ্গ বাবলা গাছ। কি অনাথ ভঙ্গী! ঝুঁঝরো সকালে এই আশ্চর্য পৃথিবীটার মালিক ও একা। শরীরটা কেমন যেন সিরসির করতো। বড়ো আরাম লাগতো শ্বাস টানতে। এই ঘন নরম হাওয়া সূর্য উঠলে হারিয়ে যায়।

প্রায় তিন মাস হলো সুবল ভুগছে। একেবারে শয্যাশায়ী। শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, জ্বর। চলতে হাঁটতে পারে না। কাশতে গেলে কষ্ট হয়। বাবা ব্যস্ত

মানুষ। চার চারটে ব্যবসায় ফেল মেরে এখন পাঁচ নম্বর চলছে। হপ্তায় চার-পাঁচ-দিন কলকাতায় থাকে। নারকেল দড়ির কারবার। ভেলি গুড়ের পর এটা শুরু হয়েছে। ঝাঁটার কাঠি, তেঁতুলবিচি, ছোবড়া এবং আরো নানা জিনিস নিয়ে বাবা চেষ্টা করেছে। কোনোটা দাঁড়ায় নি। নারকেল দড়ির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে বাবা বোঝাতো মাকে, দড়ি ছাড়া পৃথিবী চলে না। এই সামান্য জিনিসটা কতো কাজেই না লাগে। একটা বড়ো রকমের অর্ডার পাচ্ছি। মা কথা বলতো না। ফিকে ঘুমের মধ্যে সুবল শুনতো বাবার কথা। কোনো এক সময় মা হয়তো বলতো -আমার জন্যে এক গাছা মজবুত দড়ি এনো। কিছুতে যেন না ছেঁড়ে।

বাবা গুম হয়ে যেত। গল্প আর জমতো না। জমাট অন্ধকারে সুবলের বুকে কি এক দুঃখ ছলছল করতো।

বাড়ীর সামনে মাঠ। অনেক ছেলেমেয়ের গলা। প্রায় জনাপনেরো হাডুডু, বৌ বসন্ত খেলছে। ওরা সকলেই সুবলের খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইবোন। এক বাড়ীতেই থাকে। এক সংসার। ঠাকুর্দা সংসারের কর্তা। অনেক জমিজমা। তাঁর ঘাড়েই গোটা সংসার, এই রাবণের গুষ্টি। ঠাকুর্দা বাপ কাকাদের প্রায়ই গালমন্দ দেয়। নাতিনাতনীদের লাঠি নিয়ে তাড়া করে। বুড়োটার ভয়ে সকলে কেঁচো। ঠাকুমাও চেঁচায়। ঠাকুর্দাকে বলে—ছেলেদের আলাদা করে দাও। রাত আটটা বাজলেই ঠাকুমা সবকটা হ্যারিকেন আর লম্প নিভিয়ে দেয়। বলে- ঢের হয়েছে বাছারা। আর নেকাপড়ায় কাজ নেই। এবার শুয়ে পড়ো। তেল জোগাবে কে। মা কাকিমারা চুপ। কথা বলার হিম্মত নেই। ছেলেপুলেরা শুয়ে পড়ে। অন্ধকারে মেয়েবৌরা মুখ হাত ধোয়, চুল বাঁধে। সাড়ে সাতটার মধ্যে খাওয়ার পাট শেষ হয়। সারা গাঁয়ে এমনিতে সন্ধ্যে লাগলে রাত। শুধু চমো ঝি একটা লম্প নিয়ে অন্ধকার পুকুরঘাটে এক পাঁজা কাঁসার বাসন মাজে। আলোর শিখা হাওয়ায় কাঁপে। বিশাল অন্ধকারে একটুকরো কাঁপা আলো। মনে হয় আলেয়া জ্বলছে।

নিচের মাঠে এখন খেলা শেষ হতে চলেছে। বোধহয় শেষদান। বেশ উত্তেজনা, চড়া গলা। ঝড়ের গতিতে হাডুডুওয়ালা দম ধরে—চু-উ-রে হাতা। পদ্মপাতা। পদ্ম কতদূর? বাদাতে দোয়ালো গাই। পেরোয় রে বাছুর। এইসব সময়ে সুবলের বুকটা হুহু করে। অন্ধকার ঘরে একলা শুয়ে থাকতে বড়ো কষ্ট হয়। সকলে খেলছে। অথচ সে বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছে না। হাঁটু গোড়ালিতে বিষ ব্যথা। হাতের কব্জি, কনুই কনকন করে। কিন্তু হাডুডুতে তার মতো দম কজনের আছে। সেরে উঠে সে খেলবে। একমাস বাদে অ্যানুয়াল পরীক্ষা। সুবলের ক্লাস ফোর হবে।

কিন্তু কি করে সে পরীক্ষা দেবে। লেখাপড়া করার ক্ষমতা নেই। বাড়ী থেকে স্কুল প্রায় এক মাইল দূর। মেঠো পথ। সে দুপা হাঁটতে পারে না। অতোটা রাস্তা যাবে কেমন করে! কালি ডাকতার বলেছে—আর সাতদিন। তারপরেই সে সেরে উঠবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে।

দাঁড়াবে কি? পরীক্ষার কথা শুনে ডাকতার বলেছিল—ব্যথা না কমলে পলানের কাঁধে চেপে যাওয়া আসা করবে। কয়লা বয়ে বয়ে পলানের কাঁধে যথেষ্ট জোর।

কথাটা শুনে সুবলের রাগ হয়েছিল। আমি কয়লার বস্তা নাকি—ও ভেবেছিলো।

হঠাৎ নীচে কে যেন বললো বড়ো কর্তা আসছে।

পালে বাঘ পড়ার অবস্থা। চোখের নিমেষে খেলা শেষ। দুদ্দাড় বাড়ী ঢুকলো সকলে। পুকুরঘাটে হাতমুখ ধুয়ে এবার ওরা পড়তে বসবে। বুড়ো মাষ্টার আসবে অঙ্ক শেখাতে। বড়োদের ইংরিজি পড়ায় সদয়বাবু। সেও আসবে। হাতে পুরোনো হ্যারিকেন। ফাটা কাঁচ। কাগজের তাপ্পি মারা।

সুবলকে আজকাল পড়তে হয় না! স্কুল যাওয়া বন্ধ। কেউ বকে না, ভালো-মন্দ খেতে পায়। দুপুরে ভাতের সঙ্গে রোজ একটা করে বাচ্চা মুরগী খায়। সাত দশ দিনের মোরগ শিশু। কি নরম মাংস। মাথাটা দাঁতে চাপলে বিস্কুটের মতো গুঁড়ো হয়ে যায়। মা গামছা পরে আলাদা উনুনে রান্না করে। রান্নার পর গোবর গঙ্গাজলে সে উনুন নিকোনো হয়। রাতে গাওয়া ঘিয়ের ফুলকো লুচি, আলুভাজা, পটলভাজা। এসব খেলে কলিজা শক্ত হয়। ভাইবোনরা দেখে। তাদের জিভে জল ঝরে। সুবলের মুখে কিছুই রোচে না। মরা ক্ষিদে, মুখ বিস্বাদ, বোদা। মুরগীর মাংস মুখে দিলে বমি আসে। গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে গা গুলোয়। অমন ফুলকো মুচমুচে লুচি, দু' তিনটের বেশি খেতে ইচ্ছে করে না। সেও অনেক জোরজবরদাস্তির পর। আগে বাড়ীতে লুচি হলে উৎসব লাগতো। সারা বিকেল সুবল উপোস দিতো। এককণা মুড়িও দাঁতে কাটতো না। লুচি খেয়ে আশ মিটতো না। ডালডায় ভাজা আটার চাকতি। মাকে বলতো, কয়েকটা রেখো, বাসি খাবো। মা চোখ পাকাতো। এ সংসারে কিছু রাখা না রাখার অধিকার মার নেই। নিজের ছেলের জন্যে দুটো বাসি লুচি রাখাও মুস্কিল। কেউ হয়তো টিপ্পুনি কাটবে—একালষেঁড়ে, আদিখ্যেতা।

কলকাতা থেকে দাদু ফিরলো। পেছনে যতীনকাকা। খোদাবকসের মাথায় ঝাঁকাভর্তি নানা জিনিস। যতীনকাকা ঠাকুর্দার খাস চাকর। দাদুর সিন্দুকের চাবিপত্র তার কাছেই থাকে। বছর পঞ্চান্ন বয়েস। দশাসই কালো চেহারা।

মাথায় কাঁচাপাকা চুল। যতীনকাকা ছাড়া দাদুর সিন্দুকে আর কারো হাত দেওয়ার অধিকার নেই। আগে মাঝে মাঝে মার ডাক পড়তো। সিন্দুকের চাবি মার হাতে দিয়ে দাদু খুলতে বলতো। টাকাকড়ির হিসেব করাতো। এখন আর মা যায় না। দাদুও ডাকে না। বছর খানেক আগের ঘটনা। রাতে শোয়ার আগে মা চুল বাঁধছিল। বাবা বললো—কিছু টাকা হাতাও না। মা অবাক।

তুমি তো বাবার সিন্দুক খোলো। শাড়ির তলায় দু একটা বাণ্ডিল ঢোকালে কে দেখছে—বাবা ফিসফিস করে।

মার মুখচোখ ঝলসে উঠেছিল। বলেছিল—ছিঃ। মায়ের মুখের ভেতর থেকে যেন ধিক্কারটা বেরিয়ে এসেছিল। অন্ধকার কেঁপে উঠেছিল।

বাবা ভয় পেয়েছিল। নিজের মনেই বিড়বিড় করছিল—ভেলিগুড়ের একটা বড়ো চালান আটকে গেছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মা বলেছিলো—উনি আর আমাকে সিন্দুক খুলতে ডাকবেন না।

কেন ?

আমি বারণ করেছি।

বাবা উত্তেজনায় বিছানার ওপর উঠে বসেছিল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না। বাথরুমের চাপে সুবলের ঘুম ভেঙেছিল। কিন্তু উঠল না। মা ঘটনাটা বলেছিল। মা—টাকাকড়ির ব্যাপারে আমাকে আর ডাকবেন না।

ঠাকুর্দা—কেন ?

মা চুপ। যতীনদা দাঁড়িয়েছিল।

যতীনকাকা—পাঁচজনে হিংসে করে। নানা কথা বলে।

ঠাকুর্দা—তুই থাম তো। (গলায় জোর ধমক। তারপর মাকে) তোমায় কে কি বলেছে বৌমা।

মার গলা বুজে এসেছিল। চোখে জল।

যতীনকাকা—বুড়ো বয়েসে তোমার ভীমরতি হয়েছে। এতগুলো ছেলে, ছেলের বৌ, তাদের চোখ টাটাবে না ? তারা খোঁচা দেবে না ?

যতীনকাকার দাবড়ানিতে ঠাকুর্দা থমকে গিয়েছিল। যতীনকাকা মার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিল—তোমার বুড়ো শ্বশুরের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে।

ঠাকুর্দা ফ্যাকাসে মুখে মাথা চুলকিয়ে—বলেছিল—ঠিক আছে। তাই হবে। আর ডাকব না।

বাবা বললো—যোতেদা বুড়োকে বশ করেছে।

মা কি যেন বলতে যায়। তার আগেই সুবল মাকে ডেকেছিল—পেচ্ছাপ

পেয়েছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভুতের ভয় আছে সুবলের।
ঘরের সামনে দালানে খোদাবকস্ ঝাঁকা নামায়। ঠাকুর্দা তকতাপোশে বসে। মাকে ডাকে। যতীনকাকা জিনিসপত্তর নামায়।
ঠাকুর্দা বলে—ছেলে মেয়েদের জামা-কাপড়ের জন্যে এই দুটো থান বড়বাজার থেকে আনলুম। কাল দর্জি আসবে। মাপ নেবে। ফ্রক, জামা মিলিয়ে ছত্রিশটা, আর ইজের ছত্রিশটা। তুমি চিহ্ন করে দিও, যাতে মিশে না যায়।
মা আবছা গলায় সায় দেয়। বছরে দুবার বাড়ীর সকলের পোশাক হয়। একই ছিটের জামা ইজের পরে আঠারোজন ছেলে মেয়ে পূজোর সময় বাজারে ঠাকুর দেখতে যায়। বাজারের লোক হাসে। গা টেপাটেপি করে। বলে বোসবাড়ীর পল্টন। ইউনিফর্ম পরা সেনাবাহিনীর মত ওরা চলে যায়, সুবলের লজ্জা লাগে।

ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করে—ফচকেটা কেমন আছে? ব্যাথা কমেছে?
সুবল বোঝে, ঠাকুর্দা তার খোঁজ নিচছে। মা জবাব দেয়। ঠাকুর্দা ঘরে ঢোকে। বিছানার ওপর হ্যারিকেন তুলে সুবলকে দেখে। মুখ চোখ গম্ভীর হয়ে যায়। ডাকতার দেখছে—ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করে।
মা ঘাড় নাড়ে।
কে?
মা বলে।
ঠাকুর্দা তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে—কালি আবার ডাকতার হলো কবে? একটা বখাটে ছোকরা। ওর ঠাকুর্দা ছিল কোবরেজ। সে কিছু জানত। যত্তোসব…।
মা সাড়া করে না।
ওর বাবা কোথায়—ঠাকুর্দা জানতে চায়।
কলকাতা—মা বলে।
সে এখন কিসের ব্যবসা করছে?
নারকেল দড়ি।
শুয়ার। বাড়ী ফিরলে আমায় ডেকো। চাবকাবো।
বিদ্যাসাগরী চটিতে পটপট আওয়াজ তুলে দাদু নিজের ঘরে চলে গেল।
দাদুর পায়ের শব্দে নাতিনাতনীরা আকাশ ফাটিয়ে পড়া তৈরী করে। রাতে খাওয়ার সময় ঠাকুর্দা আধবাটি ঘন দুধ আর দুটো সন্দেশ সুবলের জন্যে পাঠিয়ে দেয়। যতীনদা নিয়ে আসে। সুবল খেতে পারে না। বমি আসে।
ঘরের বাইরে ভাই, বোন ওৎ পেতেছিল। তারা খেয়ে নেয়। আজকাল সকাল সন্ধ্যে সুবলের খাওয়ার সময় ওর ঘরের সামনে ভিড় জমে। মার ধমকের ভয়ে কেউ ভেতরে ঢুকতে সাহস পায় না।

পরদিন বাবা ফিরল। রাতে মা বেশ কিছুক্ষণ কাঁদলো। বলল -ওকে কলকাতায় বড় ডাকতার দেখাও।
বাবা—হবে। হবে।
কবে? সাতদিন সময় দিলুম। তা না হলে দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব।
বাবা গুম হয়ে বসে থাকে। বাইরে অন্ধকার। আমলকি পাতায় হাওয়ার শব্দ। পুকুর ঘাটে চমো ঝি বাসন মাজে। বাইরের দালানে হঠাৎ ঠাকুর্দার চটির শব্দ শুনে বাবা লাফিয়ে ওঠে। ঠাকুর্দা ভারী গলায় বাবাকে ডাকে। বাবা ভিজে বেড়ালের মত বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুর্দা চেঁচায়—পাজী, শুয়ার, ইষ্টুপিড ছেলের জন্ম দিয়েই খালাস।
বাবা কি যেন বলে। সুবল বুঝতে পারে না।
ঠাকুর্দা বলে—কালীকে যদি এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখি তো ওর ঠ্যাং ভেঙে দেব। ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে যাও। টাকা না থাকলে যতীনের কাছ থেকে চেয়ে নিও।
দালানের শেষ প্রান্তে ঠাকুর্দার চটির আওয়াজ মিলিয়ে যায়। বাবা বাইরের তকতাপোশে বসে থাকে। দালানের বড় ঘড়িতে দশটা বাজল। গোটা গাঁ নিঝুম, ঘুমিয়ে কাদা। অনেক দূরে ভোলার ভাগাড়ে কয়েকটা শেয়াল ডেকে ওঠে। আজ সুবলের শরীরটা বড় খারাপ। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বুকের মধ্যে হাপরের শব্দ। জ্বর বেড়েছে। মা ওর মাথায় হাত বুলোয়। চুলে বিলি কাটে। সুবলের মনে হয় কতদিন সে একা শুয়ে আছে। এই বয়েসে বাত ধরেছে তার। গাঁটে গাঁটে যন্ত্রনা। ইঞ্জেকশনের দরুণ দু কোমরে ব্যথা।
মা ডাকে—শোবে এসো।
মাথা নীচু করে বাবা ঘরে ঢোকে। সবলের কিছুতেই ঘুম আসে না। বুকের মধ্যে কি যেন এক কষ্ট। তালপাতার পাখায় মা ওকে হাওয়া করে।
কাল আবার ইঞ্জেকসন আছে। ডাকতার আসবে। সঙ্গে পলান। ঠাকুর্দা ভীষণ রাগী। সত্যি হয়ত ডাকতারের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেবে। বেচারী ডাকতার। তার জন্যে সারা জীবন খোঁড়া হয়ে থাকবে। সুবলের নিজেকে অপরাধী মনে হয়। এমন অসুখ বাঁধান তার উচিত হয়নি। কালী ডাকতার অনেক চেষ্টা করছে। তবুও সারছে না। পুকুরের ওপারে বাঁশবন। হাওয়ায় বাঁশে বাঁশে ঘষা লেগে হাততালির শব্দ হয়। সুবল চমকে ওঠে।
আসল মুক্তাভস্ম পেলে কালী ডাকতার হয়তো এতোদিনে তাকে সারিয়ে তুলতো। এতো হেনস্তা সইতে হতো না ডাকতারকে। কিন্তু ও বেচারী কি করবে! বাজারে খাঁটি মুকতো পাওয়া যায় না, সব নকল। সুবল ভাবে, সে বড়ো হয়ে ডুবরি হবে। ডিঙ্গিতে চেপে সাত সমুদ্র থেকে মুকতো তুলবে।

বাজারে তখন খাঁটি মুকতোর অভাব থাকবে না। মুকতাভস্মের অভাবে কেউ ভুগবে না। ধোলাই এর হাত থেকে ডাকতাররা বাঁচবে। সস্তায় ভালো জিনিস সে এনে দেবে। অনেকদিন আগে কলকাতায় মামার বাড়িতে গিয়ে সে একটা সিনেমা দেখেছিল। সমুদ্রের তলার ছবি। কি অদ্ভুত জায়গা। ঘন [illegible]। কতো রকমের গাছপালা, মাছ, ছোটো ছোটো পাহাড়। ডুবুরির [illegible] একজন মানুষ মাছের মতো ঘুরছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত [illegible] পিঠে অকসিজেনের ট্যাংক। গভীর জলের তলায় সে যেন [illegible] দেশ। বাজারে ডাকতার কালিদাস ঘোষের দোকানটার কথা [illegible] পড়ে। দোকানের সামনেটা ঘিঞ্জি, ভীড়। কিন্তু আলমারির পেছনে [illegible] আলাদা জগৎ। দুটো মোড়া পাতা। মাটির দেয়ালে একটুকরো জানালা [illegible] নেই। কালো রঙ করা চারটে বাঁখারি লাগানো। এটা দোকানের পেছন দিক। খোলা জানালা দিয়ে অনেকদূর দেখা যায়। একপাশে ধুধু মাঠ। ডানদিকে দত্তদের পদ্মপুকুর। বিরাট দিঘি, ভর্তি জল। রক্তপদ্মের মেলা বসে গেছে। বড়ো বড়ো সবুজ পাতা। ডাকতার একবার পদ্মপাতায় তাকে বোঁদে দিয়েছিল। কি চমৎকার যে খেতে লেগেছিলো। বাঁ হাতে পালের ডাঙা। কতো রকমের অসংখ্য গাছপালা। সবুজ অন্ধকার ঘন হয়ে থাকে। তাল নারকেলের লম্বা গাছ হাতে হাত দিয়ে মালার মতো বাগানটা আগলে আছে। দোকানের সামনে তক্তা-পোশে বসে বাবার সঙ্গে ডাক্তার গল্প করছে। বাবা কথার মাঝখানে হঠাৎ জিজ্ঞেস করতো, ছেলেটা গেলো কোথায় ?

আলমারির পেছনে আছে—ডাক্তার বলতো—সিনারি দেখছে। বড়ো চমৎকার সিনারি। সময় পেলে আমিও দেখি। বড়ো ভালো লাগে। বাবা হেসে জিজ্ঞেস করতো—কবিতা লিখছো নাকি ?

ডাক্তার সাড়া দিতো না।

ডাক্তারের কথাগুলো সুবলের কিন্তু বড়ো ভালো লাগতো। কালী ডাক্তারও এই জানলা দিয়ে তার মতো তাকিয়ে থাকে। কি মজা। ডাক্তার কি দেখে ? সুবলের মতো সেও কি মন্দির দেখতে পায় ? আকাশে যাওয়ার সোনালী রাস্তা ? পদ্মবনে রোদের ঘাঘরা পরে ছায়া ছায়া শরীরে যারা নাচছে, তাদের সঙ্গে কি ডাক্তারের পরিচয় আছে ?

পালের ডাঙায় সবুজ অন্ধকারে হঠাৎ একটা রাজপ্রাসাদ জেগে উঠতো, ব্রোঞ্জ রঙের পাথরে তৈরী। সেখানে ঘণ্টা বাজছে। কতো সব আশ্চর্য্য ছবি। সুবলের ইচ্ছে হতো, কোনোদিন ডাক্তারকে একা পেলে সে জিজ্ঞেস করবে—এই জানলা দিয়ে আপনি কি দেখেন ? নিজের দেখা ছবিগুলোর সঙ্গে ডাক্তারের কথা মিলিয়ে নেবে।

সমানতালে মা পাখা নাড়ছে। বুকে মায়ের নরম হাত। কি কষ্ট হচ্ছে বাবা—মা জানতে চায়।

কটা বাজলো ? কখন সকাল হবে মা—সুবল বিড়বিড় করে।

সকাল থেকেই বাড়ীতে চাপা উত্তেজনা, ফ্‌সফ্‌স কথা। আজ ঠাকুর্দা কালী ডাক্তারের ঠ্যাং ভাঙবে। বিকেলের দিকে ডাক্তার এলো। সঙ্গে পলান। দোতলার দালানে তক্তাপোশে ডাক্তার বসলো। পাশে বাবা। প্রায় এক মাইল রাস্তা ঠাঠা রোদে হেঁটে ডাক্তার ঘামছে। বৌঠান একটু জল খাওয়ান—ডাক্তার হাঁকে। ছেলেমেয়েরা এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করছিল। বাবা বললো আর ইঞ্জেকশন দিয়ে কাজ নেই। সুবলকে কাল কলকাতায় নিয়ে চলো। ডাকতার অবাক হয়, সে কি ? কোর্সটা শেষ করা উচিত। এসব ওষুধের একটা নিয়ম আছে।

ঠাকুর্দা হাজির হতে দুজনে উঠে দাঁড়ালো। ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করলো—তুমি কবে থেকে ডাক্তার হলে হে ছোকরা ?

কালী ডাক্তার ভয়ে কুকড়ে গিয়ে বললো—আজ্ঞে…

আজ্ঞে কি—ঠাকুর্দা ফেটে পড়ে—ছেলেটাকে মারবে নাকি ?

কালী ডাক্তার আবার ঘামতে থাকে। দরজায় জলের গ্লাস হাতে মা দাঁড়িয়ে আছে। তুমি আলকাতরার ব্যবসা করো—ঠাকুর্দা চেঁচায়—কোনো খরচ নেই। পুঁজি লাগবে না। একটা চৌবাচ্চা বানাও, আর তাতে ডুব দাও। ড্রাম ড্রাম আলকাতরা হবে। দোকান সাজাবে। খবর্দার তোমায় যেন আর ডাক্তারি করতে না দেখি।

চটির শব্দ তুলে ঠাকুর্দা চলে গেল। ভয়ে ডাক্তারের ধাত ছেড়ে গেছে। মায়ের হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে চুমুক দিল। গলায় জল বেঁধে বিষম লাগে। ব্যাগ হাতে পলান ঠকঠক করে কাঁপছে।

বাবা অপ্রস্তুত। ডাক্তারকে সান্ত্বনা দেয়।

ডাক্তার চলে গেলে ভাইবোনেরা পরস্পর হাসাহাসি করে।

গোপা বলে—কালী ডাক্তার আজ পাউডার মেখেছিল।

সন্তু বলে—দূর, পাউডার নয়। কয়লার গুঁড়ো। ওর চামড়ায় কয়লার গুঁড়ো পাউডারের মতো লাগে।

মা ওদের ধমক দেয়—কি হচ্ছে কি ! যতো বাজে কথা।

রসিকতা থেমে যায়। ওরা সরে পড়ে। রোদ কমেছে। এখন খেলা জমবে। ডাক্তারের সঙ্গে বাবা বেরিয়েছে। বন্ধুর অপমান বাবাকে বেজেছে। কিছুটা এগিয়ে দিলে হয়তো ডাকতারের দুঃখ কমবে।

কালী ডাকতারের জন্যে সুবলেরও দুঃখ হয়। ঠাকুর্দা যেন কি! যা মুখে আসে বলে দেয়। মানুষের দুঃখ কষ্টের কথা ভাবে না।
আমার জন্যেই এসব হচছে, ও ভাবে। এখন কালী ডাকতার দোকানে ফিরে কি করবে। আর হয়তো এ বাড়ীতে আসবে না। সুবলের সঙ্গে কথা বলবে না কোনোদিন। ওর দোকানের সেই ছোটো জানলা দিয়ে সুবল আর কোনোদিন সেই রূপকথার দেশ দেখতে পাবে না। সবুজ অন্ধকারে ডুবে থাকা সেই রাজ-প্রাসাদ, ঘাঘরা পরা সেই পরীর দল। সুবলের চোখ ভিজে ওঠে। তখন ঘর ফাঁকা। রান্নাঘরে মা এগারোটা হ্যারিকেন আর সাতটা লম্পর পলতে কাটছে।
কালী ডাকতার কি এখন সেই জানলার পাশে বসে আছে? সুবল জানে, ওই জানলায় চোখ রাখলেই ডাকতার তার কথা ভাববে। তার মুখ ডাকতারের মনে পড়বে। তখন আর ডাকতার তাড়াতে পারবে না তাকে।
সুবল শুনেছে ডাকতারের বাবার তেজারতি কারবার ছিল। বাজারে পাকা দোকান ঘর, লোহার সিন্দুক। তার মধ্যে থাকতো বন্ধকী সোনাদানা নগদ টাকা। এক রাতে ডাকাত পড়েছিল। বন্দুক, ছোরা বল্লম নিয়ে দু ঘণ্টা ধরে ডাকাতি করেছিল তারা। আশপাশের লোক ভয়ে টুঁ শব্দ করেনি। পুলিশ, থানা অনেক দূর। আটকাবার কেউ ছিলো না। ডাকতারের তখন বয়স কম। কালো ইজের পরে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসেছিল। ডাকাতদের দল লরি নিয়ে এসেছিল। কাজ হাসিল করে তারা বন্দুকের দুটো ফাঁকা আওয়াজ করলো। লরিতে স্টার্ট দিলো। অন্ধকার, ফাঁকা রাস্তায় সেই লরির পেছনে প্রায় সাত মাইল রাস্তা ডাকতার দৌড়ে ছিলো। ডাকাতরা দেখতে পায়নি। অন্ধকারে মিশে একতাল অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ওর শরীর। ডাকাতদের ডেরা চিনে ও সোজা চলে গিয়েছিলো থানায়। বমাল ধরা পড়েছিলো সব। ডাকতার তেজারতির লাইনে যায় নি। ডাকতারি আর কয়লার ব্যবসা ধরেছে। বলে ঠাকুর্দার আদেশ।
একটা হ্যারিকেন নিয়ে মা ঘরে ঢোকে। ওষুধ খাওয়ায়। আঁচলের খুঁটে সুবলের ঠোঁট মুছে দেয়। গলায় কাপড় দিয়ে ঠাকুরের সামনে দু হাত জুড়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকে। ফুল জল দেয়। শাঁখ বাজায়। সুবলের বালিশের তলায় ঠাকুরের ফুল রেখে মা কি যেন একটা মন্ত্র বলে।

বাবা ফেরে। মাকে বলে—কালই সুবলকে নিয়ে কলকাতায় যাবো। বুকের বড়ো ডাকতার দেখাবো। স্পেশালিষ্ট। কালী ডাকতার সঙ্গে থাকবেন।
মা আঁচলে চোখ মুছে সুবলের মাথায় হাত বোলায়।
সুবল ভাবে ভালোই হলো, ডাকতারের সঙ্গে ওই সুযোগে ভাব হয়ে যাবে।

ও জিজ্ঞেস করবে—আপনার দোকানের জানলায় আমাকে আবার বসতে দেবেন তো ?

পরদিন সকালে বাড়ীর সামনে সাইকেল রিক্সা আসে। মা ওকে জামা প্যাণ্ট পরিয়ে দেয়। কপালে চুমু খায়। যতীন কাকা কোলে করে নীচে আনে। রিক্সায় বসিয়ে দেয়। ঠাকুমা বলে জয়বাবা পঞ্চানন্দ। ভালো করে দাও ছেলে-টাকে। জোড়া সিন্নি দেবো। মাথায় ঘোমটা টেনে মা দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের মুখটা সুবল ভালো দেখতে পায় না।

রিক্সাওয়ালাকে ঠাকুর্দা বলে—সামলে চালাবি। গর্ত ফর্ত বাঁচিয়ে। ঝাঁকুনি না লাগে।

সে ঘাড় নেড়ে বলে—সে আর বলতে হবে না বড়োকর্তা। নৌকোর মতো মোলায়েম গতিতে পৌঁছে যাবো।

বাজারের ওপর দিয়ে কলকাতার বাস যায়। কলকাতায় পৌঁছোতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। রিকসা কালী ডাকতারের দোকানের সামনে দাঁড়ালে, ডাকতার বেরিয়ে আসে। বলে—বাস আসতে আরো মিনিট সাতেক দেরি। ও ভেতরে বসুক। বাইরে বেজায় ধুলো। সুবলকে প্রায় কোলে তুলে ডাকতার আলমারির পেছনে নিয়ে আসে। দুটো মোড়া জুড়ে দেয়। বলে—আরাম করে বসো।

সুবলের হাঁটু, গোড়ালি খসে যায়। কুনুইয়ে বিষম ব্যাথা। সোজা হতে পারে না। চোখের সামনে সেই জানলা, ফাঁকা মাঠ, পদ্মপুকুর পালের ডাঙ্গা। ঘাড় তুলে দেখার শক্তি নেই। মাথার ওপর নীল টইটম্বুর আকাশ। ওই পদ্মবনে, দূরের বাগানে এখন কতো খেলা হচ্ছে। সুবল খাড়া হতে যায়। যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে। ডাকতার ছুটে আসে। বলে, কি হলো ? সুবল জবাব দেয় না।

প্রায় দশ মিনিট বাদে বাস এলো। বেজায় ভিড়। ডাকতার জায়গা করে সুবলকে বসালো। রাস্তায় খানা, গর্ত। বেজায় ঝাঁকুনি। কষ্টে সুবলের দম বন্ধ হয়ে যায়। বাবা আর ডাকতার ওর সামনে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

মাঝে মাঝে বাবা জিজ্ঞেস করে—কষ্ট হচ্ছে না তো ?

সুবলের বড়ো আফসোস হয়। জানলার সামনে গিয়েও আজ সে কিছু দেখতে পেলো না। সব একরকম আছে। শুধু তার শরীর চলছে না। কালকের কথা ডাকতার ভুলে গেছে। বাবার সঙ্গে হেসে গল্প করছে।

সুবলকে বললে—জ্যাঠাবাবু মানে তোমার ঠাকুরদাকে আমরা যমের মতো ভয় পাই। ছেলেবেলায় আমাকে এমন একটা গাঁট্টা মেরেছিলেন যে, প্যাণ্ট ভিজে গিয়েছিলো। তবে মানুষটা ভালো।

বড়ো ডাকতারের নাম বিমল মজুমদার। বুকের ডাকতার হিসেবে খ্যাতি আছে। বেজায় পসার। চেম্বারে বত্রিশ টাকা ভিজিট। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর

সুবলের ডাক পড়লো। বাবা ওকে ধরে ভিতরের ঘরে ঢুকলো। আধখানা দরজা। ঠেললে খোলে। আবার নিজেই বন্ধ হয়। বাবা কালী ডাকতারকে ডাকলো। কালী ডাকতার দরজা পর্যন্ত এলো। ভেতরে ঢুকলো না। ডাকতারের গদি মোড়া বিছানায় শুয়ে দরজার বাইরে ধুতি পাঞ্জাবি পরা কালী ডাকতারের অর্ধেকটা সুবল দেখতে পায়। ডাকতার মজুমদার রুগীর ইতিহাস শোনে।

কে দেখছিলেন—মজুমদার জিজ্ঞেস করে।

ডাকতার কালিদাস পাল।

পেসক্রিপশান কোথায় ?

বাবা পকেট হাতড়ায়। তারপর বলে, ডাকতার পাল বাইরে আছেন।

সুবলের বুকে স্টেথো লাগিয়ে ডাকতার মজুমদার দেখে। ডাকতারের মুখ গম্ভীর। দরজার বাইরে কালী ডাকতার পাইচারি করছে। মাঝে মাঝে ধুতি মোড়া তার দুটো পা সুবল দেখতে পায়।

ডাকতার মজুমদার বাবার দিকে তাকায়, অসহ্য রাগে ফেটে পড়ে—ছেলেটার হার্টটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। একেবারে মেরে তারপর নিয়ে এসেছেন আমার কাছে। জীবনে সারবে না। ডাকুন আপনার ডাকতারকে।

বাবার মুখ শুকিয়ে পানসে। দরজার বাইরে কালী ডাকতারের দুটো পা সুবল আর দেখতে পায় না।

বাবা বেরিয়ে যায়। মিনিট দুই পরে শুকনো মুখে ফিরে এসে বলে—ওনাকে পাচ্ছি না। টেবিলে ওনার ব্যাগ রয়েছে। কোথায় যে গেলেন ?

ডাকতার একবার তাকায়। দু চোখে ফুলকি।

কোথা থেকে পাশ করেছেন উনি—মজুমদার জানতে চায়।

বাবা তোতলায়।

পরীক্ষা শেষ করে ডাকতার নিজের চেয়ারে বসে। ওষুধ পথ্য লিখে দেয়। এক-দম শুয়ে থাকবে। হাঁটা চলা বারণ। হার্টের দুটো ভালভ ড্যামেজ হয়ে গেছে। রিউম্যাটিক হার্ট।

সুবল কিছুই বোঝে না। বাবা করুণ চোখে ওকে দেখে। কালী ডাকতার হাওয়া। বাবা ট্যাকসি ডাকে। বসার ঘরে টেবিলের ওপর কালী ডাকতারের চামড়ার ব্যাগ। বাবা ওটা তুলে নেয়। ট্যাকসী এখন মামার বাড়ী যাবে। বাবা বলে, লোকটার টাকা পয়সা সব এই ব্যাগের মধ্যে। বাড়ী ফিরবে কি করে ?

মামার বাড়ীতে বিছানায় শুয়ে সুবল বোঝে আরো অনেক দিন তাকে শুয়ে থাকতে হবে। নীচের গলিতে ছেলেরা ক্রিকেট খেলে, বল পেটায়। বিকেলে ছাতে ছাতে ঘুড়ির হল্লা। ভোঃ কাট্টা চীৎকার।

জানলার লোহার গরাদ ধরে সুবল বসে থাকে। সন্ধ্যে হয়। অন্ধকার নামে। আকাশে দু-একটা তারা ফোটে। সুবলের প্রায়ই সেই জানলাটার কথা মনে পড়ে। হাওয়ায় পদ্মফুলের গন্ধ। রাজপ্রাসাদের ঘণ্টা ধ্বনি।

প্রায় বিশ বছর পরে সুবল একদিন বাস থেকে বাখরাবাজারে নামলো। সব কিছু বদলে গেছে। একদম আলাদা। চেনা যায় না। বাস স্টপের পাশে ডাঃ কালিদাস পালের সেই দোকান নেই। পদ্মপুকুর মজা ডোবা। পালেদের ডাঙ্গা ন্যাড়া মাঠ। ঠাকুর্দা ঠাকুমা কবে জল হাওয়া আকাশে মিশে গেছে। ঠাকুর্দার শেষ জীবনে জমিদারি লাটে উঠলো। বাবা কাকারা তখন মাতব্বর। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বাবা এগারো নম্বর ব্যবসায় জিতে গেলো। এখন বিরাট প্রতিষ্ঠানের মালিক। অনেক টাকা। মবার আগে ঠাকুর্দা তোষামোদ করতো বাবাকে। ভয় পেতো।
বাজারের ওপর ডাকতার কালিদাস পালের নতুন পাকা বাড়ী। তলায় দোকান সামনে লম্বা টানা রক। লাল ঝকঝকে সিমেন্ট। অনেক কাল আগে ও ডাকতারি ছেড়েছে। কয়লাব ব্যবসাও নেই। ও এখন জুয়েলার, সোনা-দানার ব্যবসা। সঙ্গে তেজারতি কারবার। ফর্সা সাদা চাদর ঢাকা পুরু গদীতে কালী ডাকতার ঝিমোচ্ছে। দোকান সামলাচ্ছে ওর দুই ছেলে।
দোকানের মাথায় সাইন বোর্ড। সুবল পড়ে—কালিদাস পাল এণ্ড সনস্। জুয়েলার্স। চাঁদি সোনা ও আসল হীরে-মুকতোর দোকান। প্রোঃ কালিদাস পাল। নামের আগে ডাকতার নেই। রকের ওপর খসখসি ঝুলছে। একজন আধবুড়ো কুঁজো লোক টিনের মগে জল ছিটোচছে। মুখটা চেনা লাগে। সাইকেল রিকসা একটু এগোতেই নামটা সুবলের মাথায় আসে। পলান, পলান বনু। সুবলের হঠাৎ মনে পড়ে।

পলানের আর ডাক্তার হওয়া হয়নি। কি এক যন্ত্রনায় সুবলের জখম বুকটা টনটনিয়ে ওঠে। সুবল ভাবে, হায়রে, আজ থেকে বিশ বছর আগে কালি ডাক্তার যদি আসল মুক্তোর সন্ধান পেত!

পেপার ওয়েট

যেন একটা অগ্নিময় উল্কাপিণ্ড মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়ে দিনরাত দাউ দাউ জ্বলছে। কি ভীষণ তাপ আর দহন। কেউ না বুঝলেও নিঃশব্দ, তার যন্ত্রণায় অনল অবিরাম পুড়তে থাকে। আর তখন রক্তস্রোতে বয়ে যাওয়া একটা ধিকি ধিকি রাগ, ভাঙ্গচুর, লণ্ডভণ্ড করার প্রবল বেপরোয়া বাসনা তাকে পেয়ে বসে। শত চেষ্টা করেও এই সমাজ, সংস্কার, পরিবেশের সঙ্গে একতাল কাদার মতো সে কিছুতেই লেপ্টে লিপ্ত হতে পারছে না। অথচ সব কিছুর সঙ্গে, ইতরতা ভদ্রতা, জোচ্চুরি, সততা, সতী, বেশ্যা, আলো, অন্ধকার এবং যাবতীয় বিপরীত ধর্মী বস্তুর সঙ্গে মানিয়ে, রফা করে চলার নামই তো ভদ্রতা। তবু হাজার ঠোক্কর খেয়েও আজো অনল প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে ধীরে ধীরে ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত হতে থাকে। ঠিক তখন বিছনার পাশে জানলার ওপর পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জীব একদল কাক কদর্য গলায় চেঁচায়। অনল ভাবে একটা রিভলবার কিনে এলোপাথারি গুলি করে কাকের বংশ ধ্বংস করবে। অথবা কড়া আর্সেনিক বিষ মেশানো একতাল ময়দার গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে কাকদের খাইয়ে নির্মুল করবে।

এইসব ভাবনার মধ্যেই কেরোসিনের দোকানে গিয়ে অনল শুনতে পায় তেল নেই। অথচ প্রতিবেশী সিমেন্টের ব্যবসায়ী ভোলানাথ মজুমদারের বাড়ীর চাকরকে দোকানের মধ্যে বসে থাকতে দেখে অনল বোঝে তেল আছে। সে চলে গেলেই মজুমদারের চাকর পাঁচ বা দশ লিটার তেল পেয়ে যাবে। খালি টিন হাতে বাড়ী ফেরার পথে অনলের মনে পড়ে, অনেককাল আগে বাবার সঙ্গে ছেলেবেলায় যখন সে দোকানে বাজারে যেত, তখনও বাবাকে এই হেনস্তা আর অপমান সহ্য করতে দেখেছে। ওষুধের দোকানে ময়লা, জীর্ণ ধুতি শার্ট পরা বাবা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও বাবার পরে আসা কোট প্যাণ্ট পরা ফর্সা মুখ লালচে নরম ফুলো ফুলো হাত সৌখীন মানুষটা আগে ওষুধ পেয়ে যায়। সঙ্কুচিত গলায় বাবা তাগাদা করলে দোকানদার বলে— অতো তাড়া থাকলে অন্য দোকানে যান।

শুধু ওষুধের দোকান কেন, মাছওলাও দু-হাতে রক্ত মেখে দুশো বা আড়াইশো মাছের খরিদ্দার বাবাকে কতো সময় যে দাঁড় করিয়ে রাখতো! আজকাল অনলকেও দাঁড়াতে হয়।

বাবার মতোই অচেনা কাউকে তুই বা তুমি বলার অভ্যেস অনলের নেই। অথচ আলুওলা থেকে রিক্সাওলা পর্যন্ত কেউই আপনি শুনলে পাত্তা দেয় না। ভাবে—লোকটা বুড়বাক, গাঁইয়া।
এই পরশুদিন অফিস থেকে ফেরার পথে রাস্তায় একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে অনল বলে --একটা ফিল্টার নাম্বার টেন দিন তো ভাই।
অনলের দিকে না তাকিয়েই সিগারেটওলা পান সেজে যায়। প্যান্ট, শার্ট পরা জুলপিধারী একজন এসে হুকুম দেয়—একটা সিগারেট দে। জলদি। দোকানদার তড়িঘড়ি একটা সিগারেট বার করে দেয়। আরো গোটাচারেক পান সাজা শেষ হলে. প্রায় মিনিট তিনেক দাঁড়িয়ে থাকার পর অনল একটা সিগারেট পায়।
অনল জানে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তারও নিয়ম মাফিক বদলে যাওয়া উচিত। ছোটলোকদের সঙ্গে ছোটলোকমি এবং গরীবদের পায়ের তলায় রাখাই চালু প্রথা। গরীব এবং ছোটলোকেরাও সেটা চায়। গরীবদের সবচেয়ে বড় শত্রু গরীবরা স্বয়ং। বড়োলোকদের হৃষ্ট পুষ্ট করার জন্যে গরীব বড়লোক সকলে মুখিয়ে আছে।

তবু সময় এবং পরিবেশের সঙ্গে অনল খাপ খাওয়াতে পারে না। এতোকাল ইলেকট্রিকের আলোয় লেখাপড়া করে হ্যারিকেনের আলোয় পড়তে তার কষ্ট হয়। এই কয়েক বছরে লোডশেডিং সত্ত্বেও রাতে ফ্যান ছাড়া ঘুম আসে না। গুমোট গরমে মাথার মধ্যে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডটা দাপাদাপি করে। মধ্যরাতে নিকষ, নিস্তব্ধ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। ভীড় ট্রাম বাসে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি মানুষ নামক বীভৎস দুর্গন্ধওলা তালতাল মাংসপিণ্ডের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়ে অনলের মনে হয় অদৃশ্য নিষ্ঠুর এক দানব তাকে আরশোলা, ইদুঁর, গরু, ছাগল, শুয়োর যোনিজাত এক মনুষ্যেতর জীবে পরিণত করতে বাধ্য করছে।
নিজের মনে ও তখন গোঙায়—আমি মানবো না। এসব আমি মানবো না।
কিন্তু মানবো না বললেই কি হয়। অফিস ফেরৎ বাস থেকে নেমে পাড়ার দিকে একটু এগোতেই সেই পঙ্গু, নুলো ভিখিরীটার জরসর মূর্তি ও দেখতে পায়। ছায়াছায়া অন্ধকারে কদাকার মানুষটার গলায় প্রেতের কান্না। কি বুক কাঁপানো ভয়াবহ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। ফ্যাকাসে অন্ধকারে ফাঁকা রাস্তায় দু'চারটে নানা রঙের কুকুর চোখের নীলাভ মণি জ্বেলে মাটি শুঁকে ঘুরঘুর করে। আজ অফিসে ওপর-ওলার সঙ্গে এক দারুণ উত্তেজনাকর ফেটে পড়ার মুহূর্তে মায়ের মৃত্যুকালীন মুখটা মনে করে অনল নিজেকে খুব সামলে নিয়েছে। তারপর নিজের টেবিলে ফিরে কাঁচের পার্টিশনের ওপাশে চেয়ারে বসা কর্তা ব্যক্তির চকচকে মেচেতা পড়া টাকের দিকে তাকিয়ে দুটো কাঁচের ভারী পেপার ওয়েট নিয়ে ধীরে ধীরে

লোফালুফি করতে করতে ভেবেছে একদা বালককালে অব্যর্থ ছিল তার হাতের টিপ। কতোবার ইঁট মেরে ডাব পেড়েছে গাছ থেকে।

নেহাৎ দায়ে পড়েই লক্ষ্যভেদ শিখতে হয়েছিল তাকে। তখন গাঁয়ে থাকতো ওরা। বয়েসের তুলনায় অনল বড়ো নরম, নিরীহ সরল ছিল। ক্লাসের ছেলেরা প্রায় সকলেই ওকে খোঁচাতো। কি একটা বই-এর ছবির তলায় লেখা ছিল কবি ইকবাল। আর একটা ছবি ছিল লক্ষ্ণৌয়ের ইমামবাড়া। ছবির লেখাগুলো থেকে কিছু অক্ষর কেটে, কিছু জুড়ে ক্লাসের সবচেয়ে বড়ো ছেলে গুপি তাকে পড়তে বলতো। গুপির নাকের ডগায় তখনই মোটা গোঁফ ওঠায় স্যারেরা তাকে গুঁফো বলে ডাকতো।

ক্লাসে একদিন অনলের বই নিয়ে পড়াবার সময় মাস্টার সেই ছবি দুটো এবং তার নীচের লেখাগুলো দেখে অনলকে এমন মার মেরেছিল যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এসে গিয়েছিল তার। অসহায়, অনল তখনও নিজের দোষ বুঝতে পারেনি। একমাস শয্যাশায়ী থেকে জ্বর বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকেছিল শুধু।

নানা ছুতোয় গুপিও যখন তখন তাকে পেটাতো। অনলের বাবার নাম ছিল কালীপদ গুহ। ক্লাস শুদ্ধ প্রায় সকলে পথেঘাটে পাঁচজনের সামনে তাকে কেলোর কীর্তি বলে ডাকতো। গুপির অত্যাচারে অনল ক্রমশঃ মরিয়া হয়ে উঠছিল। গুপিকে শায়েস্তা করার জন্যে মারমুখী প্রতিহিংসায় ও নানা মতলব ভাঁজতো।

বাড়ীর পেছনে আম সুপুরি নারকেলের একটা বাগানে নির্জন দুপুরে একগাদা ইঁট পাথর জড়ো করে তখনই অনল লক্ষ্যভেদের চর্চা শুরু করে। গাছের গুঁড়িতে খড়িমাটির একটা বৃত্ত এঁকে ইঁট ছুঁড়তো। কয়েক হপ্তায় হাত পেকে গেল। অথচ গুপির মাথা ফাটাবার আগেই নতুন চাকরি নিয়ে তারা কলকাতায় চলে এলো।

একটা পয়সা দিন না বাবু একটু খাবার—খনখনে ভুতুড়ে গলায় নুলো ভিখিরী-টার এক ঘেঁয়ে কাৎরানি শব্দহীন মাঝরাতে বাড়ী বসেও অনল শুনতে পায়। গোটা শহর একটা ভিখিরীর ভাগাড় হয়ে উঠলো।

অনল ভাবে গরীব মানুষদের এই শহরে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। এরা একটা পয়সা ট্যাক্স দেয় না। অথচ শহরকে নোংরা, বিষাক্ত করে। অনল আজকাল শুধু দারিদ্র্য নয় দরিদ্র মানুষদের ও ঘৃণা করে। দারিদ্র্য তো আর অশরীরী বায়বীয় অস্তিত্ব নয়। দরিদ্ররাই তো দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। সমাজ জীবন চিন্তা ভাবনা জীর্ণ হতশ্রী করে দিচ্ছে। গরীবি হটাতে হলে গরীবদের ধ্বংস করতে হবে।

গরীবরাও এটা চায় নিজেদের মধ্যে মারদাঙ্গায় তাদের তাই এতো উৎসাহ আর স্ফূর্তি।

মাসের দু তারিখ বলেই অনল আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরেছে। মেঘলা আকাশ, ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। হয়তো রাত বাড়লে জাঁকিয়ে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হবে। মাসের গোড়ায় মনিমালা আর পাপুকে নিয়ে কাছাকাছি একটা চীনা রেষ্টুরেণ্টে অনল খেতে যায়। মাসে এই এক দিনই তো বৌ-ছেলে নিয়ে একটু পাতিবুর্জোয়া বিলাসিতা! মধ্যবিত্ত মানুষের এটা এক ধরনের হ্যাংলামি। জীবনের বিষফোঁড়ায় একটুকরো পুলটিস দেওয়ার সাময়িক আরাম।
বাড়ীতে ঢুকেই অনল দেখে মনিমালা ছেলেবেলার বন্ধু ঝর্ণার সঙ্গে আড্ডায় মশগুল। পাপু আর ঝর্ণার ছেলে টুকুন লুডো নিয়ে বসে গেছে। অনলকে আড়ালে ডেকে মনিমালা বলে—হোটেল থেকে খাবারটা তুমি একাই নিয়ে এসো। দু প্যাকেট বেশী নিও। বাড়ীতেই আজ খাবো।
অনল অখুশী হয় না। বৌ ছেলে নিয়ে রাস্তায় বেরোতে আজকাল সে বড়ো নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বরং একা একা এই শ্বাপদ সঙ্কুল, কবরখানা সদৃশ শহর এবং পরিবেশকে মোকাবেলা করা অনেক সহজ। শিশু, নারী, বৃদ্ধ, রুগ্ন এ শহরে অচল।
চীনা দোকান থেকে কয়েক বাকস খাবার নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা পরে রাস্তায় পা দিয়ে অনল দেখে সাঁই সাঁই ক্ষুর ধার হাওয়ার সঙ্গে ঝিপঝিপ বৃষ্টি পড়ছে। তখনই হঠাৎ লোডশেডিংএ গোটা এলাকা অন্ধকার হয়ে গেল। ভাগ্যও ভালো সামনে একটা খালি ট্যাকসি দাঁড়িয়েছিল। সেটাকে পাকড়ে বাড়ীর দিকে এগোতেই রাস্তার মোড়ে সেই নুলো ভিখিরীটার প্রেতকণ্ঠের আকুতি অনলের কানে গেল। লোকটা নিজে হাঁটা চলা করতে পাবে না। নিশ্চয় কারো তদারকিতে নড়াচড়া করে। ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় পঙ্গু মানুষটার চড়া গলার আওয়াজ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। দু চোখের ঘন সবুজ মনি জ্বেলে কয়েকটা কুকুর অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
কি এক খেয়ালে হঠাৎ ট্যাকসি থামিয়ে অনল চিকেন উইথ ভেজিটেবিলের প্যাকেটটা ভিখিরীটার হাতে তুলে দিল।
চাপা গলায় ড্রাইভারকে বললো—জোরসে চালাও।
তখনই বৃষ্টির তেজ বাড়ে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার আর ঘন হাওয়া কেটে ট্যাকসি এগিয়ে চলার সময় অনলের মনে হয়, গাড়ীটির গা ঘেঁষে রকেটের বেগে কয়েকটা জীব ছুটে গেল। বড়ো অদ্ভুত, রহস্যময় ব্যাপার।
স্ত্রীর বান্ধবী এবং তার ছেলেকে নিয়ে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে রাতের ভোজ শেষ হলো।

পরদিন সকালে অনল অফিস যাওয়ার মুখে পাশের বাড়ীর তমাল বলে— কাল রাতে পাড়ায় এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে। মোড়ের মাথায় নুলো ভিখিরী-টাকে ঝড়বৃষ্টি অন্ধকারে কয়েকটা কুকুর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়েছে। লোকটাকে আর চেনা যায় না। লাশ নিয়ে পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। লাশের পাশে আবার একটা চীনে রেষ্টুরেন্টের বাক্স পড়েছিল।

অনলের মাথায় হঠাৎ দপ করে সেই অগ্নিময় উল্কাপিণ্ডটা জ্বলে ওঠে। চারপাশে লক্ষ লক্ষ শিয়াল কুকুর মানুষ কামড়াকামড়ি করছে। কাকে বাঁচাবে সে? এইবার হয়তো সেই মহাকায় সর্বশক্তিমান দানবটা তাকে ঘাড় ধরে সময়ের সঙ্গে রফা করতে বাধ্য করবে। অফিসে নিজের চেয়ারে বসে অনল ঘামতে থাকে। শরীরের মধ্যে তপ্ত রক্তস্রোতের চাপে হাতের মুঠোয় ধরা ভারী পেপারওয়েটটা কখন যেন কামানের গোলা হয়ে গেছে। অনল বোঝে, নিরীহ, গোবেচারা কালীপদ গুহর সন্তানের বুকে ভয়াবহ এক কীর্তির প্ররোচনা ফুঁসে উঠেছে।

বরাহপুরাণ

বাবা ফিরে চলো—আমি বললাম—এই শূয়োরের রাজত্বে মানুষ বাঁচে না। এখানে থাকলে একজন মানুষ আপাদমস্তক শূয়োরের বাচ্চা বনে যাবে। মনুষ্যত্ব বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে এখান থেকে পালানো উচিত।

গত তিনদিন ধরে এই কথাগুলো নানাভাবে বলে বাবার মতি ফেরাবার চেষ্টা করছি। আমার সব কথা বাবার কানে যায় না। ঘোলাটে ফাঁকা চোখে ষাটোর্দ্ধ, জীর্ণ মানুষটা খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাইরে সেই উপনিবেশ। গত পনেরো বছর রক্ত জল করা মেহনত আর অসীম নিষ্ঠায় বাবা গড়ে তুলছে। নিজের হাতে তৈরী এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে বাড়ী ফেরা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু ফিরতে তো হবেই। অস্তিত্ব না বাঁচিয়ে তো আর বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পসাধনা সম্ভব নয়।

সুন্দরবনের কোলে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে পাঁচ বর্গমাইলের এই একটুকরো দ্বীপটার নাম বরাহ। ঘন সবুজ গাছপালায় ঘেরা। গরান, গেঁউ আর সুন্দরী গাছের পাশাপাশি নারিকুল আর এ্যাশশ্যাওড়ার ঝোপ। দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে একটা ছোট খাল, গঙ্গা আর সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। নির্মেঘ মধ্যদুপুরে চোখে দূরবীন লাগিয়ে এই খালধারে দাঁড়ালে, জম্বুদ্বীপ, কচুবেড়ে, মিঞার চক্ পরিষ্কার দেখা যায়। সমুদ্রতল থেকে বরাহদ্বীপ আর পাঁচটা দ্বীপের তুলনায় অনেকটা উঁচু।

আজ থেকে পনেরো বছর আগে, যখন আমার আট, ন' বছর বয়েস, তখন আমার বাবা, সুকিয়া স্ট্রীটের গুরুচরণ মল্লিকের কাছ থেকে এই দ্বীপটি পঞ্চাশ বছরের জন্যে লিজ্ নেয়। দ্বীপ সংক্রান্ত বাবার পরিকল্পনা শুনে ছাত্রজীবনের সহপাঠী, বন্ধু গুরুচরণ, বেশ সস্তায় পঞ্চাশ বছরের জন্যে এই দ্বীপ বাবাকে ছেড়ে দিয়েছিল। তাছাড়া বাবাও তো খুব একটা হেঁজিপেজি মানুষ ছিল না। প্রাণী-বিজ্ঞানী হিসেবে ডঃ সুধাকর ঘোষাল, অর্থাৎ আমার বাবা, তখন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ। দেশবিদেশের বিজ্ঞানী আর বিদ্বজ্জনেরা এক ডাকে বাবাকে চিনতো।

ছিটগ্রস্ত, শীর্ণ আজকের এই আধবুড়ো মানুষটাকে দেখে সেদিনের কথা আমার ভীষণ মনে পড়ে। শৈশবের বন্ধু আর এক প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ নলিনাক্ষ বোসকে

নিয়ে বাবা একদা এই দ্বীপে এসে হাজির হলো। দুজনের মাথায় তখন একটাই ধ্যান, জ্ঞান, পরিকল্পনা, তা হলো শূয়োর থেকে মানুষ বানাতে হবে।

বাবার ধারণা ছিল মানুষ আজ ক্ষমতাবান এবং পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও দূর ভবিষ্যতে হয়তো একদিন ডল্‌ফিন্ বা পিঁপড়েরা পৃথিবীর কতৃত্ব দখল করে বিশ্বসংসারের ভাগ্যবিধাতা হয়ে দাঁড়াবে। পশুর ওপর মানবত্ব আরোপ করার অবৈজ্ঞানিক, ভাববাদী, গ্রাম্য ব্যাখ্যাকে নাকচ করে, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সূত্র ধরে বাবা বলতো, পশুরা মানুষ নয়, বরং মানুষই কিছু বিশেষ গুণপনাযুক্ত পশু। পশুর দেহে এবং মস্তিষ্কে কিছু মানবিক গুণ, যা কিনা মানুষের বায়োলজিকাল্ বা শরীরী মশলা, সেগুলো সফলভাবে জুড়ে দিতে পারলেই পশু থেকে মানুষ বানানো অসম্ভব নয়।

কলকাতায় নিজেদের কর্মস্থলের ল্যাবোরেটরিতে বাবা এবং নলিনাক্ষকাকা এই বিষয়েই কাজ করছিল। কিন্তু অন্যের ল্যাবোরেটরিতে স্বাধীনতা এবং সুযোগ সুবিধে কম, পরীক্ষা নিরীক্ষায় নানা অসুবিধে। বরাহদ্বীপের দখল পেয়ে তাই দুই বন্ধু নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনায় কাজে মেতে উঠলো। মাসের পর মাস কঠিন পরিশ্রমে তৈরী হলো গবেষণাগার। এই যে তিন কামরার বাংলো বাড়ী, যেখানে বাবার মুখোমুখি এখন আমি বসে আছি, এটাও বাবার নিজের হাতে তৈরী। শুধু জ্ঞান বা মেধায় নয়, শারীরিক পরিশ্রমেও বাবা ছিল অকাতর, অক্লান্ত। বাবার বিশ্বাস ছিল, গতরে না খাটলে বুদ্ধি, স্মৃতি, সৃজনশীলতা অকেজো এবং ভোঁতা হয়ে যায়।

সব পশুকে ছেড়ে হঠাৎ শূয়োর থেকে কেন মানুষ বানাবার সিদ্ধান্ত বাবা করলো, এ প্রশ্ন জানতে চাইলে বাবা একদিন বলেছিল—পশুদের মধ্যে একমাত্র শূয়োরের সঙ্গেই মানুষের সাদৃশ্য বেশী। জীবকোষ এবং অঙ্গবিন্যাসেও অনেক মিল আছে। মানুষের হৃৎপিণ্ড বদলানোর কাজে শূয়োরের হৃৎপিণ্ডই সবচেয়ে উপযোগী। তাছাড়া শূয়োরের মতো এতো সহনশীল, পাঁক ও নোংরায় আকণ্ঠ ডুবে থাকার আসক্তি ও রুচি এবং বংশবৃদ্ধিতে পটু জীব, মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

বাবার যুক্তি শুনে ছেলেবেলার কিছু স্মৃতি আমার মনে পড়তো। কলকাতায় আমাদের বাড়ীর কিছুটা দূরে আদিগঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত একটা খাল ছিল। কুচকুচে কালো নোংরা জলের তলায় থকথকে পচা পাঁক। খালের দক্ষিণ পশ্চিম ধারের ডোমপাড়ার কয়েকডজন পোষা, কৃষ্ণকায়, লোমশ শূয়োর সারাদিন সেই পাঁকের মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ঘোঁতঘোঁত শব্দ করতো। বয়স্ক মেয়ে মরদ এবং ন্যাংটো শিশুরা খালপাড়ে কোমরের ওপর কাপড় তুলে হাল্কা হওয়ার জন্যে বসলে শূয়োরের পাল বিনা মাইনের মেথরের দায়িত্ব পালন করতো। বছর দশ

বারোর একটি ছেলেকে একবার ধারালো হেঁসো দিয়ে একটা শূয়োর ছানার অঙ্গুলিপ্রমাণ অস্থিহীন কচি ল্যাজ এককোপে আমূল কেটে ফেলতে দেখেছিলুম। ল্যাজকাটা শূয়োর শাবকের পশ্চাদ্দেশ থেকে ঝরঝর করে রক্ত বেরোলেও উদাসীন, নিরীহ সেই জীবটা এতোটুকু বিচলিত বা কাতর না হয়ে নির্বিকার ভঙ্গীতে চেটেপুটে ময়লা খেয়ে গেল। এর নামই বোধহয় সহনশীলতা!

কিছু মজুর এবং লোকজন এনে বাবা এবং নলিনাক্ষকাকা প্রথমেই বরাহদ্বীপকে ঢেলে সাজিয়ে মানুষের বাসোপযোগী করে গড়ার কাজে মন দিল। সুদূর এই দ্বীপের বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাবার জন্যে বসলো জেনারেটর। খড়, হোগলা এবং গোলপাতায় তৈরী ছোট ছোট কুটিরগুলোতে আলোর সঙ্গে জল সরবরাহের জন্য লাগানো হ'ল, জলের পাইপ আর কল। আধুনিক সভ্যজীবনের জন্যে যা কিছু দরকার, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা ও আয়োজনে বাবা কোন খামতি রাখলো না। দুই বন্ধুর মেহনত আর পরিকল্পনায় সাপ, শ্বাপদ-সঙ্কুল এই বরাহদ্বীপের চেহারাই বদলে গেল। দ্বীপের নতুন নামকরণ হলো—বাংলা বাজার।

দক্ষিণের জানলার কোল ঘেঁসে পাঁচ বছর আগে, সেই আমার শেষ দেখা, ফুলের বাগানে আজো কয়েকটা গোলাপ, রজনীগন্ধা আর ডালিয়ার নিষ্পত্র ঝাড় প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা পরিত্যক্ত, সাবাড় হয়ে যাওয়া সেই উদ্যানের দিকে কাতর দৃষ্টিতে বাবা তাকিয়ে আছে। সাদা কালো রঙের একদল গাঙশালিক সকালের মিহি রোদ পিঠে মেখে নেচে বেড়াচ্ছে। হেমন্তের হাওয়ায় শিরশিরে ঠাণ্ডা আমেজ!

আমি বলি, বাবা তুমি ফিরে চলো। এখানে মানুষ থাকতে পারে না। এ রাজত্ব আর কিছুদিনের মধ্যেই শূয়োরদের দখলে চলে যাবে। তোমাকে ল্যাংটো করে শূয়োরদের খাতায় তোমার নাম না তুলে ওরা তোমাকে রেহাই দেবে না। ওরা জানে, একজন মানুষ থাকলেও শূয়োর সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ।

বোবা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বাবা কি যেন ভাবে। হতভাগিনী, মুমূর্ষু রুগ্ন মায়ের মুখটা আমার মনে পড়ে। গত পনেরো, বিশ বছরে বড়ো দুঃসহ অশান্তির মধ্যে জীবন কাটিয়ে মা তিলে তিলে ক্ষয়ে গেছে। কোটরে বসা দুচোখের কোল বেয়ে এখন অনর্গল জল গড়ায়। নিঃশব্দে মা মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। মা শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগেই একবার বাবাকে বাড়ী নিয়ে যেতে চাই। মরার আগে স্বামীকে দেখার বাসনা মা অবশ্য আমাকে জানায় নি। বড়ো চাপা, আর অভিমানী আমার মা। স্বামীর অবহেলাকে চুপচাপ মেনে নিয়েছে। আক্ষেপ বা অভিযোগ করেনি। মায়ের অন্তিম অবস্থার কথা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও বাবাকে বলতে পারিনি। শেষদিকে মায়ের সঙ্গে যে কোন কারণেই বাবার

বিশেষ বনিবনা ছিল না। বছর তিনেক আগে বাবা যখন শেষ কলকাতায় এসেছিল, তখন একরাতে, অন্ধকার ঘরে মা বাবার তীব্র বচসার শব্দও আমি শুনেছিলুম। মায়ের সম্পর্কে বাবার মনোভাব যে এখন কি, সেটা না জেনে মায়ের প্রসঙ্গ পাড়া ঠিক হবে না। মৃত্যুপথযাত্রী সেই মহিলার কথা আমি চেপে যাই।

বাবার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি, যে, মানুষটার মধ্যে এক প্রচণ্ড লড়াই চলেছে। অনেক কাল দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করার পর কোন যোদ্ধাই অস্ত্রত্যাগ করে সরে পড়তে চায় না। অদূরের ঘন জঙ্গল থেকে অদ্ভুত সব আওয়াজ ভেসে আসছে। শূয়োর এবং মানুষের কণ্ঠস্বর মিশে তৈরী দুর্বোধ্য শব্দপুঞ্জ। বাঁদিকের খোলা জানলার পাশে আলকুশি ঝোপের আড়াল থেকে এক কিম্ভূত জীব কৌতুহলী চোখে আমাদের দেখছে। অর্ধেক মানুষ আর অর্ধেক শূয়োরের মতো তার চেহারা। উলঙ্গ পশুটার গা ভর্তি কালো লোম। মানুষের সঙ্গে দু'চোখের যথেষ্ট মিল থাকলেও নাক, মুখ, চোয়াল দেখে তার শূয়োরত্ব বোঝা যায়। আমার চোখে তার চোখ মিলতেই সে দ্রুত ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ঘটনার গতি এবং লক্ষণ দেখে আমি বুঝতে পারি যে আজ অথবা কাল ওরা দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করবে। তার আগেই এখান থেকে পালাতে হবে। ধরা পড়লে ওদের হুকুম মতো শূয়োরের খাতায় আমাদের নাম লেখাতে হবে। তা না হলে আমাদের খুন করতেও ওরা পিছপা হবে না। সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনা হলো যে নলিনাক্ষকাকাও আধাশূয়োরী আধা মানবী একজনের কণ্ঠলগ্ন হয়ে ওদের সম্প্রদায়ে ভিড়ে গেছে। নলিনাক্ষকাকার ঔরসে সেই শূয়োরীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে।

বাবা ও নলিনাক্ষকাকা এখানে আসার বছর দুই তিনের মধ্যে গোটা দ্বীপের আধুনিকীকরণের কাজ শেষ হলো। কুশলী, অভিজ্ঞ দুই বন্ধু অতঃপর প্রয়োজনীয় উন্নত যন্ত্রপাতিতে গবেষণাগারটি সাজিয়ে তোলে। দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা জাতের বিচিত্র মানসিকতার কালো, সাদা, ধূসর শূয়োর ও শূয়োরশাবক স্টীমারে চেপে বাংলাবাজারে এসে হাজির হয়। ঘন অরণ্যময় সুন্দরবন ও দিগন্ত-বিস্তৃত অন্ধকার জলরাশির মাঝখানে গভীর রাতে আলো ঝলমল বাংলাবাজার এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মতো জেগে থাকে। প্রায় তিন চার বছর ল্যাবোরেটরিতে দুই বন্ধু কাটা, ছেঁড়া, জোড়ার কাজে একটানা বিরামহীন খেটে যায়। তারপর এক শরতের মধ্যরাতে অপারেশন টেবিলের ওপর জোড়াতালি দেওয়া এক নতুন প্রাণী আটচল্লিশ ঘণ্টা বেহুঁশ থাকার পর জেগে উঠে মানুষের মতো হাই তুলে কিছু কিছু মানুষী লক্ষণ প্রকাশ করলো। এতোদিনের শ্রম, সাধনা সফল হওয়ায় দুই বৈজ্ঞানিক পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আত্মহারা আনন্দে হাউ হাউ করে কাঁদতে

থাকলো। শরতের হাওয়া লেগে বাইরের অন্ধকার গাছপালায় তখন খুশীর মর্মরধ্বনি বাজছে। নিঃশব্দ চরাচরে বহতা নদীর কুলকুল শব্দ।

সাফল্য ও জয়যাত্রার সেই শুরু। শূয়োর থেকে মানুষ বানাবার মূল নিয়ম ও কলাকৌশল করায়ত্ত হওয়ার পর ঝাঁকেঝাঁকে নতুন জাতের মানুষ উৎপাদন হতে থাকলো। মানুষের মতো গড়েপিটে তাদের তৈরী করার জন্য শুরু হলো শিক্ষা। তারা আলো, জলের ব্যবহার শিখলো। গাঁটরি বাঁধা প্যান্ট, শার্ট, ধুতি পাঞ্জাবী, শাড়ী, ব্লাউজ, পেটিকোট আমদানী হলো। প্রতিটা শুয়োরপুরুষের জন্যে একটা শূয়োরনারী বরাদ্দের ব্যাপারে বাবা ও নলিনাক্ষ কাকা খুব সজাগ ছিল। নতুন জীবেরা কিছুকালের মধ্যেই শূয়োরের গলায় মানুষের ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গায়ের লোম খসে যেতে থাকলো। কিন্তু দুটো আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। ঠিক আশ্চর্যজনক নয়, বরং ব্যতিক্রম বলাই ভালো। মানবিক আচার আচরণ শিক্ষার পরেও ময়লা, পাঁক, কাদা এবং পরস্ত্রী দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে অনেকে উশখুস করে। ভরপেট খাওয়ার পরেও নর্দমার দিকে তাকায় এবং হাতের ব্যবহার ভুলে গিয়ে নর্দমায় মুখ ডুবিয়ে দেয়। তার চেয়েও সাংঘাতিক যে জিনিষটা ঘটলো, তা হলো এই যে, নারী ও পুরুষের হাজারবার মিলনের পরেও একটা শাবক ভূমিষ্ঠ হলো না। অথচ ল্যাবোরেটরিতে পরীক্ষায় দেখা গেল যে নতুন জাতের প্রাণীদের প্রজনন-ক্ষমতায় কোন গলদ নেই। শরীরের আর পাঁচটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মানুষের সঙ্গে কিছু অমিল থাকলেও যৌনাঙ্গগুলির আচার, ব্যবহার হুবহু মানুষের মতো। সংকর জীবগুলো প্রথমে এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি! তারা ভেবেছিল যে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে হরিণ, খরগোস, বাঁদর এবং অন্যান্য প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি দেখে নিজেদের বন্ধ্যাত্ব সম্পর্কে তারা ক্রমশ সজাগ, সচেতন হলো। আমার বাবা ও নলিনাক্ষকাকা এ বিষয় অনেক আলোচনা এবং পরীক্ষা করেও সমস্যার সমাধান করতে পারলো না। দুশ্চিন্তা বাড়লো।

নতুন জীবেরা কিন্তু বেশ সাবলীলভাবে সংসার চালায়, লেখাপড়া, গানবাজনা এমনকি রবীন্দ্রসংগীতও শিখে যায়। নলিনাক্ষকাকা তাদের চাষআবাদে হাতে খড়ি দিল। প্রথম বছর ধান বোনার পর তরুণ কচি চারায় যখন মাঠ ভরে গেছে, তখন এক সকালে দেখা গেল যে, কারা যেন রাতের অন্ধকারে মাঠের অনেকটা জায়গার ধানগাছগুলো মুড়িয়ে খেয়ে গেছে। বিস্মিত বাবা এবং নলিনাক্ষকাকা ক্ষেতের ভিজে মাটিতে এমন কিছু পায়ের দাগ পেল, যা নতুন প্রাণীদের পদচিহ্নের সঙ্গে মিলে যায়। প্রায় মানুষের মতো খুর লাগানো পায়ের ছাপ থেকে ধরা পড়ে এই দুষ্কর্মের জন্য হরিণ বা খরগোসেরা দায়ী নয়। অনেক খোঁজ ক'রে, ভয় এবং ভালোবাসা দেখিয়েও অপরাধীদের ধরা

গেল না। বাবা বুঝলো, তার সৃষ্ট জীবদের মধ্যে পশুবৃত্তি, সক্রিয় এবং তেজী আছে। মানুষ যে আসলে উন্নততর পশু এবং মনুষ্যত্বের পরিমাণ কমে গিয়ে পাশবিক বৃত্তি বাড়লে মানুষও যে পশু হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে বাবা নিঃসন্দেহ হলো। নতুন জীবদের চেহারায় কিছু কিছু বৈষম্য থাকলেও দু'একজন বেশ সুন্দর হয়ে উঠলো। পিংলা নামে এক যুবতীর শরীরের লাবণ্য আর ঢলোঢলো ভাব যে কোন নাগরিকাকে লজ্জা দিতে পারে।

বাংলাবাজারের অধিবাসীদের বন্ধ্যাত্ব মোচনের জন্যে দুই বন্ধু তখন দিনরাত ল্যাবোরেটরিতে পড়ে আছে। দ্বীপের দৈনন্দিন কাজ আর নিয়মিত তদারকিতে একটু ঢিলে পড়েছে। একদিন মাঝরাতে দুই বন্ধু কাজের ফাঁকে বাংলোর বারান্দায় এসে দেখলো যে, সারা দ্বীপ অন্ধকারে ডুবে আছে। এমনকি কারো কুটিরেও আলো জ্বলছে না। তাজ্জব কাণ্ড। এমন হওয়ার তো কথা নয়। জেনারেটর যে চালু আছে, বাংলোর বাতিগুলোই তার প্রমাণ। তাহলে এতো অন্ধকার কেন! খুব আশ্চর্য হলেও দু'বন্ধু সে রাতে আর বাংলোর বাইরে গেল না। জমাট অন্ধকারে রহস্যময় অরণ্য আর দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলো। পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল যে, কারা যেন উপনিবেশের মেন সুইচটি গুঁতিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। নলিনাক্ষকাকা গম্ভীর হয়। এবারেও দোষীর হদিশ মেলে না। এসব নতুন উপদ্রব নিয়ে সেদিন দুপুরে দু'বন্ধু যখন আলোচনা করছে, তখন সেই যুবতী শুয়োরী, যার নাম পিংলা, হঠাৎ বাংলোয় এসে হাজির।

পিংলাকে দেখে আলোচনা বন্ধ রইলো। চারপাশ ভালো করে দেখে নীচু গলায় পিংলা বললো—আমাদের বাস্তার দুচারজন এসব ভাঙ্গচুর করছে। তাদের মাথায় আরো নাশকতার মতলব আছে।

নাম কি তাদের—নলিনাক্ষকাকা জানতে চাইলো।

জানি না—পিংলা বললো।

মিথ্যে কথা—নলিনাক্ষকাকা ধমক দিল।

পিংলা ঘাবড়ে গিয়ে কেঁদে ফেললো। তারপর বললো—জুয়ালাও আছে।

হতবাক, বিমূঢ় বাবা। নলিনাক্ষকাকাও কথা বলে না।

জুয়ালা হলো পিংলার জুড়ি, মানে স্বামী। পশুত্ব কাটিয়ে জুয়ালা মানুষ হিসেবে অনেকটা উন্নত হওয়ায় দু'বছর আগে তাকে দলপতি করা হয়েছে। সেই জুয়ালার একি ব্যবহার!

নলিনাক্ষ কাকার জেরায় পিংলা আরো অনেক গোপন কথা ফাঁস করে দিল। আজকাল সন্ধ্যের পর অন্ধকার একটু ঘন হলেই নাকি অনেকে জামা, প্যান্ট, শাড়ী, ব্লাউজ খুলে বিবস্ত্র হয়ে থাকে। স্বামী, স্ত্রীর ঘর বদল হয়। পিংলা

এই বহুগামিতা বরদাস্ত করতে না পারায় জুয়ালা নাকি তাকে মারধোর করে।
কি সর্বনাশ—বাবা বিড়বিড় করলো।
এসব হচ্ছে কেন—নলিনাক্ষকাকা জিজ্ঞেস করলো।
পিংলার কথা থেকে যা বোঝা গেল, তার মর্মার্থ হলো এই যে, মাঝখানে ঘনঘন টিউব লিকেজ এবং যান্ত্রিক গোলযোগের জন্যে উপনিবেশের বিদুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত হয়েছিল। ঘরে ঘরে লোডশেডিং, অন্ধকার। সেই অন্ধকারে সকলের চোখ এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে, যে, এখন আলো থাকলেই দারুণ কষ্ট হয়। চোখ কটকট করে, মিগ্রেন হয়। ফ্যানের হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে বুকে সর্দি, কাশি, শ্লেষ্মা জমে জর হয়। তাছাড়া জামাকাপড়ের যোগান কমে যাওয়ার দরুণ অনেকে নাকি প্রচার শুরু করেছে যে, ভবিষ্যতে যখন ল্যাংটো হয়ে থাকতেই হবে, তখন উলঙ্গ থাকার অভ্যেসটা অবিলম্বে শুরু করে দেওয়া ভালো।

পিংলা চলে যাওয়ার পর সেই নিস্তব্ধ, থমথমে দুপুরে দুই বৈজ্ঞানিক কেমন বিহ্বল হয়ে মুখোমুখি বসে থাকে। দু'জনের মাথাতে একটাই চিন্তা, এই অসভ্যতা এখনি থামানো দরকার।

জুয়ালাকে গুলি করে মেরে ফেলাই ভালো—নলিনাক্ষকাকা প্রস্তাব দিল।

সেটা কি ঠিক হবে—বাবা সন্দেহ প্রকাশ করলো—বুঝিয়ে বাজিয়ে শুধরে নিলে কেমন হয়?

সেটা আর সম্ভব নয়—জ্বলন্ত চোখে নলিনাক্ষকাকা বললো—আগেও কয়েকবার অনেক উপদেশ আর মিষ্টি কথা বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ফসলের ক্ষেতে চুরি থামে নি। কাদা, পাঁক ঘেঁটে খালের জল বারবার ঘুলিয়ে দিয়েছে। এমন কি এবারেও আমাদের প্রতিষ্ঠাদিবসের ভোজসভায় হরিণ বা মুরগীর মাংস ওদের খাওয়ানো যায় নি। নোংরা খাবে, অথচ প্রোটিন খাবে না। আর সহ্য করা যায় না। নলিনাক্ষ কাকার অভিযোগগুলো সঠিক। মানুষের অনেক অভ্যাস, আচরণ শেখার পরেও নিরামিষ তৃণভোজীদের মাংসাশী করার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। খুব চিন্তাক্লিষ্ট, হতাশ ভঙ্গীতে বাবা বললো—জুয়ালাকে মেরে কি খুব লাভ হবে। জুয়ালার সঙ্গে তো আরো অনেকে আছে। তাছাড়া জুয়ালা মারা গেলে পিংলা যে একা হয়ে যাবে!

তোমার কথা হয়তো ঠিক—নলিনাক্ষকাকা জবাব দিল—তবে জুয়ালাকে মারলে, বাকীরা ভয় পেয়ে সংযত, ভদ্র হবে। বেআইনী কাজের জন্যে এটা একধরণের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। জুয়ালাকে মারতেই হবে।
একরোখা জিদ নলিনাক্ষকাকার গলায় ভর করে।
বাবার দ্বিধা কিন্তু কাটে না। বাবা উশখুশ করে।

নলিনাক্ষকাকা বললো—এখন থেকে ওদের একটু ধর্মশিক্ষা দেওয়া দরকার। হপ্তায় অন্তত একদিন গীতা, কোরাণ বাইবেলের ক্লাস নিতে হবে।

বন্দুকধারী নলিনাক্ষকাকার সঙ্গে বাবাও শূয়োরমানুষদের পাড়ায় হাজির হলো। একটা নারকোল জুয়ালা তখন দাঁত দিয়ে ছাড়াচ্ছিল। বন্দুক হাতে নলিনাক্ষ-কাকাকে দেখে সে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলো। পরপর দু'টো গুলির শব্দ হলো। একদম শূয়োরের গলায় আর্ত চিৎকার করে জুয়ালা সেখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বন্দুকের আওয়াজে নির্জন বনস্থলী কেঁপে উঠলো। দিনান্তে ঘরে ফেরা পাখীরা গাছগাছালি ছেড়ে উড়ে গেল। চারপাশের কুটিরের মানুষজন ফ্যাকাসে, ত্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

জুয়ালার মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়ে পিংলা ডাক ছেড়ে কাঁদে। আলুথালু বেশবাস আর মুখে পিঠে ছড়ানো খয়েরি এলোচুল পিংলাকে ঠিক এক সদ্য-স্বামীহারা রমণীর মতো দেখায়। কি এক বুকচাপা অনিশ্চয়তা সেই গভীর অরণ্য-প্রদেশের আবছা অন্ধকারে দানা বেঁধে থাকে। ভয় পাওয়া অধিবাসীরা যে যার ঘরে ঢুকে যায়।

নলিনাক্ষকাকা জনাচারেক পুরুষ শূয়োরকে ডেকে জুয়ালার নিষ্প্রাণ দেহটা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসতে বললো। জুয়ালার দু'পায়ে খড়ের ছড় বেঁধে তার দেহটা টানতে টানতে চারজন সমুদ্রের দিকে চলে গেল।

মাটি থেকে পিংলাকে তুলে তার পিঠে, মাথায় হাত বুলিয়ে নলিনাক্ষকাকা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। তারপর বললো—এক মাসের মধ্যেই তোর নতুন স্বামী হবে।

নলিনাক্ষকাকার বুকে মুখ গুঁজে পিংলা গোঙাতে থাকে।

জুয়ালার মৃত্যুর পর, তিন-চারদিন না যেতেই সেই ভয়ংকর নাটকীয় কাণ্ডগুলো শুরু হ'লো। হাজার কাজের ফাঁকে নলিনাক্ষকাকা রোজ একবার পিংলার ঘরে গিয়ে তার খোঁজখবর করতো। পিংলার নতুন জুড়ির কাজে বাবা তখন এতো ব্যস্ত যে প্রথমদিকে ব্যাপারটা খেয়াল না করলেও হঠাৎ একদিন নলিনাক্ষকাকার কিছু অদ্ভুত আচরণ বাবার নজরে পড়লো। বাটিভর্তি কাঁচা চাল আর ডাল নিয়ে নলিনাক্ষকাকা চিবোচ্ছে। ল্যাবোরেটরির কাজে প্রতিপদে মারাত্মক ভুল হচ্ছে তার। একদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙতে কেমন একটা সন্দেহ হওয়ায় বাবা পা টিপে টিপে পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো, নলিনাক্ষকাকা নেই। বিছানা খালি। অদূরে উপনিবেশ জুড়ে অমাবস্যার অন্ধকার। রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত নেভানো। সেই আঁধারাতে টর্চ জেলে সতর্ক পায়ে বাবা উপনিবেশের মধ্যে পিংলার কুটিরের পেছনে এসে দাঁড়ালো। পিংলার ঘরের জানালা খোলা। হাতের টর্চ বাবা আগেই নিভিয়ে দিয়েছিল।

অন্ধকার ঘরে পিংলার কান্নাভেজা গলার কথা বাবা শুনতে পেল। সে বলছিল, আমি আর পারছি না তুমি আমাকে বাঁচাও। তোমার জন্যে আমি জুয়ালাকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছি। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।

হবে, হবে—নলিনাক্ষকাকা তাকে আশ্বাস দিল—সুধাকরকেও আমাদের সঙ্গে পেতে হবে। সে আমার বাল্যবন্ধু। আমি দলত্যাগ করলে সে বড়ো কষ্ট পাবে!

পিংলা হঠাৎ দারুণ রুষ্ট হয়ে নলিনাক্ষকাকার দু'কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কাকে চাও, সুধাকরকে না আমাকে? বল, বলতেই হবে।

বাবার চারপাশ হঠাৎ শব্দহীন, অসাড় হয়ে যায়। সেই অন্ধকারে চরাচরব্যাপী নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বাবা ধরতে পারে, পিংলার ঘরে দুই নগ্ন জীব প্রাগৈতিহাসিক আদিম খেলায় লিপ্ত, উন্মত্ত।

মুখে না বলেও নলিনাক্ষকাকা তার শরীরের ভাষায় আনুগত্যের প্রমাণ দিচ্ছে। পায়ের নীচে মাটি, মাথার ওপর আকাশ যেন এক নিষ্ঠুর দানবের মতো শক্ত চোয়ালে বাবাকে চেপে মারার চেষ্টা করছিল। অর্ধচেতন মানুষের মতো বাবা বাংলোয় ফিরে এলো।

তারপর ঘটনাস্রোত দ্রুত বয়ে যায়। বিদ্যুৎ তৈরীর জেনারেটর একদিন চিরকালের মতো বিকল হয়ে গেল। বাংলাবাজারের বাসিন্দারা অন্ধকারেই বেশ তৃপ্তি এবং আরাম পেতে থাকলো। জামাকাপড়ের সরবরাহ একদম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উলঙ্গ থাকার খুশীতে সকলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সামনে ল্যাংটো হয়ে ঘোরা ফেরায় প্রথমদিকে অনেকের, বিশেষ করে মেয়েদের একটু সঙ্কোচ ছিল, পরে ব্যাপারটা সহজ, সরল হয়ে গেল। ঘরে ঘরে লাগানো আলোর ডুম, জলের পাইপ অকেজো হয়ে পড়ে থাকলো। লোহার পাইপ উপড়ে নিয়ে কেউ কেউ মারামারি, লাঠালাঠি শুরু করে দিল। উনুন জ্বালা আর রান্নার পাট তুলে দিয়ে লতাপাতা, কাঁচা সব্জি এবং বুনো কন্দ খাওয়ার ধুম পড়ে গেল। খালের জলে সারাদিন দল বেঁধে কাদা পাঁক মাখার মচ্ছব শুরু হলে সে জল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে উঠলো। এই ধরণের অসংখ্য অস্বাভাবিক এলোমেলো ঘটনায় বাবা ক্রমশ বেতাল, বেসামাল হয়ে গেল। বাংলোয় তখনো মাঝে মাঝে নলিনাক্ষকাকা আসতো। ধূলোকাদামাখা ময়লা পোষাক, জট-পাকানো ঝাঁকড়া চুল, হাত পায়ের আঙুলে ধারালো লম্বা নখ, চোখে অমানুষিক দৃষ্টি নলিনাক্ষকাকাকে বুঝিয়ে বদলানোর জন্যে বাবার সব চেষ্টা প্রায় বিফল হয়ে গেছে।

একদিন মাঝরাতে চাঁদের আলোয় বাংলোর মধ্যে দারুণ হৈ-চৈ শুনে জেগে উঠে

বাবা দেখলো, ল্যাংটো শূয়োর মানুষের দল বাংলোর ফুলবাগান খেয়ে সাফ করে দিচ্ছে। বন্দুকটার দিকে তাকিয়েও বাবা নিজেকে সংযত করলো। পরদিন খোঁজ করে বাবা জানতে পারলো, এতোদিনে ঘরে ঘরে শূয়োর শাবকেরা জন্ম নিচ্ছে। সেদিনই বাবা লক্ষ্য করলো যে, সকলের শরীরে লম্বা লম্বা কালো লোম উঠছে। গলায় সেই ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ। দুদিন পরেই তারা জেনারেটর, জলের ট্যাঙ্ক ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল।
নলিনাক্ষকাকা ওদের হয়ে সাফাই গাইলো—আলো, জল আর সহ্য হয় না। তাছাড়া ওগুলো বাদ দিয়েই যখন চমৎকার চলে যাচ্ছে, তখন বাড়তি বিলাসিতার কি দরকাব ?

বেলা শেষ হয়ে এলো। আমার হাতে বাবার মোটা ডায়েরি, পনেরো বছরের দিন-লিপি। বাবাকে বলি—আর দেরী করার সময় নেই। একটু পরেই জোয়ার এলে লঞ্চ ছাড়বে। চলো লঞ্চে গিয়ে বসি। এখানে অপেক্ষা করলে কোন বড়ো বিপদ বা ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে।
অচেনা, তীব্র চোখে বাবা আমার দিকে একপলক তাকিয়ে, ঘোঁত করে একটা শব্দ তুলে জোর কদমে বাংলোর বাইবে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর অন্ধকার, ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই অচেনা জঙ্গলে, অন্ধকারে বাবার পেছনে ধাওয়া করার সাহস পাই না। মৃত্যুপথযাত্রী, রুগ্না মায়ের ক্লিষ্ট, ক্লান্ত মুখটা বারবার মনে পড়লো। হয়তো বাড়ী ফিরে মাকে আর দেখতে পাবো না। মাকি এখনো বেঁচে আছে! এই ক'দিনে বাবা একবারও মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে নি। বাবার মনুষ্যত্বের মধ্যেও কি দুষ্ট বীজাণু সংক্রামিত হয়েছিল ? তা না হলে মানুষটা এমন হয়ে যায় কি করে ?
আরো অনেকক্ষণ বাবার অপেক্ষায় একাএকা চুপচাপ বসে থাকি। সন্ধে শেষ হয়ে রাত বাড়ে। রহস্যময় অন্ধকার অরণ্যে শূয়োরদের গলার হল্লা, খুশীর চীৎকার ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। বাবা আর ফেরে না।
সতর্ক, সন্তর্পণ ভঙ্গীতে হাতের টর্চ জেলে সমুদ্রেব ধারে এসে লঞ্চে উঠি। এখনি জোয়ার আসবে জানিয়ে সারেং লঞ্চ ছেড়ে দেয়। বাংলাবাজারের তীর-ভূমি ছেড়ে ক্রমশ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলি। অদূরে স্তূপাকৃতি অন্ধকারের মতো বাংলাবাজার আবছা দেখা যায়। আমি মনে মনে বলি, এই অন্ধকার রাজত্বে, তোমরা কাদা পাঁক মেখে, অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে, ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করে, একটা প্রলয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে নিশ্চিহ্ন, নির্মূল হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করো। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন ! ইনসাল্লাহ !! আমেন !!!

বাঁচা মরা যার হাতে

গিয়ার টেনে অ্যাক্‌সিলারেটরে সামান্য চাপ দিতেই বাসের ইঞ্জিনটা গোঁ গোঁ করে গর্জে উঠল। থরথর করে কাঁপতে লাগলো গাড়ীটার গোটা শরীর। তারপব এগিয়ে গেল।

মারাত্মক ঝাঁকুনিতে নিবারণের ভাতঘুমের মৌজাটা নিমেষে ছুটে গেল। ব্যস্ত, ত্রস্ত, বিহ্বলভাবে জানলার পাশের সিটটা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে নিবারণ চেঁচিয়ে উঠল—রোখকে, রোখকে।

কিন্তু থামার অপেক্ষা না করেই ধীর গতির গাড়ীটা থেকে নিবারণ রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল। ড্রাইভার একপলক পেছন ফিরে তাকিয়ে গিয়ার বদলে অ্যাক্‌-সিলারেটরে জোরে চাপ দিল। দুপুরের নির্জন, ফাঁকা রাস্তায় চোখের পলকে বাসটা গতিমান হয়ে ঝড়ের বেগে বিষ্ণুপুরের দিকে চলে গেল। পেছনে পড়ে রইলো হলুদ ধুলোর ঘূর্ণি জট।

বাসটা চলে যেতেই নিবারণের সম্বিৎ ফিরে এল। শরীরে কোন চোট না লাগলেও বোঁ করে মাথাটা ঘুরে গেল। বড়ো ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়েছে। সর্বনাশ! আতঙ্কে গলা শুকিয়ে নিবারণের বুকটা ফেটে যাবার দাখিল হল। ঠকঠক করে শরীরে এমন কাঁপুনি জাগল যে, নিবারণের মনে হল, সে এখনি মাটিতে আছড়ে পড়বে। চেঁচিয়ে তার বলতে ইচ্ছে হল, কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও।

কিন্তু নিবারণ সেটা করল না। এই চরম দুঃসময়ে অশান্ত, উত্তেজিত হয়ে কোন লাভ নেই। এই আমতলা বাজারে ধড়িবাজ, বদ লোক অনেক আছে। নিবারণের বিপদটা আঁচ করতে পারলে ফাঁকতালে তারা একটা দাঁও মারার চেষ্টা করতে পারে।

দুপুরের ঠাঠা রোদে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিবারণকে ঘামতে দেখে মুড়ির দোকানী রাখাল এসে জিজ্ঞেস করল—কি হল বড়োবাবু, একা একা দাঁড়িয়ে কেন?

বুকফাটা এক হাহাকার নিবারণের গলার কাছে এসেও থমকে গেল। নিবারণ বলল—ওরে রাখাল, আমার খুব বিপদ! এখনি কলকাতায় যাওয়ার একটা গাড়ী আমাকে যোগাড় করে দে। ভাড়া যা লাগে দেব।

কি হয়েছে আপনার—রাখাল কৌতূহলী হয়।

দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে আর্ত গলায় নিবারণ বলল—সব্বোনাশ হয়ে গেছে।

সর্বনাশটা যে কি, সেটা রাখাল বুঝতে না পেরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। এই

বাজারের পয়লা নম্বর মহাজন নিবারণকে এ মহল্লার কে না চেনে! তার সঙ্গে রাখালকে কথা বলতে দেখে গুটিশুটি আরো দু'চারজন দোকানী সেখানে এসে জড়ো হয়। সকলেরই এক জিজ্ঞাসা—বড়োবাবুর কি হয়েছে?

বিপদের কথাটা নিবারণ খোলসা করে কাউকে বলে না। ফ্যাকাসে সন্ত্রস্ত মুখে শুধু বিড়বিড় করে—আমার সব্বোনাশ হয়ে গেছে। একটা গাড়ী ডেকে দিয়ে তোরা আমাকে বাঁচা।

পঞ্চাশোর্ধ নিবারণের শক্ত, মজবুত শরীরে কেউ কোন রোগ, ব্যাধির চিহ্ন খুঁজে পায় না। কোমরের লুঙ্গি কসে নিয়ে তেলওলা গণেশ জিজ্ঞেস করল—মা ঠাকরুণ ভালো আছেন তো?

বাসনের দোকানের মালিক সুন্দর হাজরা প্রশ্ন করল—কলকাতা থেকে দাদাবাবুর কি কোন খারাপ খবর এসেছে? ধৈর্যহীন নিবারণ ছটফট করতে করতে বলল—সকলেই ভালো আছে। ঘরে আমার বউ ভালো আছে, কলকাতায় আমার ছেলে ভালো আছে, শুধু আমি ডুবতে বসেছি। তোরা আমাকে বাঁচা।

বাজারের ডাকসাইটে. তেজী মহাজনের এমন অস্থির, ভেঙ্গেপড়া মূর্তি আগে কেউ দেখেনি। তাই সকলেই বিশ্বাস করল যে, বড়োবাবুর সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু সেটা কি, অনেক ভেবেও কেউ মালুম করতে পারল না। কলকাতায় যাওয়ার বাস থেকে যে লোকটা মাত্র দু'চার মিনিট আগে নামল, তার আবার এখনি গাড়ীভাড়া করে কলকাতায় যাওয়ার এত তাড়া কেন! তাহলে বাস থেকে নামার কি দরকার ছিল?

নিবারণের কুচকুচে কালো কপাল বেয়ে কৃষ্ণবর্ণ ঘাম, গাল, গলা ছুঁয়ে, বুকে পিঠে ঝরে পড়ছিল। রক্তাভ, ভাঁটার মতো চোখ দুটোও কেমন অস্বাভাবিক, গোলাকার হয়ে গিয়েছিল। দু'একজন ভাবল—এই উৎকট গরমে বড়োবাবুর মাথাটাই বোধহয় বিগড়ে গেছে।

কিন্তু সে কথা কেউ মুখে বলতে সাহস করল না। রাখাল করিতকর্মা লোক। মিনিট দশেকের মধ্যেই সে জিতেন সাহার গ্যারেজ থেকে একটা পুরোন অষ্টিন গাড়ী এবং গাড়ীর ড্রাইভার জটাকে নিয়ে হাজির হল। জটা ওস্তাদ ড্রাইভার, পাকা হাত। নিবারণ দত্তের নাম শুনে যতীন এককথায় জটাকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।

রঙওঠা, ঝরঝরে গাড়ীটা দেখে নিবারণ খুশি হল না। তবু এই দুসময়ে এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি আছে! একলাফে গাড়ীতে উঠে বসে নিবারণ বলল—বাবা জটা, তাড়াতাড়ি আমাকে কলকাতায় নিয়ে চল্।

দাঁত বার করে হেসে জটা জবাব দিল—আপনাকে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাব বড়োবাবু।

আমি সঙ্গে যাব নাকি—রাখাল জিজ্ঞেস করল নিবারণকে। গাড়ী তখন ছেড়ে দিয়েছে। রাখালের কথা কানে ঢুকল না নিবারণের। জোরাল শব্দ তুলে গাড়ী ছুটলো বিষ্ণুপুরের দিকে। মাথার ওপরে চৈত্র দুপুরের দাউদাউ সূর্য জ্বলছে। রৌদ্রের তাপে কালো হয়ে গেছে দুপাশের শস্যহীন ফাঁকা প্রান্তর। বিশ্বপ্রকৃতি উত্তাপে ধুঁকছে। চারপাশে সীমাহীন নৈঃশব্দ। শুধু পুরোন অষ্টিনের নিখাদ, তীব্র আওয়াজ আর মুঠো মুঠো কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

দারুণ উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে নিবারণ কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। খোলা জানলা দিয়ে মোলায়েম বহতা বাতাস এসে মাথায় লাগতে নিবারণ একটু ধাতস্থ হল। সংকটজনক এই পরিস্থিতিকে ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করতে হবে। এমন গাফিলতি, এমন নির্বুদ্ধিতার কাজ সে আগে কখনো করেনি। করা দূরে থাক, ভাবতেও পারে না। চল্লিশ বছরের ব্যবসায়ী জীবনে এই প্রথম নিবারণ একটা মারাত্মক রকম ভুল করল। কিন্তু কেন করল ? পুরো ঘটনাটা নিবারণ খতিয়ে ভাবার চেষ্টা করে। বয়েসের দরুন কি তার স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে ? কিন্তু এই আটান্ন বছর বয়সেও নিবারণ দিব্যি শক্ত, সমর্থ সক্রিয় আছে। নীরোগ শরীর। মোষের মতো ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। স্নানের সময় নিয়মিত দশ পনেরো মিনিট পুকুরে সাঁতার কাটে। আজো তার কলিজায় অফুরন্ত দম। তবু এই অসম্ভব দুর্ঘটনাটা ঘটল কেন ?

আসলে দুপুরে এক থালা ভাত খাওয়ার জন্যেই নিবারণের এই নাজেহাল অবস্থা। রোজই হয়। ভাত খেলেই শরীরটা মজা কলার মতো হেজে গলে নেতিয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু চেষ্টা করেও দুপুরে ভাত খাওয়ার নেশা নিবারণ ছাড়তে পারেনি। এখন তার গুনাগার দিতে হচ্ছে।

তাছাড়া গত রাতের ক্লান্তিও তার শরীরে কম ছিল না। কাল রাত প্রায় বারোটা পর্যন্ত তাড়ি সহযোগে বেদম ফুর্তি করে বিবিরহাটের রাইমণির ঘরে নিবারণ পড়েছিল। বাড়ী ফিরেছিল মধ্যরাত পার করে। অঢেল পয়সা থাকলেও নিবারণ বিলিতি মদ ছোঁয় না। এটা কার্পণ্য নয়। বিলিতি মদে নিবারণের কোষ্ঠকাঠিন্য বাড়ে। আজ সকালেও মাথাটা বেশ ঝাপসা লাগছিল নিবারণের।

হাডামিল পেরিয়ে গাড়ি ছুটছে ঠাকুরপুকুরে দিকে। ধূধূ শূন্য রাস্তা, সামনে কোন মানুষ বা গাড়ি নেই। এক ভয়ঙ্কর দুর্ভাবনায় উত্তাল হয়ে উঠছে নিবারণের হৃৎপিণ্ড। বাসটাকে ধরা যাবে তো ? জটার দিকে তাকিয়ে নিবারণ দেখল যে, জটাও সামনের আয়না দিয়ে নজর করছে তাকে। নিবারণের একটু অস্বস্তি হল। তবু নিবারণ জিজ্ঞেস করল—হ্যাঁরে, কলকাতায় পৌঁছতে কত সময় লাগবে ?

পঞ্চাশ মিনিটে বাবুঘাট পৌঁছে যাবো—বেশ জোরের সঙ্গেই জটা জবাব দিল। সবই ভগবানের ইচ্ছে—হতাশ ভঙ্গীতে নিবারণ বিড়বিড় করল।

বড়োবাবু, আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন—কেমন চাপা গলায় জটা প্রশ্নটা নিবারণের দিকে ছুঁড়ে দিল। একলহমা জটাকে দেখে নিয়ে নিবারণ বলল—ভগবানকে অবিশ্বাস করার ক্ষমতা কার আছে ?

জটা আর কোন কথা বলল না। নিবারণ আড়চোখে জটাকে একবার দেখল। ময়লা নীল শার্ট আর খাঁকি প্যাণ্ট পরা জটার চোয়াড়ে মুখের একটা দিক দেখা যাচ্ছে। ডানপিটে, তেঁটিয়া ছোকরা হিসেবে আমতলা হাটে জটার বদনাম আছে। কিন্তু নিবারণকে যথেষ্ট সমীহ করে।

দাঁতে দাঁত টিপে, একাগ্র ভঙ্গীতে জটা গাড়ী চালাচ্ছে। রাস্তার দুপাশের মাঠ, বুনোঝোপ আর দু'একটা নিষ্প্রাণ বৃক্ষ বাবলা গাছ দ্রুত পিছনে সরে যাচ্ছে। অথৈ দুশ্চিন্তায় নিবারণ খাবি খাচ্ছে। কেমন এক বুকচাপা, ছন্নছাড়া মানসিকতা। এমন বিভ্রম, এমন ভ্রান্তি তার আগে কখনো হয়নি। বহু লাখ টাকার তেজারতি কারবারের পাই পয়সার হিসেবও তার মনে থাকে। অথচ আজ একি হল ? কার মুখ দেখে সকালে ঘুম ভাঙ্গল আজ ? তখনি নিবারণের মনে পড়ল নকুলের কথা। নিবারণ ঠিক করল, আজই বাড়ী ফিরে ওই শালা অপয়া চাকরটাকে তাড়িয়ে দেবে। নকুলটা শুধু অপয়া নয়, ব্যাটা বেইমান, চোর। আজ সকালেই নিবারণ হাতেনাতে নকুলের চুরি ধরে ফেলেছে। রাতে শুতে দেরী হলেও কাক-ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল নিবারণের। রোজই ভাঙ্গে। ভোরে ওঠা নিবারণের বহুদিনের অভ্যেস। একটা নিমদাঁতন চিবোতে চিবোতে খিড়কির পুকুরের দিকে কিছুটা যেতেই নিবারণ দেখল, কে যেন তার বেগুন ক্ষেতের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে সন্তর্পণে বেগুন তুলছে। নিঃশব্দে এগিয়ে নিবারণ চিনতে পারল নকুলকে। একটা বড় বস্তা তখন কাঁচ বেগুনে প্রায় ভরে ফেলেছিল নকুল। কিন্তু নকুলের দুর্ভাগ্য, বামাল ধরা পড়ে গেল নিবারণের কাছে। রাগে ঝাঁঝা করছিল নিবারণের মাথা। নিবারণ বেধড়ক পিটিয়েছিল নকুলকে। নকুলের নাক মুখ ফেটে রক্ত ঝরেছিল। সেই সাত সকালেও বিস্তর লোক জুটে গিয়েছিল।

তিক্ত মেজাজ নিয়ে দিনটা যে শুরু হল, খাওয়ার সময়েও তার জের কাটল না। নিবারণের থালার সামনে বসে তার স্ত্রী দময়ন্তী সমানে ঘ্যানঘ্যান করছিল। প্রসঙ্গ, বিবিরহাটের রাইমণি। তেড়িয়া মেজাজে খাওয়া শেষ না করেই নিবারণ উঠে পড়েছিল। তারপর ঘর থেকে বেরোবার সময় চৌকাঠের পাশে বসে থাকা দময়ন্তীর পোষা, আদুরে বেড়ালটার পেটে এমন লাথি কসিয়েছিল, যে সেটা প্রায় দশহাত দূরে ছিটকে পড়েছিল।

তখনই নিবারণের মনে হয়েছিল যে, আজ আর বাড়ী থেকে বেরোবে না। একটা দিন না বেরোলে নিবারণ দত্তের ক্ষতি কি ? কিন্তু ভর্তি চটের থলিটা শোবার ঘরের সিন্দুকে রাখা আছে। আজই ব্যাঙ্কে তুলে দিতে হবে। আর একটা দিনও ওই থলিটা বাড়ীতে রাখার সাহস নিবারণের নেই। বছরের এই শেষদিকে এখন নানা দুর্ভোগ আর উৎপাত। ইনকামট্যাক্স আর এক্সাইজের লোকগুলোর দৌরাত্মও এ সময় প্রবল হয়। দিন নেই, রাত নেই, বাড়ীতে এসে হামলা করে। তাছাড়া নিবারণের পিছনে কাঠি দেওয়ার লোকেরই কি কিছু অভাব আছে ? শালারা যেন শকুন শেয়ালের দল। ওত পেতে নখে ধরে দিয়ে বসে আছে।

গত হপ্তাতেই, একরাতে, প্রায় বারোটার সময় জনাপাঁচেক ইনকামট্যাক্সের লোক তার বাড়ী চড়াও করেছিল। ভাগ্য ভালো তারা আসার মিনিট দশেক আগেই নিবারণ খবরটা পেয়ে গিয়েছিল। তা না হলে প্রায় এক থলি সোনা আর লাখ দুয়েক টাকা খোয়া যেত। খবরটা পেয়েই সোনার থলিটা সেই নিশুত অন্ধকারে খিড়কির পুকুরের কালো জলে নিবারণ টুপ করে ফেলে দিয়েছিল। নকুলও হাত লাগিয়েছিল নিবারণের সঙ্গে। থলির সঙ্গে একটা লম্বা দড়িতে এক টুকরো পাটকাঠি বেঁধে দিয়েছিল নিবারণ। পুকুরের পানা, পাতার মধ্যে পাটকাঠিটা ফাৎনার মতো ভাসছিল। ওই পাটকাঠির নিশানা ধরে পরদিন বস্তা উদ্ধারে কোনো অসুবিধে হয় নি। ক্যাশ দু'লাখ টাকা শায়ার পাঁচটা পকেটে পুরে পুতুলের মতো বসেছিল দময়ন্তী। কার বাবার সাধ্য তাকে সন্দেহ করে! দময়ন্তীর জন্যে পাঁচটা পকেট লাগানো দুজোড়া স্পেশাল শায়া দর্জি ডেকে নিবারণ তৈরী করিয়েছিল। কত আপদ বিপদের জন্যেই না তাকে প্রস্তুত থাকতে হয়! সেই সোনার অর্ধেকেরও বেশী ইতিমধ্যে লকারে জমা হয়ে গেছে। বাকী সোনা আর দুলাখ টাকা আজই ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

আপসোসে নিবারণের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল।

নিবারণের হঠাৎ মনে হল বড় ঢিমে গতিতে গাড়ীটা চলছে। অথচ এই ফাঁকা রাস্তায়, জটার মতো পাকা ড্রাইভারের হাতে এ গাড়ী তো পক্ষীরাজের বেগে ছুটবে। জটা কি শত্রুতা করছে নাকি ? নিবারণের বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে উঠল। কিন্তু মুখে মনের ভাব প্রকাশ না করে বেশ নরম গলায় নিবারণ বলল—একটু টেনে চল্ জটা।

মুখে একটা ধূর্ত হাসি খেলিয়ে জটা জবাব দিল—ভগবান আপনাকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেবে।

ঈশ্বরকে নিয়ে এই ধরণের ইয়ার্কির কথা শুনে রাগে নিবারণের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু এখন রাগারাগির সময় নয়।

শান্ত স্বরে নিবারণ বলল—ভগবানকে নিয়ে ঠাট্টা করিস না জটা।

গম্ভীর জটা একমনে গাড়ী চালাচ্ছে। নিবারণের কথা সে শুনতে পেল কিনা কে জানে! এবার জটাকে শোনাবার জন্যেই নিবারণ বলল—ভগবানই সব কাজের কর্তা, আমরা নিমিত্তমাত্র। তাই আমাদের কাজ করতে হয়।

নিবারণের কথায় জটা কোন সাড়া করে না। জটাকে তোয়াজ করার জন্যে নিবারণ বলল—ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই তোর মত একজন পাকা ড্রাইভার পেয়ে গেলুম।

নিবারণের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাঁচ করে একটা মোক্ষম ব্রেক কসে অষ্টিনটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কি হল—বিপুল আতঙ্কে জিজ্ঞেস করল নিবারণ।

মুচকি হেসে জটা জবাব দিল—এবার ভগবান ষ্টিয়ারিং ধরবে।

নিবারণ ভয়ে হকচকিয়ে গেল। এই আকাট মুখ্যুটাকে ভগবানের কথা শোনাতে গিয়ে বিপদ হল দেখছি! চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। নিবারণ বেশ ব্যাকুলভাবেই বলল—জটা আমাকে ডোবাসনি।

জটা তখন একটা বড় ঘুনি গাছের আড়ালে প্যান্টের বোতাম খুলে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেখান থেকেই দরাজ গলায় সে বলল—ঘাবড়াবেন না বড়োবাবু। কাঁটায় কাঁটায় পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে বাবুঘাটে পৌঁছে দেব।

জটার কথা শুনে নিবারণ আশ্বস্ত হল। গাড়ী আবার চলতে শুরু করতে নিবারণ বলল—তুই এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি।

নিবারণকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জটা খ্যাকখ্যাক করে হাসতে লাগল। নিবারণের মনে হল, তার সময়টা বড় খারাপ যাচ্ছে। বাড়ীতে একটা গ্রহশান্তি করা দরকার। সরকারি লোকগুলোর পিছনে ফি মাসে প্রচুর টাকা ঢেলেও কাজ হচ্ছে না। ওদের মধ্যেও নানা গণ্ডগোল, কোঁদল। অফিসার থেকে চুনোপুঁটি সবাই রাজনীতি করছে। তার সঙ্গে মিশেছে নিবারণকে নিয়ে তৈরী এই দেশ-গাঁয়ের নানা গালগল্প। লোকের ধারণা, নিবারণ বাড়ীতে টাকা ছাপায়, তার ঘরে সোনা তৈরীর কল আছে। এসব গাঁজাখুরি কাহিনী হিংসুটে, গেঁয়ো লোকেদের রটনা। নিবারণের আয় এমন কিছু নয়। দৈনিক গড়ে পাঁচ, সাত-হাজার টাকা মহাজনী কারবার এবং সোনা কেনাবেচা থেকে আসে। তাছাড়া তিনপুরুষের কারবারের সুবাদে যে পরিমাণ সোনা বাড়ীতে জমে গেছে, তার হিসেব কষতে একটু সময় লাগবে। কেননা বিশ পঞ্চাশ বছর আগে বাপ-ঠাকুর্দারা ষাট, সত্তর বা আশি টাকা ভরি হিসেবে যে সোনা জমা রেখেছিল, এখন তার ভরি প্রতি মূল্য বারো, তেরোশো টাকা। এই হিসেবে কয়েক বস্তা বন্ধকী

সোনা গলিয়ে, পাইন মেরে বেচেবুচে নির্ভুল টাকার অঙ্কটা বার করা খুব সহজ কাজ নয়।
গাড়ীটা ঠাকুরপুকুর পেরোতেই রাস্তায় মানুষজন, গাড়ীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। দু'একটা সবুজ রঙের বাস চোখে পড়তেই নিবারণের উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল। কিন্তু না, কোনটাই ডায়মণ্ডহারবার লাইনের বাস নয়। এ লাইনের সব বাসের নম্বর নিবারণের মুখস্থ। প্রায় সব বাসের মালিক, ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টরদেরও নিবারণ চেনে। নিবারণের কাছ থেকে কর্জ করা টাকায় কেনা পাঁচ সাতটা বাস এ রুটে চলছে।
পলাতক বাসটাকে ধরার জন্যে নিবারণ অধীর আগ্রহে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার বুকের মধ্যে অবিরাম গুড়গুড় ধ্বনি আর হাহাকার। নগদ টাকা আর সোনা মিলিয়ে প্রায় দশ লাখ টাকার সম্পত্তি চোখের পলকে হাতছাড়া হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার জন্যে একটা পুরোন চটের রেশন ব্যাগে প্রায় দশ কেজি সোনা আর দু'লাখ টাকা পুরে নিবারণ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। সোনা আর টাকার ওপর কিছু চাল, ডাল, পুঁই আর পালংশাক। দেখে বাজারের থলি ভিন্ন অন্য কিছু ভাবার উপায় ছিল না। লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার এই কৌশল নিবারণেরই মৌলিক আবিষ্কার। জানলার পাশের সিটটায় বসে হাতের থলিটা নিবারণ সেই সিটের তলাতেই রেখেছিল। গ্রীষ্মের অলস, মন্থর দুপুরে গাড়ীতে যাত্রীও বিশেষ ছিল না। নিবারণের পাশের সিটটা খালি পড়েছিল। ফাঁকা রাস্তায় হুহু করে গাড়ী ছুটল। তার মধ্যেই নিবারণের চোখে নামলো কালঘুম। কখন যে আমতলা এল, গেল, নিবারণ টের পেল না। ঘুমের চটকা ভেঙ্গে চলন্ত বাস থেকে রাস্তায় নেমেই দেখল, তার হাত খালি। সাত রাজার ধন, একটা জীর্ণ মলিন থলি ভর্তি করে সে বাসেই ফেলে এসেছে। রক্ত জল করা উপার্জন এক পলকে বেহাত হয়ে গেছে। নিবারণের মনে হচ্ছিল সে পাগল হয়ে যাবে। দেয়ালে মাথা কুটতে ইচ্ছে করছিল তার।
নিরীহ ভঙ্গীতে জটা জিজ্ঞেস করল –বাবুঘাট থেকে কোথায় যাবেন বড়োবাবু ?
ব্যস, ওই বাবুঘাট পর্যন্তই—নিবারণ ক্ষীণ গলায় বলল। তারপরই অদূরে একটা সবুজ বাস দেখিয়ে উত্তেজিত গলায় নিবারণ বলল—জটা, ওই বাসটাকে ধরতে হবে, জলদি চালা।
জটা অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিল। পৈলানের কাছে দু'চারজনযাত্রী ওঠানামা করার সময়েই অস্টিনটা ধরে ফেলল বাসটাকে। কিন্তু না, এটা সে গাড়ী নয়। থলিসহ সেই বাসটা যেন রাস্তা থেকে কর্পূরের মতো উবে গেছে। নিবারণের বুকটা তোলপাড় করতে লাগল। হয়ত আর একটু এগোলেই বাসটার দেখা মিলবে। কিন্তু বাসটাকে ধরতে পারলেই কি থলিটা উদ্ধার হবে ? এতোটা

পথে কম যাত্রী ওঠানামা করেনি। বেওয়ারিশ থলিটা দেখে কেউ কি ফেলে যাবে ? একটা করুণ হায় হায় ধ্বনি নিবারণের বুকের মধ্যে মাথা খুঁড়তে থাকে। নিজের দোষেই সে আজ ডুবতে বসেছে। কাকে দায়ী করবে ?

জটা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল—বড়োবাবু কি কোন বাসের পেছনে ধাওয়া করেছেন ?

নিবারণ একটু থতমত খেল। তারপর বলল—হ্যাঁ। আমাদের রুটের একটা বাসে বাজার ভর্তি থলিটা ফেলে নেমে পড়েছিলুম।

অনেক বাজার করেছিলেন—সামনের রাস্তার ওপর নজর রেখে নিরীহ ভঙ্গিতে জটা প্রশ্ন করল।

নিবারণ ক্ষিপ্ত হচ্ছিল ভেতরে ভেতরে। জটা যে এত সেয়ানা, এটা নিবারণের ধারণা ছিল না। এক মুহূর্তের নীরবতার মধ্যেই একটা যুৎসই জবাব নিবারণ তৈরী করে ফেলল। বলল- বিলেত থেকে একটা দামী ওষুধ আনিয়েছিলুম। ওটা আমার প্রাণ. ওটা না পেলে আমি মরে যাব। ওই ওষুধ এদেশে কোথাও পাওয়া যায় না।

কান্নায় নিবারণের গলা বুজে আসছিল। তবুও বাঁকা চোখে সে একবার জটার মুখটা দেখার চেষ্টা করল।

আগে বলবেন তো—উদ্দীপ্ত গলায় জটা বলল—ও বাসকে এখনি ধরে ফেলব।

নিবারণ বুঝলো যে তার ওষুধের গল্প জটা ষোল আনা বিশ্বাস করেছে। ছেলেটা খুব খারাপ নয়। পরম নির্ভরতায় নিবারণ বিড়বিড় করল—ভগবান, ভগবান।

হঠাৎ ক্ষেপে উঠে অস্টিনটা এখন ঝড়ের গতিতে ছুটছে। দুপাশের গাড়ীঘোড়া মানুষজন অবাক বিস্ময়ে ঝরঝরে গাড়ীটার দিকে তাকিয়ে আছে।

জটা জিজ্ঞেস করল—বাবু, পলানের কথা মনে আছে ?

কোন পলান—প্রশ্নটা শুনে একটু চমকে উঠে নিবারণ বলল।

শামুকপোতার পলান—জটা জানাল- সে এখন বদ্ধ পাগল, উস্থির হাটে প্রায় ল্যাংটো হয়ে পড়ে থাকে।

পলানের নাম শুনে নিবারণের মুখ কঠিন এবং দুচোখের দৃষ্টি ভ্রুকুটিকুটিল হয়ে ওঠে। অস্বস্তি সামলে নিবারণ বলে—তাই নাকি ? নেশা ভাঙ করেই পলানটার এই দশা।

জটা একটু নড়ে চড়ে বসল। সংশয়াম্বিত চোখে নিবারণ দেখল জটাকে। মনে হল জটা যেন মুচকি হেসে এখনি প্রশ্ন করবে—শুধু কি নেশাভাঙ ? পলানের ভিটে জমি নিলেম করে দেশ গাঁ থেকে তাকে কে উৎখাত করল ?

জটা কিন্তু আর কথা বলল না। আবার একটা সবুজ বাস দেখে নিবারণ চেঁচিয়ে উঠল—ওই বাসটা।

কিন্তু বাসটার কাছাকাছি পৌঁছে হতাশ হলো নিবারণ। না, এটাও নয়।

জটা চাপা গলায় এবার প্রশ্ন করল—পলানকে ভগবান কেন দেখল না বড়োবাবু।

এমন একটা প্রশ্নের জন্যে নিবারণ তৈরী ছিল না। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর ধমকের সুরে বলল—বেশি কথা বলিস না জটা। এ্যাকসিডেন্ট করে বসবি।

কিন্তু আড্ডাবাজ জটার মুখ বন্ধ করার সাধ্য নিবারণেব নেই। তারপর বড়োবাবুকে গাড়ীতে একা পেয়ে তাকে গপ্প যেন ভর করেছে।

রাস্তার ওপরে নজর রেখে জটা বলল—জানেন বড়োবাবু আলিপুর কোর্টে সেদিন জগু পাঁজার সঙ্গে দেখা হল। অমন দশাসই মানুষটার কি চেহাবা হয়েছে। শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে।

নিবারণের শরীর বিপুল ঘামছিল। জগু পাঁজাব নাম শুনে হৃৎপিণ্ডটা মুচড়ে উঠল কয়েকবার। মাস দুয়েক আগে নিবারণের বাড়ীর বাসন চুরির অভিযোগে জগুকে ধরে পুলিস সদরে চালান করেছিল। চুরির মাল জগুর বাড়ীব পুকুর-ঘাট থেকে উদ্ধার করেছিল পুলিস। চুরির বিচার এখনও শেষ হয়নি।

জটা বলল, দেখা হতে কোর্টের মধ্যে একসময় জগুকে জিজ্ঞেস করেছিলুম তুমি চুরি করলে কেন? জগু জবাবে বলল—ভগবান জানে, আমি চুরি করি নাই।

নিদারুণ মানসিক চাপে নিবাবণেব বুকটা ধকধক করছিল। নিবারণ ভাবল, জটা কি শয়তানী করছে? জগুর বাসন চুরিব রহস্য কি জটা জেনে গেছে? নকুলের মারফৎ বাড়ীর এঁটো বাসনগুলো গভীর রাতে জগুর পুকুরে যে নিবারণই ডুবিয়ে রেখেছিল, এ খবরকি জটার কানে নকুলই তুলে দিয়েছে?

দমবন্ধ করা এক সন্দেহ বুকে নিয়ে নিবারণ গুম হয়ে বসে থাকে।

জগুর প্রসঙ্গ জটা আর তোলে না। নিজের মনেই সে বকে যায়। বলে—সেদিন আপনাদের গাঁয়ের কার্তিক দাশের সঙ্গে দেখা হল। ড্রাইভারি করার এই সুবিধে। বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কার্তিক এখন বেহালা বাজারে মজুর খাটে।

কার্তিকের নাম শুনে নিবারণের মাথাটা বড় ঝিমঝিম করছিল। ওর মনে হচ্ছিল, সামনে বসা লোকটা জটা নয়, অন্য কেউ। বড় রহস্যময় তার চেহারা আর গলার স্বর। জটার ছদ্মবেশে ওই মানুষটা ক্রমশ তাকে নিস্তেজ, পঙ্গু করে দিচ্ছে। কার্তিকের কথা উঠতেই সেই লোমহর্ষক দৃশ্যটা চকিতে নিবারণের মনে পড়ল। লিচু গাছের মগডালে গলায় ফাঁস লাগিয়ে কার্তিকের গর্ভবতী বোন পদ্মবালা ঝুলছে। কার্তিকের বউয়ের কান্নায় থরথরিয়ে কেঁপে উঠছে সকালের মেঘলা আকাশ। কিন্তু এই আত্মহত্যায় নিবারণের কোন দায়িত্ব নেই। বাপের বাড়ী বেড়াতে এসেছিল পদ্ম। সেই সুযোগে তার গলার সরু হারটা তার বাকস

থেকে চুরি করে কার্তিক বাঁধা দিয়েছিল নিবারণের কাছে। কার্তিক চেয়েছিল সোনার টাকায় আর এক মহাজনের কাছ থেকে বন্ধকী জমিটা উদ্ধার করতে। উদ্ধারও করেছিল জমিটা। পদ্মমণিকে বলেছিল—কাঁদিস নি, ফসল উঠলেই তোর হার এনে দেব।

কিন্তু পদ্মর শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা সেকথা শুনবে কেন? তার ওপর পদ্মর স্বামীটাও ছিল গোঁয়ার। পোয়াতি বউটাকে মেরে দুর করে দিল ভিটে থেকে। পদ্ম এসে কেঁদে পড়লো কার্তিকের কাছে। শেষ পর্যন্ত জমি বেচার টাকা নিয়ে কার্তিক যখন নিবারণের গদীতে এল, তখন বন্ধকী উদ্ধারের তিনমাস কেটে গেছে।

নিবারণের কিছু করার ছিলনা। সব ব্যবসারই দু'চারটে নিয়মকানুন আছে। সেগুলো না মানলে ব্যবসা লাটে ওঠে। কার্তিকের বোনের গয়না ফেরৎ দিলে গাঁয়ের আরো দু'পাঁচশো মানুষ এসে কেঁদে পড়বে। তখন কি হবে?

নিবারণের হঠাৎ মনে পড়ল তার হারানো থলিতে পদ্মর সোনার হারটা এখনো অক্ষত আছে।

জটার কথা তখনো শেষ হয়নি। সে বলছিল—কার্তিকের সঙ্গে দেখা হলেই তাকে দেশে ফেরার জন্যে মতলব দিই। কিন্তু সে কিছুতেই আর ওমুখো হবে না। বলে, গরীবের দেশ নাই, ভগবান নাই।

কি এক আতঙ্কে নিবারণ ককিয়ে উঠল—চুপ মার জটা, চুপ মার।

কেন চুপ মারবো কেন—বাধা পেয়ে জটা মুখিয়ে ওঠে। বলে—কার্তিকের কথাটা কি ভুল?

একদম ভুল—নিবারণ জবাব দিল—ও একটা নাস্তিক। নিবারণের আর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। কণ্ঠনালী শুকিয়ে জ্বালা করছিল। জটাও নির্বাক হয়ে গেছে।

মোমিনপুর পেরোতেই সেই বহু আকাঙ্খিত মূল্যবান বাসটা দেখে উল্লাসে নিবারণ হৈ হৈ করে উঠল—পেয়েছি, পেয়েছি, ওই সেই বাস।

জটাও সায় দিয়ে বলল—ঠিক বলেছেন বড়োবাবু, ওটা আমাদের রুটের গাড়ী। রাস্তায় লোকজন, যানবাহনের সংখ্যা এখন বাড়লেও সেরকম কিছু ভীড় বা জ্যাম নেই। সবুজ বাসটা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। সেটাকে তাড়া করেছে জটার অষ্টিন। শরীর মনের সাময়িক অবসাদ কেটে গিয়ে নিবারণের বুকের রক্ত উত্তেজনায় চনমন করছে। নিবারণ চেঁচাচ্ছে—টেনে চল জটা, টেনে চল। বাসের হদিশ যখন মিলেছে, তখন ওষুধটাও পেয়ে যাবো।

জটা বেপরোয়া গাড়ী চালাচ্ছে। নিবারণ বলল—বুঝলি জটা, ঈশ্বর আছেন। তিনি রাখলে কে মারবে?

ঝোড়ো গতির গাড়ির ষ্টিয়ারিং ধরে ঠাণ্ডা গলায় জটা জবাব দিল—না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

ও কথা মুখে আনিস না জটা—কম্পিত গলায় বিড়বিড় করল নিবারণ।

আচ্ছা বড়োবাবু, রাইমণি দাসীর ছেলেটার কি হল—ঠাণ্ডা গলায় জটা প্রশ্নটা নিবারণের দিকে ছুঁড়ে দিল।

একি সর্বনেশে প্রশ্ন! নিজের কানকে নিবারণ বিশ্বাস করতে পারল না। জটার কাছ থেকে এমন প্রশ্ন নিবারণ প্রত্যাশা করেনি। আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে গেল নিবারণ। ভীষণ রকম হৃৎকম্প শুরু হল তার। তবু শান্ত স্বাভাবিক গলায় নিবারণ জিজ্ঞেস করল—রাইমণি দাসী কে?

বিশবছর আগে আপনার ঘরে ঝিগিরি করতো—জটা জানাল—এখন বিবিরহাটের বাসিন্দা।

নিবারণের মুখের পেশীগুলো কঠিন, টানটান হয়ে উঠল। রাইমণির ছেলের খবর জটা জানল কি করে! কি এক ভয় এবং সংশয়ে রুদ্ধশ্বাস নিবারণ বলল—রাইমণির সে ছেলে বিশবছর আগে ওলাউঠোয় মারা গেছে। তখন তার বয়েস ছিল সাত।

ছেলেটা কি সত্যি মরেছিল—জটা প্রশ্ন করল।

সিটের ওপর নিবারণ ছিটকে ওঠে। তারপর বলে—অবশ্যই মরেছিল। আমি নিজে তাকে বেহালার হাসপাতালে ভর্তি করেছিলুম।

জটা কি যেন ভাবছিল। ষ্টিয়ারিং ধরা তার দুটো মুঠি থরথর করে কাঁপছিল।

নিবারণ বলল—ওলাউঠো হলে ভগবানও বাঁচাতে পারে না।

ভগবান তাকে বাঁচায়নি, মারতেও পারেনি—জটা মন্তব্য করল—তবু সে বেঁচে উঠেছিল।

সে কোথায়—নিবারণ খোঁচালো।

আছে—জটা বললো। তারপর নিবারণের দিকে একপলক তাকিয়ে রহস্যময় হেসে যোগ করল—ইচ্ছে মৃত্যু ছাড়া সে ছেলের মরণ নেই।

এক অশুভ সম্ভাবনায় নিবারণের অন্তরাত্মা পর্যন্ত কুঁকড়ে উঠল। কথা বলার শক্তিও যেন তার নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সবুজ বাসটা খিদিরপুর ব্রিজের মুখে পৌঁছে গেল। জয়গুরু! ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে গেছে বাসটা। এখনি ওটা ধরা পড়বে। নিবারণ দেখল জটা দরদর করে ঘামছে। হাওয়ায় উড়ছে তেলকালি মাখা জটার রুক্ষ তামাটে চুল। সবকটা বোতাম খোলা, ময়লা নীল বুশশার্টটা জটার বুকের দুপাশে পাখীর ডানার মতো পতপত করছে। নিবারণের মনে হল জটা যেন এখনি আকাশে উড়ে যাবে। স্টিয়ারিং ধরা জটার ডানহাতের মধ্যমায় মানুষের খুলি খোদাই করা একটা

স্টিলের আংটি। খুলির দুচোখে জলজ্বল করছে দুটো লাল পাথর। সামাল, জটা সামাল—আতঙ্কে চীৎকার করল নিবারণ।

একটা মালবোঝাই লরির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বমুহূর্তে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে অস্টিনটা দাঁড়িয়ে গেল। লরির ড্রাইভার জানলা দিয়ে মুখ বার করে জটাকে একটা জঘন্য গাল দিল।

জটা ভাবলেশহীন, নির্বিকার। অনিবার্য মৃত্যুকে নিমেষের জন্যে প্রত্যক্ষ করে আতঙ্কে নিবারণের হৃৎপিণ্ডটা প্রায় গলার কাছে উঠে এসেছিল। কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! নিবারণ বলল—তুই আমায় মারবি নাকি ?

বড় রাস্তার ওপর চোখ রেখে কেমন এক গভীর স্বরে জটা জবাব দিল—তাতে লাভ কি ?

কথাটার অর্থ নিবারণ ধরতে পারল না।

জটা বলল—বেঘোরে আপনি মরবেন না।

গাড়ী তখন রেসকোর্স ছুঁয়েছে। বাঁদিকে ঘাসের ওপর গাড়ীটা দাঁড় করিয়ে জটা বলল—বড়োবাবু ট্যাক্সি ধরুন। এ গাড়ী আর যাবে না, ব্রেক ফেল করছে।

জটা, দোহাই তোর, আমাকে ডোবাস না—নিবারণ আর্তনাদ করে উঠল।

জটার মন তাতে গলল না। নিজের হাত ঘড়িটা দেখে সে বলল—এখন হাঁটতে শুরু করলে দশ মিনিটে আপনি বাবুঘাট পৌঁছে যাবেন।

রৌদ্রদগ্ধ, ফাঁকা রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিবারণ ডুকরে উঠল—এ কোন তেপান্তরের মাঠে আমায় ছেড়ে দিলি জটা ? জটা তাকাল না। হতাশ নিবারণ একটা ট্যাক্সি খুঁজতে লাগল। এখনি একটা ট্যাক্সি চাই। শেষ দুপুরের কড়া রোদের নীচে দাঁড়িয়ে চারপাশে ছুটে চলা যাবতীয় গাড়ীকে নিবারণ ডেকে, হেঁকে থামাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেউ থামে না। দু'একটা খালি ট্যাক্সি, নিবারণের ভাবভঙ্গী দেখে, তাকে পাগল ভেবে দ্রুত পালিয়ে যায়।

ঠিক তখনই নিবারণ দেখল, যে, জটার অস্টিন কখন যেন নিঃশব্দে স্টার্ট নিয়ে অবলীলায় বাবুঘাটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

জটা, জটা—আকাশ ফাটিয়ে নিবারণ চেঁচাল—আমাকে নিয়ে যা।

জটার কানে নিবারণের ডাক পৌঁছোল কিনা বোঝা গেল না। অস্টিন দ্রুতগামী হল।

ট্যাক্সি, ট্যাক্সি—নিবারণ আবার হাঁকডাক শুরু করল। এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তার মাথায় প্রলয় নাচন জুড়ল। জটার মতলব এতোক্ষণে পরিষ্কার, প্রাঞ্জল হল নিবারণের কাছে। শালা শয়তান, শূয়োর, হারানো থলির রহস্য আঁচ করেছে। নিবারণের আর অপেক্ষা করার ধৈর্য ছিল না। খোলা রাস্তা ধরে সে বাবুঘাটের দিকে দৌড় দিল। পায়ের নীচে গলাগলা চটচটে পীচ, মাথার ওপর দাউদাউ

সূর্যের দাবদাহ। রৌদ্রে ঝলসে যাচ্ছে শরীর, পদেপদে শিথিল হচ্ছে গতি, তবু কি এক ঘোরে নিবারণ এগিয়ে চলল।

সেই সবুজ বাসটাকে টার্মিনাসে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অষ্টিনের গতি কমিয়ে জটা ভাবল যে, বড়োবাবুর থলিটা ওখান থেকে তুলে নিলে কেমন হয়! তারপর ওষুধ ভর্তি থলিটা মাঝগঙ্গায় বিসর্জন দেবে। রোগের জ্বালায় বিনা ওষুধে নিবারণ দত্ত ছটপট করে মরলে জটার কি ক্ষতি! বাসষ্ট্যাণ্ডের কাছাকাছি এসে জটার মনে হল, এটা ঠিক হবে না। মানুষকে এভাবে ঘায়েল করায় কোন বীরত্ব নেই। লরির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেয়েও এটা ছেলেমানুষী কাজ। অন্য পথ, অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হবে। অষ্টিনের গতি বাড়িয়ে বাবুঘাটে ছুঁয়ে জটা উত্তর দিকে চলে গেল।

মিনিট পাঁচ সাত পরে আলুথালু চেহারায় পাগলের মতো সেই বাসটার কাছে নিবারণ এসে পৌছোল। ঘোলাটে, শূন্য দৃষ্টি। কণ্ডাক্টর পঙ্কজকে দেখে নিবারণ বলল—আমার থলি?

মুচকি হেসে পঙ্কজ জানালো—আছে।

নিবারণ বিমূঢ়, নির্বাক হয়ে গেল। থলিটা আছে? কোথায়, কিভাবে আছে এসব কোন প্রশ্ন করার শক্তি নিবারণের ছিল না। মনে হচ্ছিল এক বিশাল নাগরদোলায় সে বাঁইবাঁই ঘুরছে, যে কোন মুহূর্তে অচেতন হয়ে যেতে পারে।

পেটমোটা, ভারী চটের থলিটা ড্রাইভারের কেবিন থেকে এনে পঙ্কজ তুলে দিল নিবারণের হাতে। থলিটা দুহাতে বুকে জড়িয়ে নিবারণ বাসের একটা সিটে বসলো। অনুভব করেই নিবারণ বুঝেছিল যে, থলির ভেতরের মালকড়ি সব ঠিক আছে। নিবারণের সামনে এসে পঙ্কজ বলল—বড়োবাবু, পাঁচটা টাকা দিন, চা খাব।

পকেটে হাত ঢুকিয়েও নিবারণ থমকে গেল। এতোক্ষণে নিবারণের লুপ্ত আত্ম-বিশ্বাস আর সাহস ফিরে এসেছে। নিবারণ বলল—এ্যাঁ, বলিস কি? এই সামান্য থলি উদ্ধারের জন্যে পাঁচ টাকা দিতে হবে!

পকেট থেকে দুটো টাকা বার ক'রে পঙ্কজের হাতে দিয়ে নিবারণ বলল—তাড়াতাড়ি চা খেয়ে গাড়ী ছাড়।

পঙ্কজ চলে গেলে ফাঁকা বাসের মধ্যে দুহাতে থলিটা জাপটে ধরে নিবারণ একা বসে রইল। এত শ্রম, এত ক্লান্তি আর উত্তেজনা সফল হয়েছে। তবু কি এক সূক্ষ্ম, গভীর আতঙ্ক ধীরে ধীরে নিবারণের চেতনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। দিন শেষ হয়ে ছায়া ঘনাচ্ছিল চারপাশে। নিবারণেব মনে হলো, কাছাকাছি কোথাও জটা ঘাপটি মেরে লুকিয়ে লক্ষ্য করছে তাকে। এখন থেকে জটা সারাজীবন তাকে লক্ষ্য করবে।

থরহরি কম্প

কানের কাছে ঝাল ঝাড়ার ভঙ্গীতে চাপা গলায় কে যেন বললো—শুয়োরের বাচ্চা।

কমল চমকে পেছনে তাকাল। না, আশপাশে কেউ নেই। অথচ এতো স্পষ্ট, পরিষ্কার সে কথাটা শুনতে পেল যে মনে হল, কেউ যেন তার ঘাড়ের ওপর চেপে তাকেই এমন কদর্য ভাষায় খিস্তি করলো। কয়েক মিনিট আগেও কমল এই গালাগালটা আর একবার শুনেছে। বাস স্টপে অফিস যাত্রীর ভীড়। ভাঙ্গা, উঁচুনীচু রাস্তায়, ফুটপাথে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাসের জন্যে হা পিত্যেশ অপেক্ষা করছে। কেউ কাউকে চেনে না, চিনতে চায় না। মানুষকে চিনলেই কিছু ভদ্রতা আর দায়িত্ব কাঁধে চাপে। এই মুহূর্তে তারা প্রত্যেকে পরস্পরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, দাঁতে দাঁত চেপে সকলের আগে বাসে বা ট্রামে ওঠার জন্যে তারা এখন এক নিঃশব্দ মারমুখী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। গালাগালটা তাই আগে একবার শুনেও কমল খেয়াল করে নি। রোজ রাস্তায়, দোকানে, বাজারে, অফিসে এমন কতো কুৎসিত কথা তার কানে আসে। চারপাশের গুম হয়ে থাকা মানুষগুলো যে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে, এটা কমল বুঝতে পারে। নিরীহ, ছাপোষা কমল, মধ্যবিত্ত সংসারী মানুষ। সে জানে, অযথা উত্তেজনা ভালো নয়। মাথা ঠাণ্ডা না রাখলে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। যে সয় সে রয়।

তবু এই সকাল সাড়ে নটায় প্রকাশ্য দিবালোকে কে তাকে এমন সোজাসুজি গাল দিল, এটা সে ধরতে পারে না। বাস স্টপ্ ভর্তি লোক। দু'একজন তাকে দেখছে। হয়তো তার লাঞ্ছিত অপদস্থ হওয়াটা এই লোকগুলো উপভোগ করছে। কি এক লজ্জা আর অপমানে কমলের বুকটা জ্বালা করে। উদাসীন ভঙ্গীতে চারপাশে তাকিয়ে ও দোষীর সন্ধান করে।

পেটভর্তি মানুষ নিয়ে একটা বাস হৈ হৈ করে এসে গেল। চেরা দরজা দিয়ে মানুষ উপচে পড়ছে। পাদানিতেও পা রাখার জায়গা নেই। দুজন মাঝ-বয়েসী লোকের সঙ্গে কমলও চলন্ত বাসটার পেছনে দৌড়োয়। ধুলো আর ধোঁয়ার পিচকিরিতে তার শরীর ঢেকে যায়। বাস দাঁড়ায় না। সবকিছুর হালচাল দেখে কমল বড়ো অসহায় বোধ করে। কোনরকমে একবার অফিসে পৌঁছোতে পারলেই তার দায়িত্ব শেষ। কাজ করুক আর না করুক, মাসকাবারি

মাইনেটা পেয়ে যাবে। হাজিরাই বড়ো ব্যাপার, কাজ কিছু নয়। কাজ কেউ করে না, কাজ করা কেউ চায় না। তাছাড়া শরীরের সব রস, কষ, শক্তি, ট্রাম বাসের হাতল, পাদানি, রাস্তার পীচ আর কাদায় মিশে গেলে কোন মানুষ কাজ করতে পারে! তবু কমল কাজ করে। কোন যুক্তিতেই সে দায়িত্ব এড়াতে চায় না। তবে আজকাল রাতে বিছানায় শুয়ে তার বৌকে ছুঁতে ইচ্ছে করে না।

ঢং ঢং শব্দ করে একটা ট্রাম চলে যায়। এক বৃদ্ধ ট্রামে ওঠার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করে হাঁপাতে হাঁপাতে রাস্তায় বসে পড়ে। রুমাল দিয়ে মুখের ধুলো আর ধোঁয়ার সর মুছতে মুছতে কমল দেখে ব্যস্ত মানুষের ভীড়ের নক্সা কি দ্রুত ছত্রখান হয়ে আবার নতুন চেহারা নেয়। ঠিক তখনই তার কানের পাশে তেতো গলায় কে যেন বলে—শুয়োরের বাচ্চা।

কমল লাফিয়ে উঠে ঘাড় ফেরায়। ঠিক তার কাছাকাছি এমন একজনও নেই, যার গলা এমন নিখুঁত, স্পষ্ট সে শুনতে পারে। অথচ কেউ একজন যে তাকে বারবার গাল দিয়ে উত্তেজিত করছে, এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই লোকটাকে সে কিছুতেই হদিশ করতে পারছে না। হাত দশেক দূরে ছুচোর মতো মুখ, মর্কট চেহারার একজন মানুষ সন্দেহজনক ভঙ্গীতে আকাশ দেখছে। ফ্যাকাসে, অবান্তর এই আকাশটা দেখার ভান করে আত্মগোপন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কমলের ডান পাশের মাঝবয়েসী লোকটা পকেটে হাত ঢুকিয়ে মহা আরামে চুলকোচ্ছে! চুলকুনির বহর দেখে দুনিয়া সম্পর্কে তার ডোণ্ট কেয়ার ভাবটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এরকম রুচিহীন অসভ্য লোকের মুখে কোন কথা আটকায় না। চাঁদির ফ্রেমের চশমা পরা, লম্বা চুল, কোলকুঁজো ঘাড়, আরো একজন মিশমিশে কালো রঙের লোককে ল্যাম্পপোষ্টের নীচে কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কমলের চোখ আটকে যায়।

এই সেই লোক, কমল ভাবে, মুখে রহস্যময় মুচকি হাসি, সাবলীল ভঙ্গী, ল্যাম্পপোষ্টের তলায় দাঁড়িয়ে একটানা পা নাড়াতে নাড়াতে অচেনা লোককে গাল দিয়ে মজা পায়। আলসে ভঙ্গীতে চাঁদির চশমা ধীরে ধীরে সিগারেটে সুখটান দেয়। কমলের চোখে চোখ পড়তে লোকটা মিটিমিটি হাসে। লোকটার দুচোখের তারায় কূট ধূর্তামি চকচক করে। কমলের শরীরটা কেমন শিরশির করে। ও চোখ ঘোরায়। এপাশে মর্কট মার্কা লোকটা কাকে যেন ডাকে, ও সুধাংশু!,

গলার স্বর শুনে কমলের ধাঁধা লাগে। অবিকল সেই কণ্ঠস্বর, যা একটু আগে তাকে খিস্তি ঝেড়েছে। তাহলে ওই চাঁদির চশমাটা কে?

ডানপাশের চুলকুনি দাদার সঙ্গে রোগা, লম্বা একজন লোক কথা বলছে।

পকেট থেকে হাত বার করে খুবই বিরক্ত মুখে চুলকুনি দাদা রোগা লম্বার কথা শুনছে।

দেশশুদ্ধু লোককে শুয়োর ছানা বানিয়ে দিল—ক্ষিপ্ত গলায় রোগা লম্বা মন্তব্য করে।

শব্দগুলো কানে পৌঁছোতে কমল কেমন যেন বিমূঢ়, বজ্রাহত হয়ে যায়। একই উচ্চারণ, একই বলার ভঙ্গী। তার মানে এই লোকটাই একটু আগে তাকে গালাগাল করেছে। এ লোকটাই অপরাধী। অথচ একে এতোক্ষণ কমল নজর করেনি। কমলের মাথার মধ্যে কি এক বিভ্রমের ঘূর্ণি ঝড় বইতে থাকে। বাস স্টপের যাবতীয় লোককেই সন্দেহজনক, বৈরী মনে হয়। নিদারুণ এক অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে আরো একবার খিস্তিটা শোনার জন্যে ও কান খাড়া করে রাখে। সামনে দিয়ে ট্রাম বাস ট্যাক্সি রিক্সার মিছিল বয়ে যায়। একটা ভীড় কেটে গিয়ে নতুন ভীড় জমে। অচেনা শত্রুটাকে ধরার জন্যে চোখ কান সজাগ রেখে কমল ওৎ পেতে অপেক্ষা করে। বেলা বাড়ে। অফিসের সময় পেরিয়ে যায়। কমল বোঝে এক জটিল চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ে সে দায়িত্ব, কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এই অহেতুক হেনস্তা আর লাঞ্ছনার শেষ দেখতে হবে। এক তীব্র জেদ ঘন নেশার মতো তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে।

ভীড় থেকে চেনা মুখগুলো কোন এক সময়ে অদৃশ্য হয়েছে। জমে উঠেছে নতুন মুখের জটলা। চাঁদির চশমা পরা লোকটাকে অদ্ভুত টলমল ভঙ্গীতে কমল তার দিকে হেঁটে আসতে দেখে। ট্যারচা পদক্ষেপে বেসামাল হাঁটা। দেখলে হাসি পায়। অথচ কমল হাসতে পারে না। স্নায়ু, শিরা টানটান করে সে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। যাত্রীর ভীড় এখন সামান্য পাতলা হয়েছে। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত কালচে ধুলোর স্থায়ী এক ঝড় থমকে আছে।

আজ আর বোধহয় অফিস যাওয়া হলো না—কানের কাছে অচেনা গলা শুনে কমল অবাক হয়। দেখে তার প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে চাঁদির চশমা পরা লোকটা হাসছে।

সহজ, স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে কমল বলে—বাস ট্রামের যা অবস্থা!

সিগারেটে টান দিয়ে চাঁদির চশমা ফুট কাটে—আর বলবেন না মশাই, একেবারে শুয়োরের বাচ্চা বানিয়ে ছেড়ে দিল।

কমলের হৃৎপিণ্ডটা ধক করে ওঠে। এ যে বড় পরিচিত কণ্ঠস্বর আর উচ্চারণ, ওর সারা শরীর কেমন শক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মাথার মধ্যে এক অলৌকিক ঝমঝম শব্দ।

একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে চাঁদির চশমা বলে—ধরুন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কমল সিগারেটটা নেয়।

সূর্য প্রায় মাথার ওপর উঠে এসেছে। গনগনে, ক্ষুধার্ত রোদে মাথার তালু তেতে ওঠে। এ লোকটাই মূল আসামী। চাঁদির চশমাকে পাকড়াতে পেরে কমল বেশ উত্তেজিত হয়। লোকটাকে এখন অপরাধের স্বীকারোক্তিতে বাধ্য করা দরকার। কিভাবে প্রসঙ্গটা পাড়া যায়, কমল তার মতলব ভাঁজে। কিন্তু চাঁদির চশমার চোখে মুখে কোন পাপ বা অপরাধের চিহ্ন নেই। বেশ হাল্কা, লঘু ভঙ্গী। লোকটা স্থির ভাবে দাঁড়াতে পারে না। কোমর থেকে দুপায়ের পাতা পর্যন্ত অবিরাম, অস্থির দুলুনি। লোকটার বয়স বড়ো জোর ত্রিশ, বত্রিশ। চোখে ধূর্ততা থাকলেও মুখে এবং আচরণে নিরীহ ভাব।

লেকে বসে একটু আড্ডা মারলে কেমন হয়—চাঁদির চশমা প্রস্তাব করে। বলে—বারোটার সময় অফিস গিয়ে কি লাভ ?

নিজের হাতঘড়িতে কমল দেখে প্রায় বারোটা বাজে। এখন অফিসে যাওয়ার সত্যি কোন মানে হয় না। তাছাড়া এই লোকটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। শারীরিক ভাবে লোকটা কমলের চেয়ে দুর্বল। এক উগ্র রাগ আর কৌতূহলে অচেনা লোকটার সঙ্গে কমল লেকের দিকে হেঁটে যায়।

বিরাট এক জারুলগাছের তলায় লেকের জল ঘেঁষে একটা খালি বেঞ্চে ওরা পাশাপাশি বসে। পৃথিবী এখন কর্মচঞ্চল। নানা ধান্দায় মানুষ ছুটছে। কিন্তু এই সরোবর এবং চারপাশের বনস্থলী বড়ো নিঃশব্দ, নির্জন। জরুল গাছের ঘন পাতার মধ্যে এক নাম-না-জানা পাখী ডেকে ওঠে। লোকটার নিষ্পাপ চালচলন দেখে কমলের একবার মনে হয়, তার ভুল হয়েছে। এ মানুষের বিরুদ্ধে গাল পাড়ার অভিযোগ কতোটা ন্যায্য এবং টেকসই হবে সেটা কমল ভেবে পায় না। অলৌকিক বাঁশি শোনা সাপের মতো লোকটার শরীর ক্রমাগত দুলছে। সিগারেটে একটা টান দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে—আপনার মাঝে মাঝে নিজেকে শুয়োর জাতীয় প্রাণী বলে মনে হয় না ? আমার তো প্রায়ই হয়। পাঁকে পড়া জন্তুর মতো অসহায়, নিঃসঙ্গ লাগে।

কমলের আবার ঝাঁকুনি খাওয়ার পালা। চতুর লোকটা সুকৌশলে তাকে জালে জড়িয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। এখন চলবে বুদ্ধি আর যুক্তির লড়াই। কমল নিশ্চিত হয় যে, এই লোকটাই তাকে গাল দিয়েছে। দোষীকে সাব্যস্ত করা দরকার। চাঁদির চশমা নিজের কথায় মশগুল। সে বলে—আজকাল অনেকেই নিজেদের শুয়োর সন্তান বলে ভাবতে শুরু করেছে। সারাদিন, রাত একগলা আবর্জনা আর পাঁকে ডুবে থাকলে মানুষের চিন্তাভাবনা তো বদলে যাবেই।

ঝিম ধরা দুপুর চারপাশে ঘন হয়ে বসেছে। মানুষের গলা আর পাতা নড়ার শব্দ মিশে এক দুর্বোধ্য গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। সংসারের যাবতীয় ক্লেদ, গ্লানি

আর অসহায় মানুষের অধঃপতনের কথা লোকটা বলে যায়। প্রতিদিন অপমান আর লাঞ্ছনার শেষ নেই। কেমন এক শত্রুতামূলক হিংস্র আবহাওয়া। প্রত্যেকই প্রত্যেকের শত্রু। অধঃপতনের একটা প্রতিযোগিতা চলেছে।

দাঁতে দাঁত টিপে লোকটার কথা কমল শুনে যায়। মাথার মধ্যে কেমন এক সম্মোহন এবং ক্লান্তির পাশাপাশি অপরাধীকে পাকড়াও করার তাগিদটাও জেগে থাকে। চাপা গলায় কমল বলে—আপনি বানানো, বাজে কথা বলছেন। আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।

লোকটার শরীরের অস্থির কাঁপুনি দ্রুততর হয়। সে অবাক চোখে কমলকে দেখে। তারপর বলে—আপনি ভাগ্যবান। আপনার কোন কষ্ট বা অভিযোগ নেই। অথচ আমার অবস্থা দেখুন, কি এক ভয়, লজ্জা, অপমানে প্রতিদিন কালো হয়ে যাচ্ছি। হাট, বাজার, অফিস, কাছারি, বাসস্টপ, রেলষ্টেশন, যেখানেই যাই ; কে যেন আমায় কুৎসিৎ ভাষায় গাল পাড়ে। কত নির্দোষ লোকের সঙ্গে যে এ'নিয়ে আমার ঝগড়া, হাতাহাতি হয়ে গেছে।

বরফঠাণ্ডা ঘন জলের এক স্রোত কমলের মেরুদণ্ড দিয়ে বিদ্যুৎবেগে নেমে যায়। স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে ও বসে থাকে।

লোকটা বলে—ক্রমে বুঝেছি, অলক্ষ্যে বসে আমি নিজেই নিজেকে গাল পাড়ছি। পরে জানলুম, শুধু আমি নয়, অনেকেই এরকম করে।

কমলের যাবতীয় বিবেচনা, যুক্তি, তাগিদ পাথর হয়ে যায়। কি এক অশুভ পরিস্থিতি যেন ঘনিয়ে উঠছে চারপাশে! ধোঁয়াটে চোখে লোকটার মুখের দিকে ও তাকিয়ে থাকে। লোকটার সারা শরীর এখন ভীষণভাবে কাঁপছে। অধীর, অস্থির কম্পন। কিন্তু তার মুখে যন্ত্রণা বা আর্তির কোন চিহ্ন নেই। এরকম তড়কা লাগা কাঁপুনি দেখে কমল ভয় পেয়ে যায়। লোকটাকে শান্ত করার জন্যে কমল তার কাঁধে হাত রাখে।

আর মানুষটাকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটনাটা ঘটে যায়। কমলের মনে হয়, হাই ভোল্টের এক জীবন্ত ইলেক্ট্রিকের তারে যেন ওর হাত ঠেকে গেছে। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট শরীর ঝনঝন করে। মাথা ঘুরে যায়। তার সারা দেহে অসহ্য তুমুল কাঁপুনি শুরু হয়। মনে হয়, শরীরের সব স্নায়ু, শিরা এই তীব্র কম্পনে পটাপট ছিঁড়ে যাবে।

কমল বুঝতে পারে ওর অস্তিত্বের চারপাশে সাজানো, ফাঁকা ধ্যানধারণা ও অহমিকাগুলো ধীরে ধীরে পেঁয়াজের খোসার মতো ঝরে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুর অন্তিম কাতরানি ও শুনতে পায়। পচা দূষিত এক ঝলক গন্ধ ওর নাকে এসে লাগে। দোষীকে ধরতে গিয়ে ও নিজেই কঠিন সাজা খেয়ে বসে আছে।

চাঁদির চশমার শরীরের দুলুনি অনেক কমে এসেছে। মুখে স্মিত হাসি নিয়ে সে কমলকে বলে সেদিন আমাকেও এখানে একজন ছুঁয়ে দিয়েছিল। তারপরেই আমার চোখ খুলে গেল। অনেক মানুষকে আমাদের ছুঁতে হবে। গোটা দেশ জুড়ে থরহরি কম্প না জাগলে এই পাঁক আর পীড়ন থেকে আমরা মুক্তি পাবো না।

দুপুরের রোদ এক সময় পড়ে আসে। কমলের দেহে চনমনে বিদ্যুৎ তরঙ্গ নেচে বেড়ায়। ছায়াময় জাবুলতলা ছেড়ে ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে ও বাসস্টপের দিকে এগিয়ে চলে। অনেক মানুষকে স্পর্শ করতে হবে।

শৈবাল মিত্রের অন্যান্য উপন্যাস

অজ্ঞাতবাস

নবপত্র প্রকাশন
৮, পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯
বারো টাকা

একাত্তরের শেষ, বাহাত্তরের শুরু। এই অস্থির, অগ্নিগর্ভ সময়ের এক নির্ভীক ও নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার দর্পন অজ্ঞাতবাস। উপন্যাসের নায়ক তপু ইতিহাসের ইঙ্গিতেই সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পা বাড়ালো। শোষণহীন, মুক্ত, সমৃদ্ধ এক নতুন ভারতবর্ষের ছবি তার কল্পনাকে উত্তেজিত করেছিল। পুলিসের তাড়ায় সে আত্মগোপন করলো। শুরু হ'লো তার অজ্ঞাতবাস। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত তপুর বিশ্বাস, সংশয় এবং উপলব্ধির গূঢ়, গভীর কাহিনী।

তরণী পাহাড়ে বসন্ত

প্রকাশিতব্য

ইতিহাসের বজ্রনির্ঘোষে কিশোর আর অজিত কলকাতা শহর এবং মধ্যবিত্ত জীবন ছেড়ে চলে গেল সাঁওতাল পরগণায়, তরণী পাহাড়ের কোলে। আদিবাসী গরীব মানুষদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের জাগিয়ে তোলা এবং সংগঠিত করাই ছিল তাদের ব্রত। সেই দুঃসাধ্য পরীক্ষায় তারা সফল হ'লো। তবু কোথাও যেন একটা ভুল হয়ে গেল। উন্মত্ত সময়ের তীব্র টানাপোড়েনে আলোড়িত দুই অদম্য তরুণের শ্রেণীচ্যুত হওয়ার সংগ্রাম ও সত্যসন্ধানের মহৎ ও বলিষ্ঠ কাহিনী। সাপ্তাহিক অমৃতে ধারাবাহিক প্রকাশিত এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণের কাজ সমরেশ মুখার্জির পরিচালনায় শুরু হয়েছে। গ্রন্থাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

আনন্দের দিন

তিনসঙ্গী
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩
দশ টাকা

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির পীঠস্থান শহরে না গেলে কারুর কিছু হয় না। পুরোনো গ্রাম উজাড় করে মানুষ চলে যায় শহরে। পরিত্যক্ত গ্রাম, তার মানুষজন, ভেঙেপড়া অর্থনীতি আর মুমূর্ষু জীবন নিয়ে ধুঁকতে থাকে। শহরের স্বপ্নে বালক বিভুর রক্তেও রোমাঞ্চের শিহরণ খেলে যায়। জন্মভূমি নীলকান্তপুর গ্রাম ছেড়ে একদিন তাকেও কলকাতার পথে পাড়ি জমাতে হয়। তবু দেশ, গাঁয়ের আলো মাটি হাওয়া তার অস্তিত্বের মধ্যে ঢুকে কী এক বেদনায় গুমরে ওঠে। এই বিরাট পৃথিবীতে একটি শিশুর বড়ো হয়ে ওঠার রহস্যময় আনন্দ ও বিষাদমাখা অভিযানের কাহিনী—আনন্দের দিন।

অগ্নির উপাখ্যান

প্রকাশিতব্য

অন্বেষা

শারদীয় অমৃতে প্রকাশিত এই উপন্যাসটি একজন বিপ্লবী তরুণের তীব্র আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিশ্লেষণের মর্মান্তিক ও মানবিক দলিল। ঠ্যাঙ্গাড়ে বুনো রায় কিভাবে ভগবান বুনো রায়ে রূপান্তরিত হলো এবং সেই বুনো রায়ের বংশধর অগ্নি রায় কোন প্রক্রিয়ায় সমাজ পরিবর্তনের আদর্শে সর্বস্ব ত্যাগ করে শ্রেণীযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো, সেই রহস্যময় অথচ জীবনরস সম্পৃক্ত বাস্তব কাহিনী এই উপন্যাসকে বহুকৌণিক মাত্রা ও মহত্ব দান করেছে। জীবন দর্শনের মৌলিকতা ও নিপুণ বিশ্লেষণে অগ্নির উপাখ্যান এক অসাধারণ উপন্যাস।

দেওয়ালের লিখন

যন্ত্রস্থ

নবপত্র প্রকাশন

কলকাতার রাস্তায় ট্রাম জ্বলছে। দেশজুড়ে জরুরী অবস্থা, ভারতরক্ষা আইনের শক্ত নাগপাশ, গোটা ভারতবর্ষ এক ভয়ংকর বিদ্রোহে ফেটে পড়ার প্রহর গুনছে। পঁয়ষট্টি, ছেষট্টির সেই রুদ্ধশ্বাস দিনগুলিতে হঠাৎ পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতবর্ষের যুদ্ধ লেগে গেল। গোটা ভারতবর্ষ নিষ্প্রদীপ, ঘন অন্ধকারে নিজের শরীর পর্যন্ত দেখা যায় না। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে শুরু হলো তুমুল বিতর্ক। মুক্তির পথ কি?

হঠাৎ একদিন শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে কারা যেন লিখে দিল– সশস্ত্র বিপ্লবই মুক্তির পথ। দুঃসাহসী, স্পর্ধিত এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে রক্ষণশীল, স্থবির পার্টি নেতৃত্বের সংঘর্ষ বেঁধে গেল। ব্যক্তি ও রাজনীতির কুটিল দ্বন্দ্বের আবর্তে সমকালীন তারুণ্য নাকানি চুবানি খেল। তবু তারা থামলো না। এক মহাকাব্যোচিত কাহিনীর অনন্য শিল্পরূপ।

অচিন পাখি

তিন বন্ধুর একজন শিবু পুলিশের গুলিতে অনন্তর কোলে মাথা রেখে মারা গেল। চোখের সামনে এই মৃত্যু দেখে তুহিন একদিন বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হ'লো। বেশ কয়েক বছর পরে তুহিনের খোঁজে অনন্ত গেল কুম্ভমেলায়। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট বন্ধুকে খোঁজার বিস্ময়কর, বিচিত্র কাহিনী। শিলাদিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত।

উন্মোচন

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় হাজার চাপে বিপর্যস্ত একজন নাগরিক মানুষের স্বরূপ আবিষ্কারের কাহিনী। এ কাহিনী শুধু একজন মানুষের নয়, জটিল নাগরিক জীবনের অস্তিত্ব উন্মোচনের অভিযান। আন্তরিক পত্রিকায় প্রকাশিত।